আহমদ দীদাত রচনাবলি

অনুবাদ

ফজলে রাব্বী

মুহাম্মদ গোলাম মোস্তাফা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা

ভারতীয় বংশোদ্ভূত আহমদ দীদাত দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসী। বাল্যকালে তিনি পিতার সাথে দক্ষিণ আফ্রিকায় যান এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। তিনি যে এলাকায় বাস করতেন সেটা ছিল খ্রিস্টান অধ্যুষিত। এই এলাকার খ্রিস্টানরা ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে নানারূপ সমালোচনা ও কটূক্তি করতো। তিনি এতে দারুণভাবে মর্মাহত হতেন। কিন্তু প্রতিবাদ করার মতো জ্ঞান ও যোগ্যতা তখন তাঁর ছিল না। এ অবস্থায় তিনি ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের উপর ব্যাপক পড়াশোনা শুরু করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই এ বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁর সাথে পাদ্রীদের বহুবার ধর্ম সম্পর্কিত বিতর্ক হয় এবং প্রতিবারই তিনি তাঁর অসাধারণ জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং বিশ্লেষণক্ষমতা দ্বারা তাদেরকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বজনীনতার কথা বোঝাতে সক্ষম হন। জনাব দীদাত ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ, অনলবর্ষী বক্তা ও ইসলাম প্রচারক।

ইসলামের বিভিন্ন দিকের উপর ইংরেজি ভাষায় রচিত তাঁর বহু গ্রন্থ রয়েছে। এর মধ্য থেকে বাংলায় অনূদিত 'আল-কুরআন ঃ এক মহা বিস্ময়কর অলৌকিকতা', 'আল কুরআন ঃ এক চূড়ান্ত অলৌকিক মহাগ্রন্থ', 'হযরত মুহাম্মদ (সা) হযরত ঈসা (আ)-এর স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী', 'বাইবেলে হযরত মুহাম্মদ (সা)' এবং 'আরব ও ইসরাইল ঃ সংঘাত না সমঝোতা'—এই ক'টি পুস্তক 'আহমদ দীদাত রচনাবলি' নামে প্রকাশ করা হলো। অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট অনুবাদক ও লেখক ফজলে রাব্বী ও মুহাম্মদ গোলাম মোস্তাফা।

আহমদ দীদাত রচনাবলি পাঠে এ দেশের মানুষ ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে এবং ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবে এই প্রত্যাশায় পুস্তকটি ২০০১ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রথম প্রকাশ করা হয়। বইটি প্রকাশের সাথে সাথেই এর সকল কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তার কারণে এবার এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমাদের প্রত্যাশা, বইটি এবারও আগের মতোই পাঠকমহলে সমাদৃত হবে।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আহমদ দীদাত রচনাবলি

অনুবাদ
ফজলে রাব্বী
মুহাম্মদ গোলাম মোস্তাফা

সূচি

অধ্যায় এক

এক বিস্ময়কর অলৌকিতা

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ
بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ۝

বল, যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জ্বিন সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ আনয়ন করতে পারবে না। কুরআন ১৭ : ৮৮

অলৌকিকতা কি?

অলৌকিকতা বলতে কি বোঝায় সে বিষয়ে একটি স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। এ সম্পর্কে কয়েকটি সংজ্ঞা দেওয়া হলো ঃ

১. প্রকৃতির বুকে সংঘটিত অতিপ্রাকৃত উৎস হতে বা আল্লাহ কর্তৃক সংঘটিত এমন এক বিষয় যা প্রকৃতির নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না।

২. এমন কোন ব্যক্তি, বস্তু, যা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

৩. এমন এক অসম্ভব ঘটনা, যা মানুষের ক্ষমতার অসাধ্য।

যুক্তিসঙ্গত কারণেই এমন অসম্ভব ঘটনা যত বড় হবে অলৌকিকত্বও হবে তত বড়। যেমন এক ব্যক্তির মৃত্যু হলো । চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করলেন। তারপর কোন একজন সাধু বা দরবেশ এসে মৃতদেহকে বললো, ‘ওঠ’। সবাইকে অবাক করে দিয়ে মৃত ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং হাটতে হাটতে চলে গেল। আমরা এরূপ ঘটনাকেই অলৌকিক ঘটনা বলে আখ্যায়িত করব। কিন্তু মৃতদেহটি যদি জীবন লাভের পর তিনদিন বেঁচে থাকে তাহলে সেই ঘটনাকে আমরা বড় ধরনের অলৌকিকতা বলব। তারপর যখন মৃতদেহটি কয়েক বছর পর যখন পচে গলে গিয়েছে তখন যদি সেটি কবর থেকে উঠে আসে তাহলে এই অলৌকিক ঘটনাকে সর্বোচ্চ অলৌকিক ঘটনা বলব।

একটি সাধারণ ধারণা

অনাদিকাল হতে মানব জাতির মধ্যে একটি সাধারণ ধারণা বিদ্যমান যে আল্লাহ্‌র নিকট হতে যখনই কোন পথ প্রদর্শক আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুসারে পথ নির্দেশ করতে আসেন, তাদেরকে অতিপ্রাকৃতিক কিছু প্রমাণ প্রদর্শন করতে হয়, এসব অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করে তাঁদের প্রমাণ করতে হয় যে, তাঁরা আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহামানব। সাধারণ মানুষ আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষের নিকট অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যাশা করে। আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ যখনই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এবং পরিকল্পনার দিকে সাধারণ মানুষকে পথ নির্দেশ করতে চেষ্টা করেন তখনই তারা তিনি যে বাণী নিয়ে এসেছেন সেটি সেইভাবে গ্রহণ না করে তার নিকট হতে অপ্রাকৃতিক প্রমাণ দাবি করে। যেমন, যখন ঈসা (আ) তাঁর জনগণের নিকট প্রচার করতে আরম্ভ করলেন, যেন তারা নিছক আনুষ্ঠানিক বিধিবিধান থেকে সরে আসে এবং আল্লাহ্‌র আইন ও নির্দেশ যথাযথভাবে গ্রহণ করে, তখন তার জনগণ তার নিকট হতে তিনি যে সত্যই আল্লাহ্‌র রাসূল সেটা প্রমাণ করার জন্য তার অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের দাবি করল। এ সম্পর্কে বাইবেলে লেখা হয়েছে ঃ

> **তখন কয়েকজন অধ্যাপক ও ফরীশী তাঁকে বলল, হে গুরু, আমরা আপনার কাছে কোন চিহ্ন দেখতে ইচ্ছা করি। তিনি উত্তরে তাদের বললেন, এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোকে চিহ্নের অন্বেষণ করে, কিন্তু যোনার ভাববাদীর চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন দেওয়া যাবে না।**
>
> **— মথি ১২ : ৩৮-৩৯**

যদিও ঈসা (আ) ইহুদীদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এরূপ অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করতে অস্বীকার করেছিলেন তবু আমরা তাঁর জীবনী গসপেলের বর্ণনা থেকে জানি তিনি বহু অলৌকিক কর্ম সাধন করেছিলেন। পবিত্র বাইবেলে তাদের পয়গম্বর যে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছেন তার বিবরণে পরিপূর্ণ । প্রকৃতপক্ষে এই সকল চিহ্ন, বিস্ময়কর ঘটনা এবং অলৌকিক কাণ্ড সবই আল্লাহ্ কর্তৃক সংঘটিত। কিন্তু এগুলো মানুষের মাধ্যমে সাধিত হয়েছিল। অথচ আমরা তাকে বলি নবী-রাসূলদের অলৌকিকতা। হযরত মূসা (আ) অথবা ঈসা (আ) এমনি অনেক অলৌকিক কার্য আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সংঘটিত করে দেখিয়েছিলেন।

হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের প্রায় ছয়শ বছর পর আরব-দেশের মক্কা নগরীতে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাব। চল্লিশ বছর বয়সে যখন তিনি তাঁর দেশবাসীর নিকট তাঁর মিশনের কথা ঘোষণা করলেন তখন মক্কার মুশরিকরাও অনুরূপ অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য তাঁকে অনুরোধ করেছিল। মনে হয়, পাঠ্য পুস্তকের মত, আরবরাও যেন খ্রিস্টানদের গ্রন্থ থেকে পাতা ছিঁড়ে নিয়েছে। ইতিহাস এমনিভাবেই বারবার ফিরে আসে।

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ

তারা বলে, 'তার প্রতিপালকের নিকট হতে তার কাছে নিদর্শন প্রেরণ করা হয় না কেন?' — কুরআন ২৯ : ৫০

চিহ্ন! কি চিহ্ন?

"অলৌকিকতা? তিনি চিৎকার করে বলেন, তোমরা কি অলৌকিকতা চাও? তবে তোমরা নিজেরা কি? আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাটি থেকে পয়দা করেছেন। তোমরা একদিন ছিলে ছোট্ট। কয়েক বছর আগে তোমার জন্মও হয়নি। আজ তোমাদের মাঝে আছে সৌন্দর্য, শক্তি, চিন্তা। একের প্রতি অপরের ভালবাসা। তারপর যেদিন বার্ধক্য আসে তখন তোমাদের কেশ হয় শুভ্র, শরীর দুর্বল হয়, চলতে পার না, তোমরা থেমে পড় আর ওঠ না। তোমাদের একের প্রতি রয়েছে অপরের ভালবাসা। আমি অবাক হয়ে ভাবি আমাদের মধ্যে যদি ভালবাসা না থাকত, একের প্রতি অপরের করুণা না থাকত, তাহলে কি হতো! এ তো একটি অতি সহজ সরল চিন্তা......."।

টমাস কার্লাইল এই কথাগুলো "তোমাদের একের প্রতি রয়েছে অপরের ভালবাসা" সম্ভবত তিনি পবিত্র কুরআনের কোন ইংরেজি অনুবাদ প্রাঠ করেই বলতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। যে আয়াতটি পাঠ করে তিনি এ কথা বলতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সেটি সম্ভবতঃ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○

এবং তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে ঃ তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।

— কুরআন-৩০ : ২১

১. And among His signs is this, that He created for you mates from among yourselves, That ye may dwell in TRANQUILLITY WITH and He has put love and mercy between your (hearts) : Verily in that are signs for those who reflect — Translated by A. Yusuf Ali. [Holy Quran 30 : 21]

২. And one of his signs it is, that he hath created wives for *your own species.* That *YE MAY DWELL WITH THEM,* and hath put love and tenderness between you. Herein truly are signs for those who reflect.

৩. By another sign he gave you wives from among yourselves, that ye might LIVE IN JOY WITH THEM, and planted love and kindness into your hearts. Surely there are signs in this for thinking men— Translated by N.J. Dawood

এখানে ইংরেজিতে একই আয়াতের তিনটি অনুবাদ দেওয়া হয়েছে । প্রথমটি একজন মুসলমান, ইউসুফ আলী, কৃত। দ্বিতীয়টি একজন খ্রিস্টান পাদ্রী, রেভারেণ্ড রডওয়েল, কৃত এবং শেষটি একজন ইরাকি ইহুদী, এন.জে.দাউদ, কর্তৃক অনূদিত।

দুর্ভাগ্য যে, টমাস কার্লাইল এই তিনটির কোনটিই পাঠ করার সুযোগ পাননি, কারণ তখন এই তিনটি ছিল না। ১৮৪০ সালে ৮৫ পৃষ্ঠার যেটি তিনি পেয়েছিলেন সেটি সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন, "আমরা কুরআন পাঠ করতে পারি আমাদের নিকট সেল কর্তৃক যে অনুবাদ রয়েছে সেটি মোটামুটি ভাল।" তখন সেল কর্তৃক পবিত্র কুরআনের একমাত্র ইংরেজি অনুবাদটি ছিল।

উদ্দেশ্যের মাঝে খুঁত রয়েছে

কার্লাইল তাঁর দেশবাসীর প্রতি যথেষ্ট উদার ছিলেন। ইংরেজি ভাষায় প্রথম কুরআন শরীফ অনুবাদ করেন জর্জ সেল। তাঁর অনুবাদের পেছনে অবশ্যই কোন উদ্দেশ্য ছিল । তিনি ইসলামের এই পবিত্র গ্রন্থের প্রতি যে মনোভাব পোষণ করতেন সেই বিষয়ে কোন গোপনীয়তা ছিল না। ১৭৩৪ সালে প্রকাশিত এই অনুবাদের মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন যে তার উদ্দেশ্য ছিল "মানুষ মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং তার জালিয়াতি ধরার জন্য এই অনুবাদ করেছেন।" তিনি লিখেছেন "এমন প্রকাশ্য জালিয়াতি কে ধরতে পারে? একমাত্র প্রোটেস্টান্টরাই কুরআনকে যথাযথভাবে আক্রমণ করতে সক্ষম এবং আমি বিশ্বাস্ করি এদের উৎখাতের মধ্যে তাদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে ভাগ্যের আশীর্বাদ।"—জর্জ সেল

পূর্ব ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি অনুবাদ কাজে হাত দিয়েছেন। আমরা এখন বিচার করে দেখতে পারি এই জর্জ সেলের পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনুবাদ কতখানি নিখুঁত!

জর্জ সেলের এই বিশেষ পঙ্‌ক্তিটি কার্লাইলকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করেছিল। এর সঙ্গে পূর্বে উল্লিখিত একজন খ্রিস্টান এবং একজন ইহুদীর অনুবাদ তুলনীয়। আমি মনে করি না জর্জ সেল তার সময়ে আমাদের সঙ্গিনী, স্ত্রী অথবা সহধর্মিণী সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তাদেরকে নিছক যৌন বিষয় হিসাবে বর্ণনা করার মত "নারী অপেক্ষা পুরুষ শ্রেষ্ঠ এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী পুরুষ শূকর ছিলেন।"

তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন মাত্র, যা কার্লাইল লক্ষ্য করেননি। আরবি শব্দ "লিতাস কুনূ" যার অর্থ শান্তি, সান্ত্বনা, খুঁজে পাওয়া, তাকে তিনি বিকৃত করে বলেছেন 'কো হেবিট' অর্থাৎ সহবাস অর্থাৎ বৈধভাবে বিবাহিত না হয়েও যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে একত্রে বসবাস করা।

আল্লাহ্ তা'আলা নিজে কুরআন শরীফের প্রতিটি শব্দ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বাছাই করে ব্যবহার করেছেন, সেখানে আল্লাহ্‌র কুদরতের ছাপ রয়েছে এবং সেগুলোই আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্বের মহিমা ঘোষণা করে।

একটি নিদর্শন প্রার্থনা করুন

কোন নিদর্শন ? তাদের নির্বোধ মনমানসিকতা যেভাবে চায়, সেভাবেই তারা বিশেষ ধরনের নিদর্শন বা অলৌকিকতা আশা করে। আল্লাহ্‌র পক্ষে সবকিছুই সম্ভব; কিন্তু আল্লাহ্ যেমন খুশি তেমন যে কোন নির্বোধের মিথ্যা দাবি পূরণ করেন না। সেজন্য তিনি তাঁর নিদর্শনসমূহকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন এবং তাঁকে অস্বীকার করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। এটাই কি যথেষ্ট নয়? অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা যেসব দাবি উত্থাপন করে সেগুলো প্রধানত এইরূপ, যেমন–

নির্দিষ্টভাবে তারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল, "আকাশ পর্যন্ত একটা সিঁড়ি বানিয়ে দাও, যাতে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তুমি যে গ্রন্থ পেয়েছ তা আমরা দেখতে পারি। তাহলে আমরা বিশ্বাস করব।" তারা আরও বলেছিল, "ঐ যে পাহাড় দেখা যাচ্ছে ঐ পাহাড়টাকে সোনার পাহাড় বানিয়ে দাও। তাহলে আমরা বিশ্বাস করব।" আরও বলেছিল "মরুভূমিতে পানির প্রস্রবণ বইয়ে দাও, তাহলে আমরা বিশ্বাস করব।"

তিনি মুশরিকদের এসব অযৌক্তিক ও উদ্ভট দাবির উত্তর অত্যন্ত বিনম্রভাবে দিয়েছিলেন ঃ **আমি কি বলেছি আমি একজন ফেরেশতা? আমি কি বলেছি, আমার হাতে আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডার রয়েছে? শুধামাত্র আমার নিকট যা প্রত্যাদেশ হয় আমি তাই প্রকাশ করি।**

অবিশ্বাসীদের প্রতিউত্তর দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে রুচিপূর্ণ জবান দিয়েছিলেন তার নমুনা হচ্ছে ঃ

قُلْ إِنَّمَا الْآيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَإِنَّمَآ أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ○

বল, 'নিদর্শন আল্লাহ্র ইখ্তিয়ারে। আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র।— কুরআন ২৯ : ৫০

এই সকল অবিশ্বাসীগণের বিশেষ ধরনের চিহ্ন বা নিদর্শন দাবির প্রেক্ষিতে কুরআন শরীফে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিম্নে বর্ণিত আয়াতটিও দিয়েছেন। তবু পৌত্তলিক নির্বোধ মানসিকতা সম্পন্ন এই সকল মুশরিকরা তার কাছে অলৌকিক চিহ্ন প্রদর্শনের দাবি করেছিল। এটা সত্য যে তাদের সন্দেহপরায়ণ মানসিকতা ও দুর্বল বিশ্বাসের কারণে তারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল অলৌকিক চিহ্ন দেখার। তাদেরকে বলা হয়েছে কুরআনের প্রতি লক্ষ্য কর। বারবার বলা হয়েছে অলৌকিকতা যদি দেখতে চাও তবে কুরআনের প্রতি লক্ষ্য কর।

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَ ○

এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার নিকট কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যা তাদের নিকট পাঠ করা হয়? এতে অবশ্যই মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে। — কুরআন ২৯ : ৫১

দুইটি প্রমাণ

আল্লাহ্ তা'আলা নিজে কুরআন শরীফের অলৌকিক প্রকৃতি ও উর্ধ্বজগতের রচনার প্রমাণস্বরূপ দুটি যুক্তি তুলে ধরেছেনঃ

১. "আমরা (আল্লাহ তা'আলা) উন্মোচন করেছি যে তোমার নিকট (হে হযরত মুহম্মদ সা) এই গ্রন্থ যে তুমি সম্পূর্ণ নিরক্ষর ও অশিক্ষিত ব্যক্তি।

একজন উম্মি রাসূল যিনি পড়তে ও লিখতে জানেন না। এ সম্পর্কে থমাস কার্লাইল বলেন ঃ

"অপর একটি বিষয় আমাদের বিস্মরণ করা উচিত নয় যে, তিনি কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য যাননি। যাকে আমরা বলি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তা তিনি একেবারেই লাভ করেন নি।"

তদুপরি আল্লাহ তা'আলা, যিনি এই গ্রন্থের রচয়িতা, তিনি নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দাবি যে, তিনি এরূপ রচনা করতে সক্ষম নন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই গ্রন্থের রচিয়তা হতে পারেন না। সেই সত্যপরায়ণতা সম্পর্কে বলেন ঃ

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ○

তুমি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করনি এবং স্বহস্তে কোন কিতাব লেখ নি যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করবে। — কুরআন ২৯ : ৪৮

আমাদের কাছে পবিত্র কুরআন রচয়িতা মহান আল্লাহর যে যুক্তি রয়েছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যদি লেখাপড়া জানতেন তবে মিথ্যাচারীরা কুরআনকে আল্লাহ্র কিতাব বলে সন্দেহ করত। তবে কুরআন সম্পর্কে এ অকাট্য যুক্তিটি থাকত না। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যদি শিক্ষিত হতেন তাহলে তাঁর শত্রুরা সম্ভবত অভিযোগ আনতে পারত যে তিনি খ্রিস্টান ও ইহুদীদের লেখা থেকে নকল করেছেন অথবা প্লেটো ও অ্যারিস্টোটল অধ্যয়ন করেছেন অথবা তাওরাত, যবুর বা ইঞ্জিল পাঠ করেছেন। তারপর সেগুলো সুন্দরভাবে মুখস্থ করে কুরআনকে আল্লাহ্র কিতাব বলে প্রচার করেছেন, তিনি লেখাপড়া জানলে তারা সম্ভবত এরূপ অভিযোগও উত্থাপন করতে পিছপা হতো না।

দশম শতাব্দীর পূর্বে বাইবেলের কোন আরবি অনুবাদ হয়নি। ফলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর সময় কারো পক্ষে বা আরবদের পক্ষে বাইবেল আরবি ভাষায় পাঠ করা সম্ভব ছিল না। মিথ্যা দম্ভকারী বক্তাদের হয়তো যুক্তি থাকতে পারত; কিন্তু সেই সামান্য সুযোগও অবিশ্বাসীদের জন্য থাকল না।

২. "এই গ্রন্থ"? হাঁ এই গ্রন্থ নিজেই প্রমাণ যে এটি আল্লাহ্র রচনা। যে-কোন দিক থেকে এই গ্রন্থ পাঠ করা যাক না কেন, যেভাবে পরীক্ষা করা হোক না কেন, আপনাদের যদি সত্যি সন্দেহ থাকে তাহলে এ গ্রন্থের সুমহান রচয়িতা যে চ্যালেঞ্জ করেছেন সেটি গ্রহণ করুন ঃ

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْاٰنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ○

তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না? এটি যদি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারও হত তবে তারা তাতে অনেক অসঙ্গতি দেখতে পেতো। — কুরআন ৪ : ৮২

পূর্বাপর সঙ্গতি

কোন মানুষ দশ বছরের অধিককাল প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন ও শিক্ষা দিচ্ছেন, তার পক্ষে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই ধারায় লিখে যাবেন এটা ভাবা যায় না। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চল্লিশ বছর বয়স কালে সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র ওহী প্রাপ্ত হন। তারপর তেষট্টি বছর বয়সে যখন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন -এই ২৩ বছর ধরে তিনি একই ধারায় একইভাবে একই বৈশিষ্ট্য নিয়ে ইসলাম প্রচার করেছেন ও অনুশীলন করেছেন। এই দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে তিনি জীবনের বহু ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়েছেন। যে কোন মানুষ অনুরূপ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকালে সম্মানজনক সমঝোতা করতে বাধ্য হতেন। অথবা নিজে কখন কখন অসঙ্গত কাজে বাধ্য হতেন। কোন মানুষ চিরকাল একই জিনিস একইভাবে লিখতে পারে না। কুরআন শরীফের বাণী সর্বত্র পূর্বাপর সঙ্গতিপূর্ণ, কোথাও অমিল নেই, অসঙ্গতি নেই। অবিশ্বাসীদের প্রতিবাদ কি আপন বিবেক, বিচার-বিবেচনার বিরুদ্ধে নিছক তর্কের জন্য তর্ক ও একগুয়েমী নয়?

তদুপরি পবিত্র কুরআনে এমন সকল বিষয় উল্লেখ আছে যেগুলো বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কিত অথচ সেই যুগে বিষয়গুলি কারোই জানা ছিল না। পরবর্তীকালে বিবর্তনের মাধ্যমে এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে সেইগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে, স্বীকৃতি লাভ করেছে। এটি এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে অশিক্ষিত মন অবশ্যই পরস্পর বিরোধী কল্পনা ও দিশেহারা ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়ত।

সপ্রমাণিত সাক্ষ্য

বারবার যখন এই সকল বাতিলগ্রস্ত ও অস্থিরচিত্ত কিছু সংখ্যক ব্যক্তি, আল্লাহ্‌র নবীর কাছ থেকে অলৌকিক কিছু দেখাবার জন্য দাবি করতে লাগল তখন তাকে কুরআন প্রদর্শন করতে বলা হলো। বলা হলো যে, কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী এবং সেটাই অলৌকিক -সর্বত্র অলৌকিক। যারা জ্ঞানী, শিক্ষিত এবং আত্মিক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এবং যারা নিজেদের প্রতি সৎ তারা আল কুরআনকে প্রকৃত অলৌকিকতা বলে চিনতে পেরেছিল এবং মেনেও নিয়েছিল।

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ۝

বস্তুত যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের অন্তরে এটি স্পষ্ট নিদর্শন। কেবল জালিমরাই আমার নিদর্শন অস্বীকার করে। — কুরআন ২৯ : ৪৯

অধ্যায় দুই

বিজ্ঞান এবং কুরআনের প্রত্যাদেশ

অকুণ্ঠচিত্ত প্রশংসা

বর্তমান বিশ্বে প্রায় একশ কোটির অধিক মুসলমান, তারা সবাই যে একবাক্যে গভীর প্রত্যয়ের সাথে কুরআনকে আল্লাহর বাণী বলে গ্রহণ করেছেন এটাই তো অলৌকিকতা।

এই মহাগ্রন্থের অলৌকিক প্রকৃতি সম্পর্কে যখন গোড়া শত্রুও না চাইতেই স্বীকার করছে, তখন মুসলমানরা করবে না কেন? রেভারেণ্ড আর বসওয়ার্থ স্মিথ তাঁর **মুহম্মদ এন্ড মোহামেডানিজম** গ্রন্থে কুরআন সম্পর্কে বলেন ঃ

(ক) সত্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এবং বিশুদ্ধ স্টাইলের এক অলৌকিক বিস্ময়।

এ.জে.আরবেরি নামে অপর একজন ইংরেজ তাঁর কুরআনের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় বলেছেন ঃ

(খ) "যখনই আমি কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করি তখনই মনে হয় আমি এমন এক অতলান্ত অনাবিল সঙ্গীত শুনতে পাই যার গভীরে আছে অব্যাহত সুর মূর্ছনা, মনে হয় যেন একটি ড্রামের তালে আমার নিজেরই হৃদপিণ্ডের ধুকধুক শব্দ শুনতে পাচ্ছি।" তার মুখবন্ধের এই বক্তব্য এবং অন্যান্য বক্তব্য পাঠ করলে মনে হয়, তিনি একজন মুসলমান। কিন্তু হায়! তিনি ইসলাম গ্রহণ না করেই ইহধাম ত্যাগ করেছেন।

আর এক ইংরেজ মারমাডিউক পিকথল। কুরআন শরীফের তিনিও ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। সেই অনূদিত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন ঃ

(গ) সেই অননুকরণীয় সুরঝংকার ও শব্দলহরী মানুষকে এতখানি আবেগে আপ্লুত করে ফেলে তখন সে আনন্দে অশ্রু ধরে রাখতে পারে না।

এই লেখক কুরআন শরীফ অনুবাদ করার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আমরা জানি না তিনি এই মন্তব্য ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে না পরে করেছিলেন।

(ঘ) বিশ্বে বাইবেলের পরেই এই গ্রন্থ সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয় এবং সর্বাধিক শক্তিশালী ধর্মীয় গ্রন্থ (যেহেতু এই বক্তব্য একজন ইসলাম সমালোচক খ্রিস্টানের সেহেতু তার এই বক্তব্যে কুরআন শরীফকে দ্বিতীয় স্থান দেওয়ায় আমরা কিছু মনে করি না। উইলিয়াম জে. কৃষ্টি উইলসন ঃ ইসলাম, নিউ ইয়র্ক ১৯৫০

(ঙ) "কুরআন মুসলমানদের বাইবেল এবং ইহুদীদের পুরাতন নিয়ম অথবা খৃস্টানদের নতুন নিয়ম গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক সম্মানিত।" জে শিলাইডি. ডি. ডি: **দি লর্ড জিসাস ইন দ্য কুরআন**

আমরা এরূপ ডজনেরও বেশি প্রশংসাসূচক মন্তব্য এ তালিকায় সংযুক্ত করতে পারি। শত্রু ও মিত্র সমানভাবে আল্লাহর সর্বশেষ প্রত্যাদেশ পবিত্র কুরআন সম্পর্কে দ্বিধাহীন প্রশংসা করেছেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর সমসাময়িক যারা তারা এই পবিত্র গ্রন্থের সৌন্দর্য ও রাজকীয় ঐশ্বর্যের বাণীর মহিমময়তা ও এর আহবানের মহত্ত্ব এবং আল্লাহর নিদর্শনের অলৌকিকতা প্রদর্শন করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

অবিশ্বাসী ও সন্দেহপরায়ণ ব্যক্তিরা এসব প্রশংসাসূচক মন্তব্য ও সাক্ষ্যকে বলবে আত্মগত অনুভূতি মাত্র। সে হয়তো আরবি জানে না বলে আত্মরক্ষার সুযোগ খুঁজবে। সে হয়তো বলবে, "তোমরা যা দেখ আমি তা দেখি না, তোমরা যা অনুভব কর আমি তা অনুভব করি না। আমি কেমন করে জানব আল্লাহ্ আছেন এবং তিনি তাঁর প্রেরিত মুহাম্মদ (সা)-কে অনুপ্রাণিত করেছিলেন কুরআনের মত সুন্দর বাণী তিলাওয়াত করে মানুষকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান করতে। আমি কেমন করে জানব কুরআনের দর্শন ও তার সৌন্দর্য, তার বাস্তব নৈতিকতা এবং উচ্চ আদর্শ এই সবের প্রতি আমার সমর্থন আছে।

কেউ হয়তো এও বলবে আমি স্বীকার করতে রাজি যে মুহাম্মদ (সা) একজন সত্যনিষ্ঠ আন্তরিক মানুষ ছিলেন এবং মানুষের কল্যাণের জন্যই অনেক সুন্দর ধারণাও দিয়েছেন। কিন্তু তোমাদের সাথে একমত হতে পারি না যে, এসবের পিছনে এক অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা রয়েছে, যার নির্দেশে এইসব কিছু হচ্ছে।

ন্যায়সঙ্গত যুক্তি

সহানুভূতি মনোভাবাপন্ন অথচ সংশয়বাদী মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে মহাগ্রন্থের স্রষ্টা তাদের সন্দেহ দূর করার জন্য নানাবিধ যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। অবিশ্বাসী সংশয়বাদী হতাশাগ্রস্ত অথচ যারা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার নিয়ে বসে আছেন আর নিজেদেরকে বুদ্ধির পাহাড় মনে করেন। কিন্তু তারা বাস্তবে খাটো বামন ব্যতীত আর কিছুই নয়। তারা অনেকটা বিকৃত দেহী বামনদের মত যার এক অংশের পরিবর্তে অপর অংশ অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে; যেন তারা অনেকটা ছোট্ট এক দেহে বিশাল আকৃতির মস্তক বিশিষ্ট প্রাণী। তাদেরকে পরম স্রষ্টা আল্লাহ্ প্রশ্ন করেছেন।

আল্লাহ্র সেই প্রশ্ন উপস্থাপন করার পূর্বে প্রথমে আমাদের ঔৎসুক্য প্রশমিত করা যাক।

'আপনারা যারা বিজ্ঞানী, যারা জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়ন করেছেন, বিশাল আকৃতির দূরবীনের সাহায্যে সমস্ত বিশ্ব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অবলোকন করছেন, এসব বস্তুকে যেন হাতের তালুতে রেখে পরীক্ষা করে দেখার মতো জ্ঞান আপনাদের নেই। আপনি বলুন তো "এই বিশ্বজগত কেমন করে সৃষ্টি হল?" আত্মিক জ্ঞানের অভাব থাকা সত্ত্বেও সেই বৈজ্ঞানিক অত্যন্ত উদারভাবে বলবেন, "কোটি কোটি বছর আগে বিশ্বজগৎ একটি মাত্র জড়বস্তু রূপে বিদ্যমান ছিল। তখন সেই পদার্থের কেন্দ্রে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল, যাকে বলা হল বিগ-ব্যঙ বা মহাবিস্ফোরণ। সেই বিস্ফোরণে সমস্ত পদার্থ বা বস্তুজগত চতুর্দিকে ছুটতে আরম্ভ করল, উড়তে আরম্ভ করল। সেই বিগ ব্যঙ-এর মধ্য দিয়ে আমাদের সৌর জগত, ছায়াপথ, তারকামণ্ডল, গ্রহ, উপগ্রহ সৃষ্টি হল। মহাশূন্যের সেই প্রাথমিক বিস্ফোরণের ফলে গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি বিনা বাধায় সন্তরণ করে চলল।"

সেই মুহূর্তে আমার মনে পড়ল কুরআন শরীফের সূরা ইয়াসীনের কথা। মনে হল আমার বস্তুবাদী বন্ধু সম্ভবত সেখান থেকেই গোপনে জ্ঞান লাভ করেছেন।

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۭ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝ وَالْقَمَرَ
قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ۝ لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِىْ لَهَآ
اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۭ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ۝

এবং সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি নির্দিষ্ট মন্‌যিল; অবশেষে তা শুষ্ক বক্র, পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে।

— কুরআন ৩৬ : ৩৮-৪০

আল্লাহ্ অবিশ্বাসী বৈজ্ঞানিক বলতে লাগলেন "আমাদের এই বিশ্বজগত চির সম্প্রসারণশীল। ছায়াপথগুলো পরস্পর থেকে ক্রমেই দ্রুততর গতিতে দূরে সরে যাচ্ছে। যখন তারা আলোর গতি লাভ করবে তখন তারা আর আমাদের দৃষ্টিগোচর

হবে না, আমাদেকে যদি সেগুলো পর্যবেক্ষণ করতে হয় অবিলম্বে অতি শীঘ্রই অধিকতর শক্তিশালী ও বৃহত্তর দূরবীন নির্মাণ করতে হবে। তা না হলে আর কখনই সম্ভব হবে না। আমাদের প্রশ্ন ঃ "কখন তোমরা এইরূপ কথা আবিষ্কার করলে?' আমাদের বন্ধু বৈজ্ঞানিকপ্রবর সাথে সাথেই আশ্বস্ত করে বললেন না, না, এগুলো রূপকথা নয়, একদম বৈজ্ঞানিক সত্য।" আমরা বললাম, "ঠিক আছে, তুমি যা বললে তা সত্য মেনে নেয়া গেল। কিন্তু তোমরা কবে এই সত্য আবিষ্কার করলে?" সে উত্তর দিল, "এই সেদিন বলা চলে গতকাল মাত্র।" মানুষের ইতিহাসে পঞ্চাশ বছর মাত্র গত কাল? আচ্ছা, একজন অশিক্ষিত মরুবাসী আরবের পক্ষে ১৪০০ বছর আগে আপনার এই বিগ-ব্যঙ সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর ছিল, অথবা সম্প্রসারণশীল বিশ্বজগত সম্পর্কিত জ্ঞান?" আমার প্রশ্ন শুনে তিনি গর্বভরে বললেন, না, কখনই সম্ভব নয়।" "বেশ তো, তাহলে শুনুন সেই উম্মি পয়গম্বর আল্লাহ্ প্রত্যাদেশের মাধ্যমে কি উচ্চারণ করেছিলেন :

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ط

যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম।

— কুরআন ২১ : ৩০

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ٥

আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে। — কুরআন ২১ : ৩৩

মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব

আপনি কি দেখছেন না উপরের আয়াতে 'আপনাকে উদ্দেশ্য করেই বলা হচ্ছে "অবিশ্বাসীগণ"অর্থাৎ বর্তমানে যেসব বৈজ্ঞানিক, ভূগোলবিশারদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী যারা এই সকল অভূতপূর্ব আবিষ্কার করে সেই আবিষ্কারকে মানব জাতির নিকট প্রচার করেছেন, কিন্তু তারা আজও এর স্রষ্টাকে দেখেনি। তারা অন্ধ, "আমরা আমাদের বিজ্ঞান ও বিশ্বজ্ঞান নিয়ে আমাদের গবেষণাগারে সহজে-এর ঐশ্বরিকতা ভুলে গিয়েছি। থমাস কার্লাইল বলেন, "পৃথিবীতে কোথায় মরুভূমির এক উষ্ট্র চালক

[মুহাম্মদ (সা)] ১৪০০ বছর পূর্বে তোমাদের জ্ঞানকে শানিত করতে পারত" যদি না তিনি বিগ-ব্যঙ বা মহাবিস্ফোরণের স্রষ্টার কাছ থেকেই সেই জ্ঞান লাভ করে থাকতেন'।

প্রাণের উৎস

"আপনারা, প্রাণবিজ্ঞানীগণ মনে হয় সকল জৈব প্রাণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল; তথাপি প্রাণের উৎস যে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে স্বীকার করেন না। আপনাদের মহাশক্তিশালী গবেষণার ফলে প্রাণের সূত্রপাত কোথায়, কিভাবে হয়েছিল তা বলুন তো? এই প্রশ্নের উত্তরে অবিশ্বাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানীর ন্যায় তিনিও বললেন, "কোটি কোটি বছর পূর্বে আদিম সমুদ্রের পানিতে প্রোটোপ্লাজমের উদ্ভব হতে থাকে। তা থেকে এ্যমিবা সৃষ্টি হয়। সমুদ্রের এই এ্যমিবা থেকে প্রাণীজগতের বিকাশ ঘটে। এক কথায় বলতে গেলে সমুদ্র অর্থাৎ পানি থেকেই জীবনের সূত্রপাত।" আপনারা কবে আবিষ্কার করলেন যে পানি থেকেই প্রাণীজগতের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। এর উত্তরেও আগের জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মতো তিনি উত্তর দিলেন, "এই সেই দিন — বলা চলে মাত্র গতকাল।"

আমাদের প্রশ্ন ঃ "১৪০০ বছর পূর্বে আপনাদের প্রাণীবিজ্ঞানের এই আবিষ্কার সম্পর্কে সে যুগের কোন জ্ঞানী অথবা দার্শনিক অথবা কোন কবির কোন ধারণা থাকা সম্ভবপর ছিল কি?" পূর্বের জ্যোতিবিজ্ঞানীর ন্যায় তিনিও অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে বললেন ঃ "না, কখনই না।" তাহলে শুনুন সেই অশিক্ষিত মরুসন্তানের মুখ থেকে কি উচ্চারিত হয়েছিল ঃ

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ط أَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ٥

এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে; তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না? — কুরআন ২১ : ৩০

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ ج وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ج وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰىٓ أَرْبَعٍ ط يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ط إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

আল্লাহ্ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে। এদের কতক পেটে ভর দিয়ে চলে, কতক দু'পায়ে চলে এবং কতক চলে চার পায়ে, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। — কুরআন ২৪ : ৪৫

উপরোক্ত পঙ্‌ক্তিমালা থেকে আপনাদের হয়তো অনুধাবন করা কঠিন হবে না যে, মহাপরাক্রমশালী বিশ্বস্রষ্টা বর্তমানের সংশয়বাদী আপনার মত জ্ঞানী ব্যক্তিদের লক্ষ্য করেই এসব বাণী প্রেরণ করেছিলেন। আজ হতে ১৪০০ শত বছর পূর্বে কোন মরুবাসীর পক্ষেই এসব কথার প্রকৃত অর্থ বোধগম্য ছিল না। আল্লাহ্, যিনি এই গ্রন্থের রচয়িতা, "আপনাদেরকেই" বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, আপনারা বৈজ্ঞানিক, আপনারা কেন আল্লাহকে বিশ্বাস করেন না? আপনি কেন আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অস্বীকারকারী হবেন, কেন আপনি হবেন আল্লাহ্‌র সর্বশেষ অস্বীকারকারী। কিন্তু আপনি হয়েছেন প্রথম। আপনাদেরকে এ কোন্ রোগ আক্রান্ত করেছে যে আপনাদের বিবেচনাবোধ ইগো দ্বারা আবৃত হয়ে আছে!

উদ্ভিদবিজ্ঞানী, প্রাণীবিজ্ঞানী, পদার্থবিদ তাদের অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও মহান স্রষ্টাকে স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না।

আল্লাহ্‌র মুখপাত্র হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এসব বিষয়ে আরও কি উচ্চারণ করেছেন সেগুলোও খতিয়ে দেখা যাক ঃ

سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ○

পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং ওরা যাদেরকে জানে না তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে। — কুরআন ৩৬ : ৩৬

"জোড়া জোড়া করে" — এক রহস্যজনক যৌনবোধ মানব জগৎ, প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ ও অন্যান্য অনেক কিছু যার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নেই এই সকল সৃষ্টির মাঝে অব্যাহতভাবে বহমান রয়েছে। তারপরও প্রকৃতির মধ্যে বিপরীতধর্মী শক্তির জোড়া যেমন বিদ্যুতে পজেটিভ (+ve) ও নেগেটিভ (-ve) ইত্যাদি। ক্ষুদ্র পরমাণুর মধ্যে রয়েছে পজিটিভ চার্জ বিশিষ্ট নিউক্লিয়াস অথবা প্রোটেন তার চারপাশে নিগেটিভ চার্জবিশিষ্ট ইলেক্ট্রন অর্থাৎ প্রাণহীন বস্তুর মধ্যেও রয়েছে এই জোড়ার সম্পর্ক। — আল্লামা ইউসুফ আলী

আল্লাহ্‌র চিহ্ন

পবিত্র কুরআন স্পষ্টতই স্বব্যাখ্যাত এক মহাগ্রন্থ।

পবিত্র কুরআনের ছাত্ররা নির্ভুলভাবে মানুষের তৈরি প্রতিটি আবিষ্কারে আল্লাহ্‌র অঙ্গুলির ছাপ লক্ষ্য করেন। এগুলো মহামহিম প্রভু মহাদাতা আল্লাহ্‌র নিদর্শক "চিহ্ন", এগুলো তাঁর অলৌকিকতা। এগুলো তাঁর প্রতি বিশ্বাসকে শক্তিশালী ও সন্দেহকে দূর করার জন্য দিয়েছেন ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ○

এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদিগের ভাষা এবং বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। — কুরআন ৩০ : ২২

দুর্ভাগ্যের বিষয়! এসব তথাকথিত জ্ঞানী ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহ মনোভাবাপন্ন। বিপুল পরিমাণে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান আহরণ করে তাদের গর্ব সম্প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের সঙ্গে যে বিশুদ্ধ বিনয় থাকার প্রয়োজন তা তাদের নেই।

একজন আধুনিক ফরাসি পণ্ডিত ব্যক্তি বলেন "উপরোক্ত মতামতের প্রেক্ষিতে সেই পূর্ব ধারণাকে অধিকতর শক্তিশালী করে যে, যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে কুরআনের রচয়িতা বলে মনে করে তাদের ধারণা সঠিক নয়। একজন মানুষ সম্পূর্ণ অশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র আরবি সাহিত্যের মধ্যে গুণগত দিক হতে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের রচয়িতা তিনি কি করে হতে পারেন? তিনি কি প্রকারে বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির সত্য উচ্চারণ করতে পারলেন, যখন মানব সভ্যতা সেই পর্যায়ে পৌঁছায়নি, কিন্তু সে বিষয়ে তিনি যে উচ্চারণ করেছিলেন তার মধ্যে বিন্দু পরিমাণও ভ্রান্তি ছিল না।"

প্রথম অনুপ্রেরণা

এই পুস্তিকা **'আল-কুরআন'—এক বিস্ময়কর অলৌকিকতা'** রচনার বীজ রোপিত হয়েছিল সম্ভবত ইসলামের ভ্রাম্যমাণ দূত সুললিত কণ্ঠস্বরের অধিকারী মওলানা আবদুল আলীম সিদ্দীক কর্তৃক। ১৯৩৪ সালে আমি তখন স্কুলের ছাত্র। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ওয়াজ করতে এসেছিলেন। তাঁর অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণের মধ্যে মুসলমানদের বিজ্ঞান চর্চা বিষয়ক বক্তব্য শুনেছিলাম। পরবর্তীকালে ঐ নামে একটি পুস্তিকা পাকিস্তানের করাচি শহরের ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ইসলামিক মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। সেই তরুণ বয়সে ঐ বক্তৃতা শুনে ও পুস্তিকা পাঠ করে যে আনন্দ লাভ করেছিলাম তা মনে হলে আজও খুশিতে বুক ভরে যায়। ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য সেই মহান ইসলামের খাদেম সেদিন যেসব কথা বলেছিলেন তাকে স্মরণ করার জন্য তারই কিছু অংশ এই পুস্তিকাতে তুলে ধরছি। সেদিন মওলানা পবিত্র কুরআন এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তার বর্ণনা দিয়েছিলেন এভাবেঃ

বিজ্ঞানের প্রতি পরামর্শ

"বিশ্বের ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে পবিত্র কুরআন বিশ্বজগতের জ্ঞান অন্বেষণের বিষয়ে অধ্যয়নের প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করেছে তা এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য। আমাদের চারদিকে যে অসংখ্য প্রাকৃতিক ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে তার প্রতি বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বারবার পবিত্র কুরআনে মুসলমানদেরকে উপদেশ প্রদান করা হয়েছে তারা যেন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ করে এবং এসব বিষয়ে অধ্যয়ন তাদের ধর্মীয় কর্তব্য। বারবার পবিত্র কুরআন গুরুত্ব সহকারে নির্দেশ করেছে, বিশ্বপ্রকৃতির যা কিছু সবই মানুষের সেবার জন্য। তাই তারা যেন এই প্রকৃতিকে তাদের নিজের কাজে লাগায়। এখানে আমাদের প্রতি উপদেশ রয়েছে আমরা যেন মানবদেহের কাঠামো ও কার্যক্ষমতা অধ্যয়ন করি। আমরা যেন প্রাণীজগতের বৈচিত্র্য, কাজ ও শ্রেণীবিন্যাস অধ্যয়ন করি, আমরা যেন অধ্যয়ন করি উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস এগুলোর কার্যপ্রণালী এবং গঠনপ্রকৃতি। এগুলোর অনেক কিছুই জীববিজ্ঞানের সমস্যা। পবিত্র কুরআন আমাদেরকে প্রাকৃতিক নিয়ম এবং বস্তুর সাধারণ গুণ সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে উপদেশ দেয়-এগুলো আধুনিক পদার্থবিদ্যার সমস্যা। বিশ্বাসকে দৃঢ় করার জন্য সৃষ্টির অন্তর্নিহিত রহস্যের গভীরে প্রবেশ করে তার থেকে জ্ঞান অন্বেষণ করা আমাদের কর্তব্য।

পবিত্র কুরআন আমাদেরকে উপদেশ দেয় যেন আমরা মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের গুণাগুণ এবং তাদের সংযোগের নিয়ম এবং সংযোগের ফলে একের উপর অপরের কি প্রভাব যা আধুনিক রসায়নবিদ্যার বিষয় তা অধ্যয়ন করি। পবিত্র কুরআন আমাদেরকে ভূগর্ভের খনিজ পদার্থের কাঠামো, গঠনপ্রকৃতি, বিন্যাস, তার জৈব ও অজৈবিক পরিবর্তন ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে গভীর অধ্যয়নের নির্দেশ দেয়। এ সম্পর্কে অজ্ঞতা আধুনিক ভূবিদ্যার সমস্যা। পবিত্র কুরআন আমাদেরকে উপদেশ দেয় আমরা যেন পৃথিবীর সাধারণ পরিচয়, এর প্রাকৃতিক বিভাজন যেমন সমুদ্র, নদী, পর্বত, সমভূমি ইত্যাদি সম্পর্কে অধ্যয়ন করি। আমরা যেন অধ্যয়ন করি পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় বিভাজন সম্পর্কে। এসব বিষয় আধুনিক ভূগোলের অন্তর্গত। পবিত্র কুরআন আমাদেরকে উপদেশ দেয়, যেগুলো আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিষয়। যেমন ঃ আমরা যেন দিন ও রাতের পরিবর্তন, মৌসুমের পরিবর্তন, গ্রহ-নক্ষত্রের গতি-প্রকৃতি অধ্যয়ন করি।

পবিত্র কুরআন উপদেশ দেয় আমরা যেন বাতাসের চলাচল, মেঘের সংঘটন ও বিবর্তন বৃষ্টির বর্ষণ ইত্যাদি বিষয় অধ্যয়ন করি। এগুলো আবহাওয়া বিজ্ঞানের বিষয়। বহু শতাব্দী যাবত বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মুসলমানরা ছিল অগ্রগামী। তারপর ধীরে ধীরে এই নেতৃত্ব তাদের হাত থেকে সরে গেছে। মুসলমানরা তাদের নেতৃত্বের ভূমিকায় অকৃতকার্য হতে লাগল। ফলে বস্তুবাদী ইউরোপ মুসলমানদের তৈরি নেতৃত্বের শূন্য স্থান পূরণ করল। মওলানা মুসলমানদের অবদান সম্বন্ধে বলেছেন যে,

"ইসলাম যে বুদ্ধিবৃত্তিক অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল সেটি ছিল এক বিশাল কর্মকাণ্ড। জ্ঞানের এমন কোন শাখা ছিল না, যেখানে মুসলমান পণ্ডিতদের হাত পড়েনি। সেখানে তাদের নিজেদের জন্য উচ্চ আসন সৃষ্টি করে নিয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম চায় মুসলমান সমাজ হবে বুদ্ধিভিত্তিক সমাজ গঠন। ইসলামের প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে বিজ্ঞান ও অন্য সকল বিষয়ে জ্ঞানচর্চা। মুসলমানরা না হলে ইউরোপ কোনদিন রেনেসাঁ দেখতে পেত না এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের সূচনাও হত না। যে সকল জাতি ইউরোপের নিকট হতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করেছে তারা প্রকৃতপক্ষেই অতীতের ইসলামী সমাজের পরোক্ষ শিষ্য। মানবতা ইসলামের নিকট এমন ঋণে আবদ্ধ, যা পরিশোধ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। বিশ্ব নানাভাবে ইসলামের নিকট কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ।

সুবক্তা ও সুভাষী মওলানা সাহেব মুসলমান কর্তৃক বিজ্ঞান চর্চা বিষয়ে সেই অসাধারণ বর্ণনা শেষ করতে গিয়ে বললেন ঃ "সর্বশেষ একটি কথা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলছি, মুসলিম সমাজ ইসলাম থেকেই জন্ম নিয়েছে। অন্যদিকে ইসলাম মহান আল্লাহর প্রত্যাদেশে গভীরভাবে প্রোথিত। বিশ্বাস ও অনুশীলনের মাধ্যমেই যা কোন মানুষকে প্রকৃত মুসলমান হতে হয়, অন্যভাবে নয়। ইসলাম বলে, একজন মুসলমান তার চারপাশে যে বাস্তব জগত সে সম্পর্কে প্রশ্ন করবে এটাই তার ধর্মীয় কর্তব্য। এই প্রশ্নের মাধ্যমে তার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, তাকে তার স্রষ্টা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের দিকে পরিচালিত করবে। ইসলামে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নয় বরং উচ্চতর লক্ষ্যে পৌঁছার পথ এবং এটাই প্রকৃতপক্ষে মানবতার প্রকৃত গন্তব্যস্থল।"

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

আমরা তো আল্লাহ্‌র এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।

— কুরআন ২ : ১৫৬

আমার স্থগিত বক্তৃতা

১৯৩৪ সালে সেই মহান ব্যক্তিত্ব মওলানা আবদুল আলীম সিদ্দিকীর উপরে বর্ণিত ভাষণ তার নিজের মুখে শুনবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। ৩০ দশকের শেষ দিকে সেই বক্তৃতাটির একটি পুস্তিকা যখন হাতে পেলাম তখনই সেটি সামান্য কিছু পরিবর্তন করে মুখস্থ করে ফেললাম। তখন আমি এডামস মিশন স্টেশনে এক মুসলমান দোকানে কর্মরত। আমার এমনই উৎসাহ হলো যে এডামস কলেজের ছাত্র শিক্ষকদের সম্মুখে আমি নিজেই ঐ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করে ফেললাম।

সেই সময় আমার ধারণা ছিল না যে এমন গভীর তাত্ত্বিক বিষয়ে বক্তব্য রাখা কতখানি কঠিন। আমি জানতাম না আমার মুসলমান মালিক এই সমস্যা থেকে আমাকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসবেন। তিনি হুমকি দিলেন আমি যদি সে বক্তৃতা বাতিল না করি তাহলে আমাকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করবেন। আমি পিছিয়ে গেলাম। আমার মালিক নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সাবধান বাণী সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। আমি তারই মত, অধিক কিছু জানি না। আমি বলতে পারি না সেদিন যদি আমার কর্মসূচি স্থির থাকত তাহলে কি করতাম। আল্লাহ্ তিরস্কার করে বলেন ঃ

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَ
عَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ
كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

বল, 'তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্‌র বিধান আসা পর্যন্ত।' আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

— কুরআন- ৯ : ২৪

আমার দুর্বল ভাইদেরকে ধন্যবাদ (?) অনেক যত্ন করে পরিশ্রম করে মহড়া দিয়ে খ্রিস্টান মিশনারি ও শিক্ষার্থী পাদ্রীদের সামনে বক্তৃতা দেওয়ার যে পরিকল্পনা করেছিলাম সেটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। সম্ভবত আমার জন্য সম্মুখে বক্তৃতা দেওয়ার ধারা প্রায় দশ বছরের মতো থমকে দিয়েছিল। পৃথিবীতে সম্ভবত আমার দোকানের মালিকের মত অসংখ্য মুসলমান আছে যারা পার্থিব সম্পদ হারানোর ভয়ে নিজেরা ইসলামের বাণী প্রচারে বিরত থাকে, শুধু তাই নয়, অন্যকেও বাধা দেয়।

চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা উচিত

মওলানার পূর্বে উল্লিখিত বক্তৃতায় কুরআনের যে উপদেশসমূহের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে সেগুলো নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে। জীববিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ভূবিদ্যা, আবহাওয়া তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা করার জন্য পবিত্র কুরআনে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্পর্কিত অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এই সকল রচনাকারীর মধ্যে রয়েছে মরিস বুকাইলি, কিথ মুর, শেখ জিন্দানি প্রমুখ পণ্ডিত। এই বিষয়টির সম্ভাবনা অসীম। পবিত্র কুরআন জ্ঞানের এক মহাসমুদ্র। বর্তমান বিশেষজ্ঞের যুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের উচিত ত্রিশ দশকের মধ্যভাগে মওলানা যে ইশারা দিয়েছিলেন সেই বিষয়ে কাজ করার দায়িত্ব গ্রহণ করা। সকলকে সর্ব বিষয়ে কাজ করতে হবে না। যে বিষয় যার সে সেই বিষয়ে কাজ করতে পারে। মুসলিম তরুণ সমাজ তথ্যের জন্য ক্ষুধার্ত। তারা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ের উপর প্রবন্ধ ও রচনা পাঠ করতে আগ্রহী। মুসলমান বিজ্ঞানীদের নিকট পবিত্র কুরআনের বিজ্ঞান বিষয়ক নিদর্শন অন্বেষণ করার জন্য যে অনুরোধ জানিয়েছি সেই জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। কারণ এই বিষয়ে অমুসলমানদেরকেও উৎসাহিত করা উচিত। একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে আমার দিক থেকে পবিত্র কুরআন যেগুলো সাধারণ ঘটনা বলে মনে হয় সেগুলো প্রকৃতপক্ষে অলৌকিক।

অধ্যায় তিন

আল-কুরআন : অভূতপূর্ব সংরক্ষণ পদ্ধতি

বিশ্বের পুরাতন ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর মধ্যে যেগুলো আজও বিদ্যমান তার মধ্যে পবিত্র কুরআন সম্পূর্ণরূপে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এর লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ প্রকৃতই অলৌকিক। সাধারণভাবে মানুষ যা কিছু বর্ণনা করে তা থেকে এর বর্ণনা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। স্বল্পদৃষ্টি সম্পন্ন ও বৈরিভাবাপন্ন অনেকেই এই মহাগ্রন্থকে সাম স্যহীন বা অসম্বন্ধ বলে থাকেন। এই মহাগ্রন্থের সজ্জিতকরণ রীতি অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এর কোন তুলনা নেই। এটিই এর বিশেষত্ব। এটি অলৌকিক, আমার বক্তব্যকে উপমা দ্বারা প্রমাণ করতে চেষ্টা করব।

মানবিক পদ্ধতি

অন্যান্য প্রতিটি ধর্মীয় গ্রন্থ্ এক বিশেষ গতানুগতিক ধারায় বর্ণিত, অনেকটা 'একদা এক শিয়াল... অথবা এক মেষ শাবক..... ইত্যাদির, মতঃ যেমন,

১ **আদিতে (একদা) ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন।**

— আদি পুস্তক ১ : ১

আদিতে (একদা) বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন।

— যোহন ১ : ১

৩. **যিশু খ্রিস্টের বংশাবলি পত্র (আরম্ভ), তিনি দাউদের সন্তান, আব্রাহামের সন্তান।**

— মথি ১ : ১

৪. **সদাপ্রভুর দাস, মোশির মৃত্যু হলে পর সদাপ্রভুর নূনের পুত্র যিহোশূয় নামে মোশির পরিচারককে বললেন।**

— যোসুয়া ১ : ১

৫. **যিহোশূয়র মৃত্যুর পর ইস্রায়েল সন্তাগণ সদাপ্রভুর কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন।**

— বিচারকগণ ১ : ১

৬. **আর বিচারককর্তৃকগণের কর্তৃত্বকালে দেশে একবার দুর্ভিক্ষ হয়।**

— রূত ১ : ১

৭. **পর্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশস্থ রামাথিমসোফীম নিবাসী ইলআকানা নামে একজন ইফ্রয়িমী ছিলেন।**

— ১ স্যামুয়েল ১ : ১

৮. **শৌলের মৃত্যুর পরে এই ঘটনা হল।**

— ২ স্যামুয়েল ১ : ১

৯. **দায়ূদ রাজা বৃদ্ধগত বয়স্ক হয়েছিলেন; এবং লোকেরা তার গাত্রে অনেক বস্ত্র দিলেও তা উষ্ণ হত না।**

— ১ রাজা

১০. **পারস্য-রাজা কোরসের প্রথম বছর যিরমিয় দ্বারা কথিত সদাপ্রভুর বাক্যসিদ্ধির নিমিত্ত।**

— ইস্রা ১ : ১

১১ **অহশ্বেরশের সময়ে এই ঘটনা হল।**

— ইষ্টেরের ১ : ১

১২ **ত্রিংশ বৎসরের চতুর্থ মাসে, মাসের পঞ্চম দিবসে, যখন আমি কবার নদীর তীরে।**

— যিহিস্কেল ১ : ১

এসব উদাহরণ আমাদের যদি দিশেহারানা করে তাহলে আর কি আছে যা আমাদের দিশেহারা করবে?

আমরা নিশ্চয়ই 'একদা এক' অস্বাভাবিক অবস্থা নির্দেশক লক্ষণসমষ্টি দ্বারা আক্রান্ত। মানুষের তৈরি কাহিনীর প্রতি আমাদের এক প্রকার পক্ষপাত সৃষ্টি হয়েছে। এসব কাহিনী যদি সত্যিও হয় বর্ণনাভঙ্গি, বিন্যাসধারা, সজ্জিতকরণ প্রক্রিয়া সবই এক প্রকার। এভাবেই মানুষ চিন্তা করে, কথা বলে, লেখে সেইজন্য তাকে দোষ দেয়া যায় না। মানুষ মানুষই।

উপরে যেসব উদাহরণ দেওয়া হল এ সবগুলো খ্রিস্টান জগতের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সংস্করণের বাইবেল গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। লক্ষণীয় যে, উপরের উদ্ধৃতিগুলো বাইবেলের প্রতিটি বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পঙ্‌ক্তি। প্রতিটি আরম্ভে বলা হয়েছে এখন অর্থাৎ 'একদা। যে কেউ বাইবেলের পুস্তকগুলোর মধ্যে এই প্রকার আরম্ভ আরও খুঁজে পেতে পারেন তবে বাইবেলে ব্যবহৃত শব্দাবলির বর্ণনা ক্রমিক সূচি দেখলে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না। আমি যেভাবে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পাঠ করে অগ্রসর হয়েছি সেভাবেই অগ্রসর হতে হবে।

বাইবেলের বর্ণনাক্রমিক শব্দসূচির সাহায্যে নয়

আমি বাইবেলের দুটি বর্ণনাক্রমিক শব্দসূচি পরীক্ষা করে দেখেছি। একটির প্রকাশক খ্রিস্টানদের মধ্যে জিহোভার সাক্ষী নামক শাখা (Jehova's Witnesses) অপরটির প্রকাশক ইয়োংস এনালিটিকাল কোনকরডেন্স (Young's Analytical Concordance to the Bible)। দুটিতেই ৩,০০,০০০ শব্দসূচি রয়েছে। সেখানে ২৭ টা 'এখন' বা 'Now' রয়েছে, কিন্তু আমি যে উদ্ধৃতিগুলো দিলাম তার একটিও সেখানে নেই। এর কারণ সহজেই অনুমেয়।

আমি আপনাদের ধৈর্যের উপর চাপ সৃষ্টি করতে চাই না। আমি বুঝতে পারছি আপনারা চাচ্ছেন আমি অগ্রসর হই। আপনারা বলবেন, "ঠিক আছে, এখন মেহেরবানী করে আপনি আপনার কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার গল্প বলুন।"

আমি বলতে আরম্ভ করি, "সেদিন রমযান মাসের ২৭ তারিখের রাত। ইসলামের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মক্কা শহরের বাইরে হেরা গুহায় অবস্থান নিয়েছেন। প্রায়ই তিনি হেরা গুহা পর্বতের গুহায় শান্তি, নীরবতা ও ধ্যান করার জন্য অবস্থান নিতেন। তার দেশবাসীর মাতলামী, বদমায়েশী, পৌত্তলিকতা, বিবাদ-বিসংবাদ, অবিচার, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হয়ে সমাধানের উপায় অনুসন্ধান করতেন। এমন অবস্থা যে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গীবন তাঁর Decline and Fall of the Roman Empire গ্রন্থে বলেছেন ঃ আরবরা মানুষরূপী পশু। অন্যান্য প্রাণীজগত হতে তাদের পার্থক্য খুব কম। কোন প্রকার বিবেচনাবোধ তাদের নেই।"

"হেরা পর্বতে নির্জনে সমস্যা সমাধানের গভীর চিন্তায় মগ্ন। প্রায়ই একাকী সেখানে যান। কিন্তু কখনো কখনো প্রিয়তম স্ত্রী উম্মুল মুমেনিন খাদিজাতুল কোবরা সঙ্গে থাকেন।

প্রথম আহ্বান

এক রাত— লায়লাতুল কদরের রাত। যখন আল্লাহ্‌র অনাবিল শান্তি সমস্ত সৃষ্টি জগতের উপর নেমে আসে এবং সমস্ত প্রকৃতি আল্লাহ্‌র দিকে উর্ধ্বমুখী হয় সেই রাতের মধ্যপ্রহরে আল্লাহ্‌র কিতাব তৃষ্ণার্ত আত্মার নিকট উন্মুক্ত হল। আল্লাহ্‌র ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) তার নিকট উপস্থিত হলেন এবং তার মাতৃভাষায় তাকে নির্দেশ করলেন ঃ 'ইকরা' অর্থ 'পাঠ কর' অথবা উচ্চারণ কর অথবা ঘোষণা কর। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এতে ভয় পেলেন এবং সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। এটা কোন ডিগ্রী প্রদান বা কনভোকেশন অনুষ্ঠান নয়। তিনি ভয়ে সচকিতভাবে চিৎকার করে বলে উঠলেন: "মা আনা বেকারিন" যার অর্থ "আমি শিক্ষিত নই।" ফেরেশতা পুনরায় আহবান করলেন, 'ইকরা'। দ্বিতীয় বার একই ভাবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন । জিবরাঈল

(আ) তাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে তৃতীয়বার আহবান করলেন ঃ ইকরা বিসমে রাব্বিকাল্লাজী খালাক্। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এখন অনুধাবন করলেন তাকে কি করতে হবে, যা বলা হয়েছে তাই পুনরায় উচ্চারণ করতে হবে। যেহেতু আরবি শব্দ 'ইকরা' অর্থাৎ 'পড়' উচ্চারণ কর আবৃত্তি কর। সূরা আলাক-এর উপরোক্ত প্রথম আয়াতের পর আরও চারটি আয়াত পুনরায় বলা হয় এবং পাঠ করা হল যেগুলো এভাবেই এলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর উপর প্রথম প্রত্যাদেশ। অবশেষে পবিত্র কুরআন লিখিত হল।

"জনাব দীদাত, থামুন" আমি যেন আপনার চিৎকার শুনতে পাচ্ছি। আপনার কুরআন নাযিল সম্পর্কিত যে বর্ণনা সেগুলো আপনি বলছেন, যে অসংখ্য উদাহরণ দিয়েছেন তা থেকে এটিও ভিন্ন নয়। সেগুলো মানুষের হাতে তৈরি। সেগুলো কি ঐশ্বরিক নয়? ভ্রম প্রবণ? ঠিক! আমি আনন্দিত যে আপনি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন কিভাবে মানুষের আত্মগত মন চিন্তা করে কথা বলে এবং লিপিবদ্ধ করে। যখন হতে আপনি আমাকে বললে, কুরআন প্রত্যাদেশ সম্পর্কিত কাহিনী বলুন এবং আমি বলতে শুরু করলাম- **" সেদিন রমযান মাসের ২৭ তারিখের রাত। ...... অত:পর পবিত্র কুরআন লিখিত হল।"** এগুলো ছিল আমার কথা, পবিত্র কুরআন থেকে, হাদীস থেকে, ইতিহাস থেকে এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছ থেকে ধার করা কথা; এগুলো আমি দীর্ঘদিন ধরে শুনে আসছি। পবিত্র কুরআনের ধর্মগ্রন্থে মানুষের হাত আছে তেমন কোন ছায়া সেখানে নেই। এটিই যেভাবে এসেছে সেইভাবেই সংরক্ষিত হয়েছে। নিম্নে আমি আপনাদের পরীক্ষার জন্য নাযিলকৃত প্রথম পাঁচ আয়াত দিলাম।

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۗ

পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন — সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহা মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন — শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। — কুরআন ৯৬ : ১-৫

অদ্বিতীয় লিপিবদ্ধকরণ

পবিত্র কুরআনের বাণী নিবন্ধন, সে আরবি অথবা অন্য কোন ভাষায় অনূদিত হলেও একই ধারাক্রমে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সেখানে কোন 'যদি' এবং 'কিন্তু' নেই।

এই বাণী নিবন্ধনে অথবা তার অনুবাদে কোথাও পাওয়া যাবে না যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম "চল্লিশ বছর বয়সে তার প্রথম আহবান লাভ

করেছিলেন।"কোথাও পাওয়া যাবে না "তিনি হেরা পর্বতের গুহায় ছিলেন।" কোথাও পাওয়া যাবে না যে "তিনি জিবরাঈল (আ)-কে দেখলেন," অথবা "তিনি ভীত হলেন", অথবা 'ইকরা' শোনার পর তার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। প্রথম পাঁচ আয়াত শোনানোর পর ফেরেশতা যখন চলে গিয়েছিলেন তখন, "মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তিন মাইল দূরে মক্কা শহরে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজার নিকট দৌড়ে গিয়েছিলেন এবং তার উপর কি ঘটেছে তা বর্ণনা করেছিলেন ও তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিতে বলেছিলেন।"এভাবে যে বর্ণনার ধারা তাকে আমি বলি আমাদের পদ্ধতি, মানুষের পদ্ধতি, অথবা "একদা এক সময়ে" পদ্ধতি। পবিত্র কুরআনে এভাবে কোন কিছুই বর্ণিত হয়নি। এর বর্ণনা ও সংরক্ষণ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির, বলা চলে অদ্বিতীয় পদ্ধতি। সংক্ষেপে অলৌকিক।

তাছাড়া মানুষের সৃষ্ট যে কোন সাহিত্যকর্ম আরম্ভের একটি সূচনা থাকে। কিন্তু পবিত্র কুরআনের প্রথম শব্দ ও প্রথম আয়াত এই মহাগ্রন্থের প্রথম অধ্যায় অথবা প্রথম আয়াত নয়। এই আয়াতটি পবিত্র কুরআনের ৯৬তম অধ্যায়ে রয়েছে। কারণ এর স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয়তম রাসূলকে সেইভাবেই নির্দেশ করেছিলেন। পৃথিবীর কোন ধর্মগ্রন্থ এরূপ নয় অথবা এরূপ পদ্ধতিতে সংরক্ষিত বা লিপিবদ্ধ হয়নি। কারণ এই প্রত্যাদেশ আদি অকৃত্রিম বিশুদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত হয়েছে।

একজন কানাডিয়ান মনস্তত্ত্ববিদ

কানাডা থেকে আগত এক যুবকের সঙ্গে, সূরা "আল আলাক"এর প্রথম পাঁচ আয়াত যেটি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছিল, সেই বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ হয়েছিল আমার । আমি তাকে দক্ষিণ ভূমণ্ডলের সর্ববৃহৎ মসজিদ দেখাতে গিয়েছিলাম। কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম তিনি মনস্তত্ত্ব বিষয়ে স্নাতকোত্তর কোর্সে অধ্যয়ন করেছেন। আমি তাকে এই পাঁচটি আয়াতে করীমার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। বললাম, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে অভিজ্ঞতা ও বাণী লাভ করেছিলেন সেই ক্ষেত্রে পড়া, লেখা এবং শিক্ষা গ্রহণ যা তার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল এই বিষয়টি তিনি কিভাবে দেখছেন। লেখা বা পড়ার বিষয়ে তার কোন পূর্বাভিজ্ঞতা ছিল না, অথচ তাকে যখন পড়তে বলা হল এ অবস্থায় তাঁর মধ্যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে, যে অভিজ্ঞতার অস্তিত্ব ছিল না সেই শব্দগুলো পড়তে বলা হল, এই বিষয়টি আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন। তিনি বললেন, তিনি বুঝতে পারছেন না। স্বীকার করলেন যে বিষয়টির সমস্যা নিয়ে তিনি চিন্তা করছেন। আমি বললাম তাহলে তিনি যেভাবে বলেছেন, আমাদের সেটাই মেনে নেওয়া উচিত। তারপর আমি সূরা "নাজম" থেকে পাঠ করলাম ঃ

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ۙ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۚ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۗ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۙ عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۙ

শপথ নক্ষত্রের, যখন সেটি হয় অস্তমিত, তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়, এবং সে মনগড়া কথাও বলে না; এটা তো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়, তাকে শিক্ষাদান করে শক্তিশালী।

— কুরআন ৫৩ : ১-৫

তার দেশবাসীকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বলতে হয়েছে–

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

বল, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই , আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ।' — কুরআন ১৮ : ১১০

তরুণ কানাডিয়ান বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "বিষয়টি নিয়ে আমাকে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে।" আমরা যদি কুরআন শরীফ ভালভাবে পাঠ করি এবং সচেতন হই তাহলে বিজ্ঞানের যে কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পেতে পারি।

অলৌকিক সাংবাদিকতা

আইপিসিআই সেন্টারে সর্বক্ষণ মৌমাছির চাকের মত নানা লোক নানা কর্মে ব্যস্ত, সেখানে আলোচনা ও বক্তৃতা শোনার জন্য বহু লোকের সমাগম ঘটত। সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের অনেক প্রতিনিধিও উপস্থিত হত। একবার আমি আমার সাক্ষাতকার গ্রহণকারী একজন সাংবাদিককে বললাম, আমি তাকে দেখাব পবিত্র কুরআনের সাংবাদিকতার অলৌকিকতা।

শুনতে কেউ অস্বীকার করে না। আমি মহান পয়গম্বর হযরত মূসা (আ)-এর গল্প দিয়ে শুরু করলাম। বলার ধরন সেই "কোন এক সময় এক"-এর মতো। কোন উপায় নেই। যা হোক মূসা (আ) এবং বালরুশ অথবা মূসা (আ) শৈশবকাল তাঁর মা ও বোন এসব বিস্তারিত বর্ণনা করার অবসর ছিল না। সেগুলো বাদ দিয়ে আমি আরম্ভ করলাম 'একদিন মূসা (আ) দেখতে পেলেন দুজন লোক ঝগড়া করছে। লোক দুজনের একজন তার গোত্রের, অপরজন শত্রুপক্ষের। একজন ইহুদী, অপরজন

মিশরী। তিনি ইহুদীকে সাহায্য করতে গিয়ে এক পর্যায়ে তর্কের মাঝে মিশরীকে এমন এক থাপ্পর মারলেন যে মিশরী তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করল।

হযরত মূসা (আ) তখন দেশ ছেড়ে পালিয়ে সিনাই মরুভূমিতে আশ্রয় নিলেন। সেখানে মাইদানি গোত্রের লোক বাস করত। তাদের দুই সুন্দরী মেয়ে বিপদে পড়েছিল। তাদেরকে সাহায্যে করলেন, তখন তাদের বাবা তাকে চাকুরী দিলেন। এখানে আট বছর অতিবাহিত হল। হযরত মূসা (আ) এই নিম্নমানের জীবনযাপন করতে করতে অস্থির হয়ে উঠলেন । যে মানুষ নগরজীবনে রাজকীয়ভাবে বড় হয়েছেন তার পক্ষে এ জীবন আর ভাল লাগছিল না। তিনি তাঁর শ্বশুরের নিকট হতে মুক্তির জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সেই লোক বিবেচনা সম্পন্ন ও বাস্তববাদী বিধায় হযরত মূসাকে (আ) চলে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। হযরত মূসা (আ) তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদেরসহ তার অংশের প্রাপ্য ভেড়া ও ছাগলের পাল নিয়ে রওয়ানা দিলেন। কিছুকাল পর দেখলেন তিনি তখনও তার সিনাই অঞ্চলেই আছেন। পথের দিক হারিয়ে ফেলেছিলেন। সঙ্গে যে খাদ্য হিসাবে মাংস ছিল সেগুলো শেষ হয়ে গিয়েছে। অবশ্য তখনও যথেষ্ট ইহুদীদের রুটি 'মাদজো' ছিল। কিন্তু সমস্যা হল মাংসের। সেজন্য একটি গরু বা ছাগলকে জবাই করতে হয়। জবাই করা সহজ কিন্তু আগুন জ্বালানো কঠিন পরিশ্রমের কাজ। দুখণ্ড ভিন্ন প্রকৃতির বস্তু আধাদিন ঘর্ষণ করলে আগুন জ্বালানো সম্ভব। সেকালে তো আর দেশলাই বা লাইটার ছিল না। তাই তিনি গড়িমসি করতে লাগলেন, আজ করবেন না কাল করবেন। তারপর মাংসের সমস্যা দূর হবে ....”

-**“মিস্টার দীদাত আপনার অলৌকিক ঘটনা কোথায়?”**

-এতক্ষণ আমি গল্পের পশ্চাদভূমি বর্ণনা করছিলাম। অলৌকিকতা রয়েছে অন্যত্র। উপরের সমস্ত ঘটনা সেই সঙ্গে আরও কিছু ঘটনা মাত্র চার লাইনের বাক্যে রয়েছে। সেই চার লাইন অতি সুন্দর বাক্য। কিন্তু সেই সৌন্দর্য অনুধাবন করতে হলে আপনাকে আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করতে হবে। সেটি আমার নিকট সাংবাদিকতার সর্বোচ্চ নিদর্শন ডারবান শহর থেকে ত্রিশ কিলোমিটার উত্তরে আমার বাসা। অফিস শহরে। এন-২ ফ্রি ওয়ে (N-2 Freeway) তৈরি হওয়ার আগে আমি সমুদ্র পারের রাস্তা দিয়ে ডারহামে আসতাম। এই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় এমটি থিয়েটার অতিক্রম করতে হয়। এমপি থিয়েটারের সংযোগস্থলে নিয়মিত দেখতাম হকাররা দি নাটাল মারকারি নামে খবরের কাগজ বিক্রি করছে। তারা ক্রেতাকে আকৃষ্ট করার জন্য কাগজের হেড লাইন সম্বলিত প্লাকার্ড রাখে। বারবার ঐ প্লাকার্ড পড়ার পর একদিন স্থির করলাম ওখান থেকে সেদিন কাগজ কিনব না। তার পরিবর্তে সেন্ট্রাল

ডারবানে গাড়ি রাখতে গিয়ে অন্য হকারের কাছ থেকে কাগজ কিনেছিলাম। এই রকম বহু সিদ্ধান্ত আমরা পরিবর্তন করি। আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কারণ কি, আবিষ্কার করলাম একই খবরের কাগজ কিনেছিলাম কিন্তু তার প্লাকার্ড ছিল ভিন্নধর্মী-সমুদ্রপারে ইউরোপীয়দের আকৃষ্ট করে এমন প্লাকার্ড ছিল। কিন্তু পরে আমি যেখান থেকে কাগজ কিনেছিলাম সেখানে প্লাকার্ড ছিল এশীয়দের আকৃষ্ট করার জন্য। যেখানে আফ্রিকান এবং যেখানে কালোরা বসবাস করে সেখানে ভিন্ন রকমের প্লাকার্ড রেখে একই কাগজ বিক্রি করা সম্ভব।

অতএব ওস্তাদ সাংবাদিক তাকেই বলব যিনি একটি প্লাকার্ড দিয়ে চার জাতের মানুষকে প্রতিদিন আকৃষ্ট করতে পারবেন, সেটাই হবে সাংবাদিকতার চরম উৎকর্ষ। যাহোক সাংবাদিকেরা সকলেই আমার যুক্তি সমর্থন করল। এখন পবিত্র কুরআনকে এর ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা যাক।

সার্বজনীন আহবান

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মদিনা শহরে চারপাশে ইহুদী, খ্রিস্টান, মুসলমান, মুশরিক ও মুনাফিকদের নিয়ে বসবাস করতেন। মহানবীকে তাঁর সংবাদ (প্রত্যাদেশ) এসব নানা জাতের লোকের নিকট প্রচার করতে হত। এই নানা জাতির লোককে আকৃষ্ট করার জন্য তাঁর প্লাকার্ডে কি লিখবেন? তাকে ঘোষণা করতে বলা হল, মূসার (আ) কাহিনী তোমাদের নিকট কি পৌঁছেছে?

কল্পনা করা যায় কি উত্তেজনাকর অবস্থা? খ্রিস্টান ও ইহুদী আরো কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করছে। তারা ভাবছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজেকে এবার বোবা বানানো যাবে, কারণ তারা জানে এই উম্মি আরব আর মূসা (আ) সম্পর্কে কি জানবে? সে তো উম্মি অশিক্ষিত মুসলমানরা জ্ঞানের জন্য তৃষ্ণার্ত, তারা চাচ্ছে -মূসা (আ) সম্পর্কে আমাদেরকে বলুন। মুশরিক ও মুনাফিকরা জিহ্বা নাড়ছে-মূসা (আ) সম্পর্কিত তিন পক্ষের বিতর্ক তারা উপভোগ করবে। তিন পক্ষ হচ্ছে মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদী। সবাই কান খাড়া করে অপেক্ষা করে আছে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলতে লাগলেন, লক্ষ্য কর, তিনি দেখলেন আগুন।

চরম নাটকীয়তা! চোখের সামনে যেন এই দৃশ্য ভেসে উঠছে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম টেলিগ্রাফের ভাষায় কথা বলছেন। ঈসা (আ) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে স্লোগান তৈরির উৎকর্ষ ভঙ্গি নির্মাণ করতে। সেই উৎকর্ষে পৌঁছাতে

বিশ্বে সর্বাধিক সংখ্যক খ্রিস্টান ও ইহুদী জাতিকে খ্রিস্টের জন্মের পর দুই হাজার বছর লেগেছে। ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ান টেলিগ্রাফের ভাষায় (Western Union Telegraph Company) "Don't Write-Telegraph!" আমেরিকার ওস্তাদ সাংবাদিকরা যা করতে পারেননি সেই দক্ষতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কোন বিদ্যালয় থেকে অর্জন করেছিলেন? তাকে উচ্চারণ করতে হল ঃ

فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوٓا إِنِّيٓ ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝

তখন তার পরিবারবর্গকে বলল, 'তোমরা এখানে থাক' আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবত আমি তোমাদের জন্য তা হতে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার আনতে পারব অথবা আমি এর নিকটে কোন পথপ্রদর্শক পাব।'

— কুরআন ২০ : ১০

সাংকেতিক শ্রুতলিপি

উপরের আয়াতটি যে কোন অনূদিত পবিত্র কুরআনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, সেই অনুবাদ শত্রু বা মিত্র যেই করুক না কেন সেখানে দেখা যাবে একই সংক্ষিপ্ত ও স্বল্পমাত্রার শব্দ ব্যবহার। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কোন প্রকার সারসংক্ষেপ অনুশীলন করেননি। তিনি কেবল আল্লাহ্‌র বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। এই বাণী জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে তার অন্তরে ও মনে শুনিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে সেই ষষ্ঠ শতকে যখন মহানবী কুরআন উচ্চারণ করছিলেন তখন কোন আরবি ভাষায় বাইবেল ছিল না। পবিত্র বাইবেলে দ্বিতীয় পুস্তক, যাত্রা পুস্তক, অধ্যায় ১,২,৩ যেখানে এই বিষয়টি অর্থাৎ পয়গম্বর মূসার (আ) জীবনী বর্ণিত হয়েছে। সেই কাহিনী পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত প্রত্যাদেশের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

ইস্রায়েলের পুত্রগণ, যারা মিসর দেশে গিয়েছিলেন, সপরিবারে যাকোবের সঙ্গে গিয়েছিলেন, তাঁদের নাম এই এই; রূবেণ, শিমিয়োন, লেবি ও যিহূদা, ইষাখর, সবূলূন ও বিন্যামীন দান ও নপ্তালি, গাদ ও আশের। যাকোবের কটি হতে উৎপন্ন প্রাণী সর্বসুদ্ধ সত্তর জন ছিল; আর যোষেফ মিসরের ছিলেন। — যাত্রা পুস্তক ১ : ১-৫

এটি শুধু সামান্য তুলনা। এভাবে কি আল্লাহ্ কথা বলেন? বাইবেলের এই পাঁচটি বাক্যের সঙ্গে নিম্নে বর্ণিত একই বিষয়ের চারটি পবিত্র কুরআনের আয়াত তুলনীয়। পূর্বের বর্ণনার সূত্র ধরে বলা যেতে পারে মূসা (আ) তার পরিবার-পরিজন ভেড়া ছাগলের পাল নিয়ে সিনাই মরুভূমিতে ঘুরতে ঘুরতে দু'টি জিনিসের জন্য ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলেন। এক ঃ আগুন, দুই ঃ দিকনির্দেশনা। আগুন চাচ্ছিলেন তিনি মাংস রান্নার জন্য এবং মরুভূমিতে কোন অতিথিবৎসল জনগোষ্ঠীর নিকট যাওয়ার জন্য দিক নির্দেশনা চাচ্ছিলেন। আল্লাহ্ তার পরিকল্পনা উন্মোচন করার জন্য হযরত মূসা (আ)-কে ঠিক করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য কয়লা জ্বালানোর স্বপ্ন থেকে প্রকৃত মানুষের আত্মার মধ্যে আধ্যাত্মিক আগুন জ্বালানোর দিকে। আধ্যাত্মিক আগুন জ্বলছে হাজার বছর ধরে মানবতার পথনির্দেশনার জন্য প্রকৃত দিক নির্দেশনা হয়ে।

হযরত মূসা (আ) যে আগুন দেখেছিলেন, সেই আগুন সাধারণ আগুন নয়। বাহ্যত তার নিকট এর অর্থ ছিল নিজের জন্য সহজে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করা। আবার আগুন দেখে মানুষের উপস্থিতি বোঝা যায় এবং তার কাছ থেকে তথ্য ও দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়।

فَلَمَّآ أَتَىٰهَا نُودِيَ يَٰمُوسَىٰٓ ۝ إِنِّيٓ أَنَا۠ رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝

অত:পর যখন সে আগুন নিকট আসল তখন আহ্বান করে বলা হল, 'হে মূসা! 'আমিই তোমার প্রতিপালক। অতএব তোমার পাদুকা খুলে ফেল, কারণ তুমি পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় রয়েছ।' — কুরআন ২০ : ১১-১২

হযরত মূসা (আ)-এর আধ্যাত্মিক ইতিহাসের আরম্ভ এখানেই এবং এটাই তার আধ্যাত্মিক জন্ম। বাইবেলের ভাষায় 'অদ্য আমি তোমাকে জন্ম দিয়েছি।' (গীত সংহিতা ২ : ৭) এই পুস্তকে কিরূপে দাউদ (আ) সঙ্গে তার নিযুক্তির বিষয়ে কথা বলেছিলেন, তা আছে। উপরোক্ত কুরআনের বাণী গভীর আধ্যাত্মিক অর্থে পরিপূর্ণ। সংক্ষিপ্ত ছন্দোবদ্ধ মূল পঙ্ক্তিতে তার আভাস প্রতিফলিত হয়েছে। ছন্দ এবং অর্থ উভয়ই গভীর রহস্যময়তা প্রকাশ করে। নিচে তুলনা করার জন্য চারটি আয়াত একসঙ্গে দেওয়া গেল।

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۝ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ
نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ
يَا مُوسَىٰ ۝ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝

মূসার বৃত্তান্ত তোমার নিকট পৌঁছেছে কি? সে যখন আগুন দেখল তখন তার পরিবারবর্গকে বলল, 'তোমরা এখানে থাক আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবত আমি তোমাদের জন্য তা হতে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার আনতে পারব অথবা আমি তার নিকটে কোন পথপ্রদর্শক পাব। 'অতঃপর যখন সে আগুনের নিকটে আসল তখন আহবান করে বলা হল, 'হে মূসা! 'আমিই তোমার প্রতিপালক, অতএব তোমার পাদুকা খুলে ফেল, কারণ তুমি পবিত্র 'তুওয়া'* উপত্যকায় রয়েছ।' — কুরআন ২০ : ৯-১২

এখন আপনার রায় কি?

যারা রূপকথা ও লোকগাঁথা শুনতে অভ্যস্ত তারা কিভাবে এই বিশুদ্ধ জান্নাতি নিয়ামত বিচার করবে? থমাস কার্লাইল, যিনি গত শতাব্দীর অন্যতম চিন্তাবিদ এবং সহানুভূতিশীল তার ন্যায় মহান ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত পবিত্র কুরআনের এই তীক্ষ্ণ সংক্ষিপ্ততা অনুধাবন করতে পারেননি। তিনি পবিত্র কুরআনের পাঠকে কষ্টসাধ্য, বিভ্রান্তিকর, জগাখিচুড়ি, স্থূল অসমর্থনযোগ্য নির্বুদ্ধিতা ইত্যাদি বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন অত্যন্ত খারাপভাবে সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা মাত্র; অসমর্থনযোগ্য নির্বুদ্ধিতা। বাইবেলেও কুরআনের পাঠকে বিপরীতধর্মী তুলনার পর, অতঃপর আমরা কি রায় দেব? আমি আরেকজন সাংবাদিককে পেয়েছিলাম। তিনিও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর এ অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য ও সরাসরি বক্তব্যকে বুঝতে পারেননি। অথচ আজকের দিনে সংবাদপত্র অথবা ম্যাগাজিনে তারা এভাবেই করে থাকে।

---

*'তুওয়া' হচ্ছে সিনাই পর্বতের পাদদেশের উপত্যকা। সেখানে পরবর্তীকালে তিনি প্রত্যাদেশ লাভ করতেন। সমান্তরালভাবে এর আধ্যাত্মিক অর্থ হচ্ছে এই সামান্য জীবনে পরীক্ষার মাধ্যমে আমাদেরকে নির্বাচন করা হয়। যার উপত্যকা তেমনি পবিত্র এবং আল্লাহ্‌র সন্ধান লাভ করে যেমন উচ্চ তুর পাহাড়। তা যদি আমাদের বোধের মধ্যে আসে, সম্মান প্রদর্শনের জন্য জুতা খুলে ফেলতে হবে। অপর অর্থ মূসা (আ) এখন তাঁর পার্থিব প্রয়োজনীয় সবকিছু ত্যাগ করলেন, কারণ এখন মহা মহিম আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নির্বাচন করেছেন।

অধ্যায় চার

অলৌকিক গ্রন্থ যেন তারবার্তা

পবিত্র কুরআনকে যথাযথভাবে বর্ণনা করলে তাকে তারবার্তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তারবার্তার মতই অনেকটা প্রশ্ন-উত্তরের ন্যায় এই মহাগ্রন্থ উন্মোচিত হয়েছিল।

মদ ও জুয়া প্রসঙ্গ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝

লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও আছে; কিন্তু তাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।' লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, কি তারা ব্যয় করবে? বল, যা উদ্বৃত্ত।' এইভাবে আল্লাহ্ তাঁর বিধান তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর ....। — কুরআন ২ : ২১৯

কুরআন ও হাদীস

উপরে একটি উদাহরণ দেয়া গেল যে কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণী প্রদান করেন। পরে আরো উদাহরণ দেয়া যাবে, এর চেয়ে আর কত সহজে বোঝানো সম্ভব, এর চেয়ে সহজভাবে একজন সত্য অন্বেষী বিজ্ঞানীকে কি বোঝানো যাবে? এর উত্তর "না"। তথাপি তিনি অবুঝদের সম্পর্কে বলেন :

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ

বল, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান?' — কুরআন ১৩ : ১৬

অবশ্যই না!

এখন মহান আল্লাহ্ তা'আলার উপরোক্ত কথাগুলো "মদ" সম্পর্কিত বিষয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। হাদীস তাঁর সাহাবিগণ লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ হযরত ইবনে আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্র রাসূল তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন যারা যে কোন ধরনের নেশা দ্রব্য তৈরি ও ব্যবহার করে। তিনি বলেছেন–

১. লানত তাদের যারা মদ চোলাইয়ের জন্য আঙুর উৎপাদন করে।
২. লানত তাদের যারা এসব বিক্রি করে।
৩. লানত তাদের যারা এগুলো মাড়াই করে।
৪. লানত তাদের যারা বোতলে ভরে।
৫. লানত তাদের যারা পান করে।

আল্লাহ্র রাসূল আরও বলেছেন নেশার দ্রব্য অল্প মাত্রায় গ্রহণ যেমন নিষিদ্ধ তেমনি বেশি পরিমাণ ব্যবহারও সমানভাবে নিষিদ্ধ। সাধু পল শিষ্য টিমোথিকে যেভাবে পরামর্শ দিয়েছিলেন ইসলামে সেভাবে স্বল্প মাত্রার মদ্য পানও নিষিদ্ধ।

এখন অবধি কেবল জল পান করো না, কিন্তু বার বার অসুখ হয় বলে কিঞ্চিৎ দ্রাক্ষারস ব্যবহার করো। — ১ তীমথিয় ৫ : ২৩

অথবা সোলায়মান (আ) সুনিশ্চিতভাবে অথচ ঠাট্টার ছলে অধিকৃত জনসাধারণকে দাসত্বে আনয়নের জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন ঃ

মৃতকল্প ব্যক্তিকে সুরা দাও, তিক্তপ্রাণ লোককে দ্রাক্ষারস দাও, সে পান করে দৈন্যদশা ভুলে যাক, আপন দুর্দশা আর মনে না করুক।

— প্রোভার্বস ৩১: ৬-৭

ভুলে যাওয়ার আগে পবিত্র কুরআনে এই বিষয়ে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজের মুখে যা বলেছেন তা তুলনা করে দেখা যেতে পারে। অস্বীকার করার উপায় নেই দুটোর রীতি রচনাশৈলী লালিত্য সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির, যদিও একই মুখ থেকে দুটো উচ্চারিত হয়েছে।

অপর একটি উদাহরণ ঃ প্রশ্নের জবাবে তারবার্তার মতো যে বাণী এসেছিল ঃ

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

লোকে তোমাকে নতুন চাঁদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বল, তা মানুষ এবং হজ্জের জন্য সময় নির্দেশক।' — কুরআন ২ : ১৮৯

"আজ পর্যন্ত নতুন চাঁদের সাথে অনেক কুসংস্কার জড়িত রয়েছে। এই সকল কুসংস্কার অস্বীকার করতে বলা হয়েছে। যেখানে চান্দ্রমাস ক্যালেন্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেখানে নতুন চাঁদ সময় নিরূপণের একটি মাপকাঠি মাত্র। নতুন চাঁদ দেখে মুসলমানদের অনেক অনুষ্ঠান উৎসব পালিত হয়। যেমন হজ্ব, রোযা ইত্যাদি।" — ইউসুফ আলী

তারবার্তার ন্যায় পবিত্র কুরআনের আরেকটি উদাহরণ-

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۖ قُلْ مَآ أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○

লোকে কি ব্যয় করবে সে সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, 'যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত এবং মুসাফিরদের জন্য। উত্তম কাজের যা কিছু তোমরা কর না কেন আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অবহিত। — কুরআন ২ : ২১৫

দানের ক্ষেত্রে তিনটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে ঃ

ক) আমরা কি দান করব?
খ) কাকে দান করব?
গ) কিভাবে দান করব?

এখানেই উত্তর রয়েছে, যা কিছু ভাল, প্রয়োজনীয়, কাজে লাগে এবং মূল্যবান। হতে পারে সম্পত্তি অথবা অর্থ, হতে পারে সাহায্যের হাত; হতে পারে পরামর্শ, এমন কি হতে পারে সান্ত্বনার বাক্য, "তুমি যা কিছু কর তা যদি ভাল হয় তাহলে সেটাই দান'। অপর পক্ষে অপ্রয়োজনীয় কিছু যদি ফেলে দাও তার মধ্যে কোন দান নেই।

অথবা অসৎ উদ্দেশ্যে কাউকে যদি কিছু দাও, যেমন পাগলের হাতে তরবারী অথবা নেশার দ্রব্য অথবা মিষ্টি অথবা অর্থ- সেগুলো যদি কাউকে ফাঁদে ফেলার জন্য অথবা পথভ্রষ্ট করার জন্য হয় তাহলে সেটা দান হবে না, হবে ধিক্কার।

কাকে দিতে হবে?

কোন কিছু দেওয়ার কারণে সারা দুনিয়া প্রশংসা করবে এ লোভে কাউকে কিছু দেওয়া চলবে না। তোমার উপর যার দাবি সবচেয়ে বেশি তার প্রয়োজন আগে মেটাতে হবে। যদি তা না মিটাও তাহলে তুমি একজন ধোঁকাবাজ পাওনাদার। প্রতিটি দানকে বিচার করা হবে তার পিছনে কতখানি নিঃস্বার্থ মনোভাব রয়েছে,তার উপর। তোমাকে দেখতে হবে যে চাহিদা অথবা প্রয়োজনের মাত্রা কতখানি। তুমি যদি তা বিবেচনা না কর তাহলে বুঝতে হবে এর পিছনে স্বার্থ আছে।

কিভাবে দিতে হবে ?

সমস্ত প্রকার ভনিতা প্রদর্শনী ও কৃত্রিমতা পরিহার করে আল্লাহ্ দেখছেন এভাবে দিতে হবে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আরেকটি প্রশ্নের জবাব পেয়েছিলেন তারবার্তার ন্যায়। এর বিষয় ছিল আত্মা।

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝

তোমাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল 'রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশঘটিত।'এবং তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে।

— কুরআন ১৭ : ৮৫

এ কথা গুরুত্ব সহকারে না বলে পারা যাচ্ছে না যে, পৃথিবীর অন্য কোন গ্রন্থ পাঠ করা পবিত্র কুরআন পাঠের মতো নয়। এখানে স্পষ্ট সোজা সরলভাবে বক্তব্য রাখা হচ্ছে। এখানে কোন 'যদি' বা 'কিন্তু'নেই। কোন বাহানা বা অপ্রয়োজনীয় কথা নেই। এই বিশাল গ্রন্থে এমন কোন রচনা পাওয়া যাবে না, যা বক্স অফিস হিট করতে পারে। অথবা টেন কমান্ডমেন্ট অথবা স্যামসান ও ডেলিয়া অথবা ডেভিড ও বেথসেবা এর মত ফিল্ম তৈরি হতে পারে। সে রকম কিছু এখানে নেই। সেক্ষেত্রে পবিত্র বাইবেল এই প্রকার স্ক্রিপ্ট লেখার জন্য মহা আকর্ষণীয় গ্রন্থ। এখানে যা আছে তা সহজে স্বর্ণ পাত্রে রূপান্তরিত করা যায়।

প্রণিধানযোগ্য যে, এই গ্রন্থের দু'মলাটের মধ্যে তন্ন তন্ন করে অন্বেষণ করলেও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর পিতা বা মাতার নাম কোথাও পাওয়া যাবে না। কেউ তার স্ত্রীদের নাম এখানে আবিষ্কার করতে পারবে না। কেউ খুঁজে পাবে না তার মেয়েদের নাম। অথবা পাবে না প্রিয় সহচরদের নাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় একটি পূর্ণ অধ্যায় যিশু খ্রিস্টের মা মেরির নামে রয়েছে। এর নাম সূরা মরিয়ম। অধ্যায় ১৯, পবিত্র কুরআন। এই গ্রন্থে ঈসা (আ)-এর নাম কম হলেও পঁচিশবার উল্লিখিত হয়েছে অথচ পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর নাম মাত্র পাঁচবার উল্লিখিত হয়েছে।

যীশু ও তাঁর মা কি এ মহাগ্রন্থ যার নিকট নাযিল হয়েছে সেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও তার মা অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ? না, তা মোটেই না। তাহলে এই অসাধারণ বর্ণনা কেন? কারণ সহজ, যীশু এবং তার মার চরিত্র বিপদের মধ্যে ছিল। মাতা ও পুত্রের উপর বিভিন্ন রকমের মিথ্যা অভিযোগ, চরিত্রের কালিমা লেপন ও কলঙ্ক আরোপিত হচ্ছিল। সেইজন্য মেরির গর্ভধারণ বিষয় কাহিনী কুমারি মেরির নিষ্কলঙ্ক গর্ভধারণ এবং যিশুর জন্ম বর্ণনা করা প্রয়োজন ছিল। ইসলামের পয়গম্বর-এর বংশ নিয়ে কেউ কোন প্রশ্ন করেনি। তাই মহানবীর জন্ম এবং পিতৃকুল নিয়ে অযথা শব্দ ব্যয় করার প্রয়োজন পড়েনি। কুরআন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনীগ্রন্থ নয়। তবে অবিশ্বাসীদেরকে এ কথা বোঝানো বড় কঠিন।

শেষদিন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে তারবার্তার ন্যায় যে বার্তা এসেছে সেটিই আরেকটি উদারহণ।

শেষ দিন

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَآ إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ

তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন ঘটবে। বল, 'এ বিষয়ের জ্ঞান আমার প্রতিপালকেরই আছে। শুধু তিনিই যথাকালে তা প্রকাশ করবেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা হবে! আকস্মিকভাবেই তা তোমাদের উপর আসবে'। — কুরআন ৭ : ১৮৭

বাইবেলে সাধু মার্ককের গসপেলের ত্রয়োদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত একটি আয়াতের সঙ্গে তুলনীয়। এই অধ্যায়ের ৩৭টি পঙ্ক্তি ব্যবহৃত হয়েছে উক্ত বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত পৌঁছাতে। মানুষের তৈরি পুস্তকের সঙ্গে আল্লাহ্‌র বাণী পার্থক্য করার এটি সহজ উপায়। পবিত্র কুরআনে দেখা যাবে কোনরূপ অতিকথন ও অনাবশ্যক অলংকরণ নেই। আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে আরও অনেক উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে, এর বর্ণনা পদ্ধতি মানুষের ব্যবহৃত রীতি নয়। এ পবিত্র কুরআন এক অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত গ্রন্থ। বস্তুতপক্ষে এ বিষয়ে সুবিশাল পৃথক গ্রন্থ রচিত হতে পারে। যা হোক সর্বশেষে আমরা পবিত্র কুরআন থেকে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে এখানেই এ অধ্যায়ের আলোচনা সমাপ্ত করবো। আর তা হচ্ছে পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে ছোট মাত্র চারটি আয়াত সম্বলিত একটি সূরা।

সূরা ইখলাস

(১) বলো, তিনিই আল্লাহ্‌, এক, অদ্বিতীয়, (২) আল্লাহ্‌ কারো মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, (৩) তিনি কাউকেই জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি, (৪) এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

এখানে আরবি অংশ আল্লাহ্‌র কথা। এ অংশের ইংরেজি অনুবাদ করেছেন মাওলানা ইউসুফ আলী। মানুষের পক্ষে যতখানি সম্ভব এ অনুবাদ তন্মধ্যে সর্বোত্তম বলে বিবেচিত হয়। আমরা এতক্ষণ কুরআনে অলৌকিকতা সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছি সে বিষয়ে আমার নিজের পর্যবেক্ষণের আলোকে তা উপস্থাপন করছি।

ধর্ম ও তত্ত্বের অগ্নিপরীক্ষা

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশমতো বিশ্বের সকল মুসলমান বিশ্বাস করে যে উপরোক্ত চারটি আয়াত বিশিষ্ট এ সূরাটি তিনবার পাঠ করলে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ পাঠের আত্মিক কল্যাণ হাসিল হয়। কি কারণে এই ক্ষুদ্র সূরাটি এতখানি মূল্যবান। এখানে কোন শব্দের দ্যোতনা নেই, সঙ্গীত নেই, এমন কোন সুরের মূর্ছনা নেই যা মানুষের মন আনন্দে পরিপূর্ণ করে দেবে। কিন্তু এখানে একটি বাণী রয়েছে যে বাণী দীনের চূড়ান্ত নির্যাস এবং সেই কারণেই এর মর্যাদা এত উঁচুতে। এই সংক্ষিপ্ত চার পঙক্তির মধ্যে রয়েছে ইসলামের সমস্ত তত্ত্ব, ইসলামে আল্লাহর যে ধারণা এই চারটি পঙ্ক্তির বাইরে নেই। এ চারটি পঙ্ক্তিই হচ্ছে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের কষ্টিপাথর। এরই মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্‌ সম্পর্ক কোন ধারণা গ্রহণ করতে পারি অথবা প্রত্যাখ্যান করতে পারি। ন্যায় অন্যায় পৃথক করতে পারি। কষ্টিপাথরের সাহায্যে যেমন স্বর্ণকারের সোনার খাঁটিত্ব পরীক্ষা করা হয়, এ চারটি পঙ্ক্তিও তেমনি কুরআন পরীক্ষার কষ্টিপাথর।

অজ্ঞতার অবসান

১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি জাম্বিয়াতে বক্তৃতা দিতে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা হচ্ছিল। লুসাকা থেকে টেলিফোনে জানানো হলো যে আমার বিমানের টিকিট ডারবানে পাঠানো হয়েছে। আমি যেন দক্ষিণ আফ্রিকা এয়ার ওয়েজের অফিস থেকে টিকিট সংগ্রহ করি। আমি এয়ার ওয়েজ অফিসে গিয়ে ইনফরমেশন কাউন্টারে যে লোকটি দায়িত্বে ছিল তাকে বললাম যে লুসাকা থেকে আমার নামে যে টিকিট পাঠানো হয়েছে সেটি নেওয়ার জন্য আমি এসেছি। তিনি আমাকে বললেন অপর একজন মহিলার নিকট যেতে। তিনি আরো কয়েকজন মহিলাসহ বৃত্তাকারে কম্পিউটারের সামনে বসে আছেন। তাদের সকলের সামনেই গ্রাহকদের ভিড় ছিল। আমি বললাম, কার কাছে? ভদ্রলোক একটু বিরক্তি সহকারে হাত নেড়ে বললেন যে কোন একজনের কাছে। সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পারিনি আমার এই সাদামাটা প্রশ্নের উত্তরে একজন ভদ্রলোক কিভাবে বিরক্ত হলেন। আমি ভাবছিলাম বিমান ভ্রমণের টিকিটের একটা লম্বা খাম পাব। জীবনে বহুবার প্লেনে যাতায়াত করেছি। তাই সেইরকম একটা ইনভেলাপের আশা করছিলাম কিন্তু ঐ মহিলারা আমাকে কিভাবে টিকিট দেবে? আমি একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু সেই ভদ্রলোকের বিরক্তমাখা কণ্ঠস্বর আমাকে বাধ্য করল সেই অর্ধ বৃত্তাকার মহিলাদের দিকে অগ্রসর হতে। ভয়ে ভয়ে এক মহিলার কাছে গিয়ে আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলাম। তিনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করলে তাকে নাম বললাম। দেখলাম তিনি কম্পিউটারের পর্দার দিকে তাকিয়ে কি যেন টাইপ করলেন। আমি দেখতে পারছিলাম না তিনি কি টাইপ করছিলেন। তারপর তিনি মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ অর্থাৎ তিনি পেয়েছেন। আমি বললাম যোহান্সবার্গের উদ্দেশ্যে আমি মঙ্গলবার ডারবান ত্যাগ করতে চাই। তিনি সন্ধ্যা ছয়টার ফ্লাইটের টিকিট দিতে চাইলে আমি রাজি হলাম। তিনি আরও কিছু টাইপ করলেন। আমি তাকে আরও বললাম যোহান্সবার্গ ত্যাগ করে পরের দিন বেলা তিনটার দিকে লুসাকা পৌঁছাতে চাই। আমাকে যারা দাওয়াত করেছিলেন তাঁরা সেই রকমই পরামর্শ দিয়েছিলেন, যাতে আমার পৌঁছাবার সংবাদ টিভি ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে প্রচার করা যায়। মহিলা আরো কিছু টাইপ করার পর প্রশ্ন করলেন, আমি গাররনে অথবা মোপুত হয়ে লুসাকা যেতে রাজি কিনা? আমি বললাম বুধবার বেলা তিনটার সময় আমি লুসাকা পৌঁছাতে চাই, কিভাবে সেটা কোন বিষয় নয়। মহিলা আবার কিছু টাইপ করে পর্দা দেখে বললেন, দুঃখিত, আপনি জাম্বিয়ান এয়ার লাইনে বুক হয়ে আছেন। আমরা আপনার টিকিট অন্য এয়ার লাইনে বদলি করতে পারব না। কারণ সেখানকার জাতীয় ছুটির দিন বলে জাম্বিয়ান এয়ার লাইন অফিস আজ বন্ধ। আমাকে পরদিন আবার আসতে বলা হলো। ভারি মজ তো, আমি ভাবলাম। আমি টিকিট প্রায় পেয়ে যাচ্ছিলাম অথচ পেলাম না। মনে হচ্ছিল টিকিটটা তার ড্রয়ারে আছে। রীতিমত বিভ্রান্ত হয়ে আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, এইসব তত্ত্ব পেলেন কোথা

থেকে। তিনি বললেন, যোহান্সবার্গের প্রধান কম্পিউটার থেকে। তিনি দয়া করে আরও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন যে, দেশের সবকটি টারমিনাল প্রধান কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত। যে কোন জায়গা থেকে বোতাম টিপলেই প্রধান কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া যায়। আমি প্রশ্ন করলাম তিনি যোহান্সবার্গের সন্ধ্যা ছয়টার ফ্লাইটের আমার সিটের জন্য চেষ্টা করছেন কিন্তু একটা মাত্র আসন খালি অথচ অন্যান্য টারমিনাল থেকে সবাই যদি এক সঙ্গে একটা সিটের জন্য চেষ্টা করে তাহলে কি হবে? তিনি বললেন, এক সেকেন্ড আগে প্রথমে যে আসবে সে সিট পাবে। বাকিরা শূন্য হাতে ফিরে যাবে। আমি ভদ্রমহিলাকে প্রচুর ধন্যবাদ দিয়ে বিমান অফিস ত্যাগ করলাম। ফিরে যেতে যেতে ভাবছিলাম এমনিভাবেই ওহী আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তার রাসূলের কাছে এসে পৌঁছায় যেভাবে প্রধান কম্পিউটারে সংরক্ষিত তথ্য এসে কম্পিউটারের পর্দায় বা ফলকে ভেসে উঠে।

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۙ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ

বস্তুত এটি সম্মানিত কুরআন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।

— কুরআন ৮৫ : ২১-২২

এই ফলক। হযরত মূসা (আ) যে দশটি নির্দেশ পাথরের উপর লিখেছিলেন সেরকম নয়। বিদ্যালয় শিক্ষক ব্লাকবোর্ডে যেভাবে দেখান তেমন নয়। বস্তুত, একে কম্পিউটারের পর্দার সাথেও তুলনা করা যায় না, এটি আল্লাহ্‌র নিজস্ব সংরক্ষিত ফলক। একে বাস্তব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান দিয়ে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। কারণ এ জিনিস কোন পাথর বা ধাতুর তৈরি নয়। এটা আধ্যাত্মিক। এ কিভাবে কাজ করে, আমরা শুধুমাত্র কল্পনা করতে পারি।

নাজরানের খ্রিস্টানগণ

মদিনাতে যখন ইসলাম দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল তখন আল্লাহর রাসূলের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। ইয়েমেনের নিকট নাজরানের কিছু আরব খ্রিস্টান বসবাস করত, তারা শুনল যে আরব দেশে একজন আরব দাবি করছেন তিনি ওহী প্রাপ্ত হয়েছেন এবং নিজেকে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক বলে দাবি করেছেন। এক প্রতিনিধিদল সেই রাসূলকে প্রশ্ন দ্বারা পরীক্ষা করার জন্য মদিনার পথে রওনা হল। তারা জানতে চাইবে যে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে, দীন সম্পর্কে তিনি কি জানেন। তারা মদিনায় এসে মাটির দেয়াল খেজুর পাতার ছাদ দিয়ে নির্মিত মসজিদে নববীতে আশ্রয় নিল। খ্রিস্টানরা খাওয়া দাওয়া করল এবং এখানেই রাত্রি যাপন করল। তিনদিন তিনরাত রাসূলের সঙ্গে আলোচনা করল। হাদীসে এই আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে। আলোচনার এক পর্যায়ে খ্রিস্টানদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করল ঃ

"ওহে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ্‌ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি বলুন? আল্লাহ্‌র রাসূল সামান্যতম বিচলিত না হয়ে অনেক কথার ব্যাখ্যা না করে শব্দ ও ভাষার জন্য চিন্তা না করে যেন আধ্যাত্মিক বোতাম টিপ দিলেন, যেন কম্পিউটারের টার্মিনাল থেকে টিপ দিয়ে প্রধান কম্পিউটার থেকে তথ্য আসে তেমনিভাবে উত্তর এল।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ
وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

"বল, 'তিনিই আল্লাহ, একক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহ্‌ কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী; তিনি কাকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি, এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।' — কুরআন ১১২ : ১-৪

আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে উপরোক্ত আয়াত (একটি ফরমূলার মতো) উচ্চারণ করার পর তাদের আলোচনা পুনরায় স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে এল। আলোচনার মধ্যে এই দু'প্রকার ভঙ্গি কোন আরবের পক্ষেই লক্ষ্য না করার কারণ ছিল না। উপরের আয়াতগুলো ছিল আল্লাহ্‌র কথা। আল্লাহ্‌র কথা নবীজির মুখে তুলে দেওয়া হয়েছিল। তিনি যখন সেগুলো আবৃত্তি করছিলেন তখন তিনি আল্লাহ্‌র মুখপাত্র হিসাবে কাজ করেছিলেন, অনেকটা রেডিওর স্পীকারের মতো।

আল্লাহ্‌ প্রদত্ত এই তথ্য বস্তু কম্পিউটারের ন্যায় তার মধ্যে, তার হৃদয় ও মস্তিষ্কে দশ বছর পূর্বেই মক্কায় অবস্থানকালে অনুরূপ পরিবেশে তার মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় ইহুদীরা তাঁকে "আল্লাহ্‌র পরিচয় ও বংশ পরিচয়" জানার নাম করে তাকে প্ররোচিত করছিল।

এভাবে একটা তুলনা দেওয়া গেল যে, পরম পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌ কিভাবে তার প্রত্যাদেশ তার মনোনীত রাসূলের নিকট অনুপ্রেণার মাধ্যমে তার বাণী প্রেরণ করেন, কিভাবে তার রাসূল সেই বাণীকে নিজের মধ্যে সংরক্ষণ করেন এবং সঞ্চারিত করেন। তারপর মানবীয় মুখপাত্র সেই বাণীকে কীভাবে বারবার ব্যবহার করেন। তারপর তার অনুসারীগণ অর্থাৎ আমরা তার উম্মত সেই বাণীকে হৃদয়ে সংরক্ষিত করে যখন প্রয়োজন হয় তা ব্যবহার করি।

বিশ্বের কোন ধর্মগ্রন্থে বা ধর্মসাহিত্যে সূরা ইখলাসের ন্যায় সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নেই। এই অধ্যায়টি যদি ধর্মতত্ত্বের চূড়ান্ত নির্যাস হয় অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কথার নির্যাস হয় তাহলে পবিত্র কুরআনের অবশিষ্ট অংশ তার ব্যাখ্যা। এর সাহায্যে আমরা আল্লাহ্‌র গুণাবলি আবিষ্কার করতে পারি। আল্লাহ্‌কে জানতে গিয়ে মানবজাতি বারবার পদস্খলিত হয়ে অন্ধকারে পতিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনের সাহায্যে সেই পতন থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি।

অধ্যায় পাঁচ

আল্লাহ্‌র গুণাবলি অসাধারণ

অসীম শক্তিশালী আল্লাহ্ তা'আলা সর্বগুণের আধার। তাঁর গুণাবলি ও ব্যক্তিত্ব অসাধারণ। তাঁকে কোন প্রকার কোন কিছুর সাথে তুলনা করা যায় না। তিনি অতুলনীয়, আমাদের কল্পনায় যা কিছু সম্ভব তার কোন কিছুর সঙ্গেই তিনি তুলনীয় নন। সূরা ইখলাসের শেষ আয়াতে আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তার মতো কেউ নেই। তার মতো কাউকে কল্পনা করা যায় না। তাহলে আমরা তাকে কিভাবে জানব। তার গুণাবলির মাধ্যমে আমরা তাকে অনুধাবন করব।

আল্লাহ্‌র সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত প্রত্যাদেশ অর্থাৎ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌র ৯৯টি নাম বা গুণাবলি দেওয়া আছে। এর সবার শীর্ষে যে নাম সেই নামটি হচ্ছে আল্লাহ্। এই ৯৯টি গুণ বা নামকে বলা হয় আসমাউল হুসনা। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নামগুলো পবিত্র কুরআনে সর্বত্র ছড়ানো ছিটানো রয়েছে। যেন একটা মুক্তার হার, সঙ্গে একটা লকেট। লকেটটিই হচ্ছে আল্লাহ্। এই মুক্তার হারের অংশ বিশেষ নিচে দেওয়া গেল।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○
هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ
لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত, উহারা যাহাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ তাহা হইতে পবিত্র,

মহান। তিনিই আল্লাহ্, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

— কুরআন ৫৯ : ২৩-২৪

আসমাউল হুসনা — সকল উত্তম নাম তাঁরই

উপরের দুই আয়াতে ১৩টি নাম রয়েছে। এগুলো পবিত্র কুরআনে সর্বত্র বিভিন্নভাবে ছড়ানো আছে। ইসলামের চরম শত্রুও স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে এগুলো অসাধারণ সুন্দর, এমনকি অনুবাদ করলেও সেগুলো সুন্দর। মূল আরবিতে এই শব্দগুলোও তার গঠন প্রকৃতি অতুলনীয় ও লালিত্যে মহত্তম।

একজন উম্মি, অশিক্ষিত ব্যক্তি যিনি জীবনে কোনদিন কারো কাছে লেখাপড়া শেখেননি। এবং যিনি এক অশিক্ষিত জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁর পক্ষে ১৪০০ বছর আগে আল্লাহ্‌র আনন্দ উচ্ছল সুরধ্বনিময় বক্তব্য তৈরি করা কি সম্ভব ছিল। আমাদের মনে রাখতে হবে সে যুগে এমন বিশ্বকোষ বা জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ ছিল না, যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দেখতে পারতেন। তাহলে কোথা থেকে তিনি ধর্মতত্ত্বের এমন ধনভাণ্ডার পেলেন? তিনি বলেন, "এই সব কিছুই আল্লাহ্ কর্তৃক অনুপ্রেরণার মাধ্যমে আমাকে প্রদত্ত হয়েছে।" এর ব্যাখ্যা কি?

একটা পরীক্ষা করা যেতে পারে, আমাদের জ্ঞানী বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী যিনি তাকে বলা হোক — আল্লাহ্‌র কিছু গুণ তিনি আমাদের জন্য তৈরি করে দিন। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি এই ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক ও ঈশ্বর তত্ত্বের বিশেষজ্ঞ তার অধীত জ্ঞানের সাহায্যে বারটি শব্দ সৃষ্টি করতে পারবেন না। তখন ইহলৌকিক জ্ঞানে.জ্ঞানবান বলবেন, "দেখুন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একজন প্রতিভাধর ব্যক্তি ছিলেন। যে কোন প্রতিভাধর আমাদের চাইতে দশ গুণ পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারেন।" আমরা তখন বলি এ কথা সত্য। একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি আমাদের চেয়ে দশ গুণ পারদর্শিতা দেখাতে পারেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ৯৯টি গুণবাচক শব্দ দিয়েছেন। কিন্তু সবচেয়ে অলৌকিক ও ঐশ্বরিক কাজ করেছেন যে তিনি তার তালিকায় 'পিতা' শব্দটি রাখেননি। এটি সর্বাপেক্ষা অলৌকিক।

স্বর্গের পিতা

মানুষের তৈরি তালিকায় যে কোন রচয়িতা প্রথম আধা ডজন গুণবাচক শব্দ লিখতে গিয়েই 'পিতা' শব্দটি উচ্চারণ না করে পারবেন না। অলৌকিক বিষয় যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর তালিকায় সেই একটি শব্দ ব্যতীত

৯৯টি শব্দ রয়েছে। ঈশ্বরের গুণবাচক একটি বিশেষ শব্দ "পিতা" তার নবীজীবনের ২৩ বছর ধরে সম্মুখে ছিল। তিনি এই শব্দটিকে পরিহার করেছেন। জ্ঞানত অথবা নিজেরই অজান্তে তিনি এই শব্দটিকে তাঁর শব্দভাণ্ডার হতে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। কারণ এ শব্দটি ইসলামের বাইরে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, "খ্রিস্টানদের প্রভু বন্দনা কেমন?"তা অবশ্য ঠিকই। তারা আমাকে এ বন্দনাটি পাঠ করতে বলল। আমি পাঠ করলাম ঃ

"হে আমাদের পিতা, যার অবস্থান স্বর্গে, নাম আলোকিত হোক, হে আমাদের পিতা, তোমার রাজ্য আসুক, আমাদের নাও। আমাদের এই পৃথিবীকে তোমার রাজ্য বানাও।

খ্রিস্টানরা প্রশ্ন করতে পারে যে এই প্রার্থনায় দূষণীয় কি রয়েছে? আমি বলব, না, দূষণীয় কিছুই নেই। কিন্তু মুসলমানরা কেন এই শব্দটি সম্পর্কে স্পর্শকাতর? কেন? আমি আমার প্রতিপক্ষের প্রতি কোন একচোখা দৃষ্টি দিয়ে দেখি না। আমাদের স্বীকার করতেই হবে। খ্রিস্টানদের প্রার্থনা সঙ্গীত অত্যন্ত সুন্দর; কিন্তু সেখানে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। ঐ প্রার্থনার মাধ্যমে আমাদের শিশুরা ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম জানবে না। তার নাম কি? বাইবেলের নতুন নিয়ম গ্রন্থে ২৭টি পুস্তকের কোথাও ঈশ্বরের নাম নেই। তার পরিবর্তে বলা হয়েছে "পিতা" কিন্তু পিতা তো কোন নাম নয়। একটি গুণের প্রকাশ মাত্র যার অর্থ প্রভু, ঈশ্বর, স্রষ্টা, জন্মদাতা। যেমন 'হে স্বর্গের পিতা, প্রিয় পিতা' ইত্যাদি। মুসলমানগণ এই অর্থ আরোপে আপত্তি করবে, কারণ পিতার যে অর্থ দ্যোতনা কখনোই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। এজন্যই পিতা অর্থ আরোপ করা আমরা পছন্দ করি না।

খ্রিস্ট ধর্মমতে এই সহজ সাধারণ 'পিতা' শব্দটি নতুন অর্থ লাভ করেছে। খ্রিস্টান ধর্মমতে তার একটি অবৈধ পুত্র রয়েছে যিশু। তাদের Catechism নামক একটি ধর্মীয় গ্রন্থে বলা হয়েছে যিশু প্রকৃত ঈশ্বরের প্রকৃত ঈশ্বর। পিতা হতে জন্ম, এই জন্ম মানে জৈবিকভাবে জন্ম নয়, ছাড়া নয়, যদি অন্য কোন অর্থ থাকে তাহলে এর অর্থটি কী? অবশ্যই এর কিছু অর্থ আছে। পবিত্র বাইবেল অনুসারে ঈশ্বরের অনেক পুত্র যেমন আদম, ইসরাইল, ইবরাহীম, দাউদ, সোলায়মান ইত্যাদি কিন্তু এগুলো রূপক —আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। স্রষ্টা এবং পালক হিসাবে সকল প্রাণী ও মানব জাতির রূপক পিতা। তিনি নিজে নিজে জন্মলাভ করেছেন। তাকে তৈরি করা হয়নি। ইসলামে এই ধরনের উচ্চারণ অসম্ভব। আল্লাহ্‌র গুণাবলির মধ্যে পশু-চরিত্র প্রদান করা, নিম্নশ্রেণীর পশুর যৌন ক্ষমতা প্রদান করা চরম ঘৃণিত কাজ।

অর্থের পরিবর্তন

প্রথমে ঈশ্বরের পরিবর্তে পিতা শব্দটি ব্যবহার কোন দূষণীয় ছিল না; কিন্তু সময়ে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়। উদাহরণস্বরূপ দুটি শব্দ দেওয়া গেল যেমন কমরেড ও গে। এক সময় কমরেড শব্দের সাদামাটা অর্থ ছিল বন্ধু। কিন্তু সেই শব্দটি আমেরিকায় মারাত্মকভাবে ঘৃণার বস্তুতে পরিণত হয়েছে । কমরেড অর্থ কমিউনিস্ট। যুক্তরাষ্ট্রে তোমার বন্ধু যদি ভুল করে তোমাকে কমরেড বলে আহবান করে তাহলে তোমার চাকুরী শেষ। গে শব্দের অর্থ ছিল হাসি-খুশি, আনন্দ উচ্ছল ব্যক্তি। বর্তমানে এই শব্দটি অতি জঘন্য নোংরা অর্থে, সমকামী অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। তেমনি "পিতার"একমাত্র জন্মদান এই বিশ্বাস অন্যরূপভাবে "পিতা" শব্দটিকে সংক্রমিত করেছে।

রব অথবা আব্ব?

অসীম ক্ষমতাশালী আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে ঈশ্বরের স্থলে "পিতা" শব্দটি ধর্মীয় শব্দাবলির বাইরে রেখে, ইসলাম এবং মুসলমানদের রক্ষা করেছেন। এ এক অলৌকিক ঘটনা যে, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌র ৯৯টি গুণবাচক নাম রয়েছে। তার মধ্যে আছে "রব" যার অর্থ প্রভু, পালনকর্তা, লালনকর্তা ইত্যাদি। এই 'রব' শব্দটি প্রায় এক ডজন বার উচ্চারিত হয়েছে কিন্তু আরবি ও হিব্রু ভাষায় পিতা অর্থ "আব্ব" এ সহজ শব্দটি একবারও ব্যবহৃত হয়নি। এর ফলে মুসলমানরা ধর্মের প্রতি অশ্লীল বা কটু বক্তব্য জন্ম প্রাপ্ত পুত্র এই কথা হতে রক্ষা পেয়েছে। এই শুভ কর্মটির দায়িত্ব আমরা কাকে দেব, আল্লাহকে না মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে? মহানবী সব সময় এই প্রকার কৃতিত্বকে অস্বীকার করে বলেছেন এই সকল শব্দ তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে উচ্চারণ করেছেন, এগুলো তার শব্দ নয়, এগুলো আল্লাহ্‌র শব্দ, যেমন ভাবে তাকে দেওয়া হয়েছিল।

অধ্যায় ছয়

বিতর্কের অবসান

পবিত্র কুরআন একটি অলৌকিক মহাগ্রন্থ। এ পবিত্র গ্রন্থের অলৌকিকতা সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে অসংখ্য ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আমি কয়েকটি সাধারণ বিষয় নিয়ে চেষ্টা করেছি মাত্র। একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে আমি যেভাবে চমকিত ও বিস্মিত হয়েছি সেই বিস্ময় ও চমক সকলের সঙ্গে উপভোগ করতে চেয়েছি মাত্র। এ বিষয়ে গবেষণার কোন শেষ নেই। আমার বিজ্ঞ জ্ঞানী মুসলিম ভাইদেরকে অনুরোধ করছি তারা আরও গবেষণা করুন। তাদের প্রচেষ্টায় আমি যেন দেখে যেতে পারি। সর্বশেষে একটি উদাহরণের মাধ্যমে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা শেষ করছি।

সোয়াজিল্যান্ডের প্রতি আহ্বান

কয়েক বছর পূর্বে সোয়াজিল্যান্ডে একটি বিতর্কের সূচনা হয়েছিল। রাজা সবুজা তার রানীকে হারিয়েছিলেন। সে দেশের খ্রিস্টান গির্জা জল্পনা করতে লাগল একজন মানুষ পুনরায় বিবাহ করতে কতদিন অপেক্ষা করতে পারে। এটা আলোচনার জন্য কোন বিরাট সমস্যা ছিল না। কারণ রাজার আরও আট স্ত্রী বর্তমান ছিল। তখন আলোচনার বিষয় বদলে গিয়ে বিতর্কের বিষয় দাঁড়াল "স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী পুনরায় বিবাহ বসার পূর্বে কতদিন অপেক্ষা করবে?"

ক্ষুদ্র রাজ্যে এই তর্ক তোলপাড় করে তুলল। মহানুভব রাজা দেশের সকল গির্জার কর্মকর্তাদের আদেশ করলেন একটি ধর্মসভা ডেকে সমস্যার সমাধান করতে। সোয়াদি ভাই মিস্টার মুসা বোরম্যান যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনি রাজার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলেন যে তার মসজিদেই এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হোক। রাজার অনুগ্রহে আমিও সেই সভায় অংশ গ্রহণের সম্মান লাভ করলাম।

রোববার দিন সকাল বেলা রাজার ক্রাল বা ঘেরাও করা বাসভবনে খ্রিস্টানদের নানা পর্যায়ের প্রতিনিধি সমবেত হলো। উদ্দেশ্য বৈধব্যকাল কতদিন হবে সেই বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা। বক্তার পর বক্তা বক্তৃতা দিতে লাগল। এই বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা আফ্রিকানদের যথেষ্ট দক্ষতা দিয়েছেন, এরা প্রত্যেকেই একেকজন বিলি

গ্রাহাম অথবা জিমি সাগর। প্রতিটি বক্তৃতার পর শ্রোতারা প্রচণ্ডভাবে হাততালি দিতে লাগল। পরবর্তী বক্তা এসে পূর্ববর্তী বক্তৃতাকে "পালিশ" (Paalish) বলে উড়িয়ে দিতে লাগল (পালিশ অর্থ মতলববাজী বক্তৃতা) একজন আরেকজনের বক্তব্যকে রাবিশ, গারবেজ ইত্যাদি বলে বাতিল করতে লাগলেন আর সবাই হাততালি দিল। এমনি করে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধর্মসভার অনুষ্ঠান চলল। বিকেল পাঁচটার দিকে আমার ডাক পড়ল। আমি পবিত্র কুরআন হাতে নিয়ে বলতে আরম্ভ করলাম, "আজ সকাল থেকে রাত অবধি একটি প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে বারবার হোচট খাচ্ছি। কিন্তু জবাব পাইনি। প্রশ্নটি ছিল স্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিবাহিত হওয়ার পূর্বে বিধবা স্ত্রী কতদিন অপেক্ষা করবে। এ সম্পর্কে আমরা এতক্ষণ ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্ট কি বলে তা শুনেছি। এবং নিউ টেস্টামেন্ট ও ওল্ড টোস্টামেন্ট কি বলে তাও শুনেছি। কিন্তু আমাদের জবাব পাইনি। কারণ জবাবটি রয়েছে লাস্ট টেস্টামেন্ট (সর্বশেষ টেস্টামেন্টে)।

লাস্ট টেস্টামেন্ট বলতেই খ্রিস্টান পাদ্রী ও পুরোহিতদের মধ্যে যেন বোমা বিস্ফোরিত হল। তারা জীবনে কোনদিন লাস্ট টেস্টামেন্টের কথা শুনেনি। "ওল্ড ও নিউ", নিউ ও ওল্ড" কোথাও জবাব পাওয়া যাবে না।, কারণ জবাব রয়েছে লাস্ট টেস্টামেন্টে। অর্থাৎ মানুষের নিকট ঈশ্বর যে সর্বশেষ গ্রন্থ পাঠিয়েছেন সেই সর্বশেষ গ্রন্থে।" এই বলে আমি পবিত্র কুরআন মাথার উপর উঁচু করে তুলে ধরলাম, তারপর দ্বিতীয় সূরার ২৩৪ আয়াতের ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করে শোনালাম।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকবে। যখন তারা তাদের ইদ্দত-কাল পূর্ণ করবে তখন যথাবিধি নিজের জন্য যা করবে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। — কুরআন ২ : ২৩৪

"তারপর শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করে বললাম চার মাস দশ দিন। এর কি কোন ব্যাখ্যা প্রয়োজন?" শ্রোতৃমণ্ডলী বলে উঠল "না"। জ্ঞানী পুরোহিতদের নিকট এই চারমাস দশ দিন নির্ধারণ করার কারণ ব্যাখ্যা করলাম। এই আয়াতের পূর্বে ২২৮ নং

আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশেষ ও চূড়ান্ত টেস্টামেন্টে তালাকপ্রাপ্ত মহিলা কতদিন অপেক্ষা করবে সেই সম্পর্কে বলেছেন :

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিন রজঃস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকবে।

— কুরআন ২ : ২২৮

এখানে তিন মাস অপেক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। কোন কারণবশত যদি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে এবং তাদের কোন সন্তান জন্মের সম্ভাবনা থাকে তা দেখার জন্য। কিন্তু বৈধব্যের ক্ষেত্রে এর অপেক্ষার সময় একমাস দশদিন বেশি ধার্য করা হয়েছে। এই কারণ অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত সেই কথা সকলেই স্বীকার করবে কিন্তু এর মধ্যে অলৌকিকত্ব কি? যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে তালাকের ক্ষেত্রে তিনমাস এবং স্বামীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে চার মাস দশ দিন হওয়ার কারণ কি? হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অন্য সকলের মতই ধারণ করতে পারেন এ কথা সত্য। কিন্তু এই সকল স্বাস্থ্যকর ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর নিজের কাজ নয়।

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ؕ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ؕ

স্ত্রীলোকদের নিকট তোমরা ইঙ্গিতে বিবাহ প্রস্তাব করলে অথবা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখলে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করবে; কিন্তু বিধিমত কথাবার্তা ব্যতীত গোপনে তাদের নিকট কোন অঙ্গীকার করো না; নির্দিষ্টকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ করো না। — কুরআন ২ : ২৩৫

আল্লাহ্‌র নিদর্শনের চিহ্ন

অপেক্ষার সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ সম্ভব নয়। এই কথা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর চাতুর্য নয়। একথা সর্বজ্ঞানী মহা আল্লাহ্‌র। মহান স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির দুর্বলতা জানেন, মানুষ তার লোভ ও প্রেমাসক্তির কারণে দুর্বল বিধবার উপর অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। সে কেবল মাত্র তার শক্তি ও আশ্রয়স্থল হারিয়েছে। হয়তো তার শিশু সন্তানের অন্নবস্ত্রের সংস্থান নেই, এমনকি বিবাহের জন্য তার নিজের রূপও নেই। তখন সে ডুবন্ত মানুষের মত খড়কুটা যা পাওয়া যায় তাই আঁকড়ে ধরতে চাইবে। তার এই মানসিক অস্থির অবস্থায় যে-কোন প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে। আশ্রয়হীনতার আশঙ্কায় ও আত্মরক্ষার লোভে তাড়াহুড়ার মাধ্যমে সে যে-কোন প্রস্তাবে সম্মত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সবার অলক্ষ্যে সেই মহা মনস্তত্ত্ববিদ আল্লাহ্ তা'আলা যিনি মানুষের সব কিছুই জানেন; তিনি সাবধান করে বলেন যতক্ষণ সময় অতিক্রান্ত না হচ্ছে কোন চুক্তিই নয়। তালাকের পর ইদ্দতের সময় তিন মাস। এখানে তাকে অতিরিক্ত চল্লিশ দিন সময় বেশি দেওয়া হচ্ছে, যাতে সে মানসিক ভারসাম্য ফিরে পেয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। যদি বিবাহের কোন প্রস্তাব ইতিমধ্যে আসে সে তার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আবেগমুক্তভাবে আলোচনা করতে পারে। দ্রুত স্বীকৃতির মধ্যে কোন ভুল থাকতে পারে। সেই ভুল যেন জীবন ভরে বহন করতে না হয়। ১৪০০ বছর আগে মরুভূমিতে বসবাস করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পক্ষে এত কিছু চিন্তা ভাবনা করা সম্ভব ছিল কি? তোমরা তাকে বেশি কৃতিত্ব দিতে চাচ্ছ। কিন্তু তাকে বারবার বলতে বলা হচ্ছে যে, কুরআনের এইসব জ্ঞান তার নয়। এসবই আল্লাহ্‌র নিকট হতে আগত। আল্লাহ্ দয়াবান স্রষ্টা যদি এখনও তোমাদের তার এই সাক্ষ্য সম্পর্কে সন্দেহ থাকে তাহলে এমন একটি জিনিস তৈরি কর।

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ۝

বল, যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জ্বিন সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ আনয়ন করতে পারবে না। — কুরআন ১৭ : ৮৮

বিশ্বের নিকট এমন একটি গ্রন্থ রচনায় চ্যালেঞ্জ সেই ১৪০০ বছর আগে থেকে দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান আরব বিশ্বে প্রায় এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ খ্রিস্টান রয়েছে। তারা পবিত্র কুরআনের রীতিতে গসপেল রচনা করেছেন। কুরআনের শব্দ, বাক্য এমনকি রচনাশৈলী সবকিছু নকল করেছেন, এমনকি বিসমিল্লাহ্ যোগ করতে ভুল করেননি। তারা প্রতিটি অধ্যায়ের শীর্ষে বিসমিল্লাহ যোগ করেছেন। না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। এই সঙ্গে মানুষের তৈরি সেই প্রত্যাদেশের ফটোকপি দেওয়া গেল।

পবিত্র কুরআন যে অননুকরণীয় তার এই আরেকটি প্রমাণ। আপনারা যত খুশি চেষ্টা করতে পারেন, চ্যালেঞ্জ এখনও রয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট প্রেরিত আল্লাহ্‌র বাণী এই পবিত্র কুরআন-এক বিস্ময়কর — অলৌকিক মহাগ্রন্থ।

"সত্যই এটি অলৌকিক।" — রেভারেন্ড বসওয়ার্থ স্মিথ

আল-কুরআন : এক বিস্ময়কর অলৌকিক মহাগ্রন্থ

অনুবাদ

মুহাম্মদ গোলাম মোস্তাফা

সূচি

অধ্যায় এক

প্রারম্ভিক পটভূমি

স্মরণাতীত কাল থেকেই মানুষের সাধারণ একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্যে সৃষ্টিকর্তার তরফ থেকে তাঁর ইচ্ছা ও পরিকল্পনা মাফিক যখনি কোন পথ প্রদর্শক আবির্ভূত হন, তখন তাঁদের সেই মূল্যবান বাণীসমূহ গ্রহণ না করে, মানুষ সেই সব প্রেরিত পুরুষদের কাছ থেকে অলৌকিক কিছু প্রমাণ চেয়ে বসে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ধর্মোপদেশ প্রদানের জন্যে হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম যখন বনী ইসরাইলদেরকে শুধুমাত্র প্রচলিত ধর্মাচরণ থেকে বিরত থেকে আল্লাহ্‌র প্রদত্ত আইন ও নির্দেশ বিমণ্ডিত সত্যিকার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের আহবান জানালেন, তখন তাঁর সেই প্রচারিত সত্যের প্রমাণ স্বরূপ তারা তাঁর কাছে অলৌকিকত্ব দাবি করে বসলো। যেমন মথি লিখিত সুসমাচারের ১২ অধ্যায়ে ৩৮ ও ৩৯ নম্বর শ্লোকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তখন কয়েকজন অধ্যাপক ও ফরীশী তাকে বলল, আমরা আপনার কাছে কোন চিহ্ন দেখতে ইচ্ছে করি।" তিনি উত্তর করে তাদের বললেন, এই কালের ব্যভিচারী লোকে চিহ্নের অন্বেষণ করে, কিন্তু যোনা ভাববাদীর চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন তাদের দেওয়া যাবে না।" আপাতদৃষ্টিতে যদিও তিনি তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কিন্তু সুসমাচারের অনেক কাহিনীতেই আমরা দেখতে পাই, প্রচুর অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করেছেন তিনি!

প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের নিকট তাদের প্রভুর কাছ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছিল, বাইবেল সেই অলৌকিক কাহিনীতে ভরপুর। বস্তুত এই সব লক্ষণ এই সব বিস্ময়কর ঘটনা, এই সব মুযিজা বা অলৌকিকত্ব সেই মহান আল্লাহ্‌র; কিন্তু তাঁর মনুষ্য প্রতিনিধি মারফত ঐগুলো কার্যকর হয়েছে বলে আমরা সেসব বিস্ময়কর ঘটনাকে আখ্যায়িত করে থাকি মূসা আলাইহিস সালাম বা ঈসা আলাই হিসসালাম-এর অলৌকিকত্ব বা মুজিজা বলে।

আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আরবের মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম-এর প্রায় ছয়'শ বছর পরে। ৪০ বছর বয়সে যখন তিনি দীনের প্রচার শুরু করলেন, তাঁর স্বদেশবাসী তখন তার কাছে অলৌকিকত্ব প্রদর্শনের সেই একই প্রার্থনা জানালো, যেমনটি জানিয়েছিল হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম-এর সমকালীন লোকেরা তাদের প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তার কাছ থেকে। এ সম্পর্কে কুরআনুল করীমে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ

ওরা বলে, তার প্রতিপালকের নিকট হতে তার কাছে নিদর্শন প্রেরিত হয় না কেন? — কুরআন ২৯ : ৫০

তাদের দাবির এটা ছিল সাধারণ একটা প্রবণতা! সুনির্দিষ্টভাবে তাদের বক্তব্য ছিল, তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম শূন্য আকাশে মই স্থাপন করে তাঁর প্রভুর নিকট থেকে তাদেরই চোখের সামনে নিয়ে আসুন একটা গ্রন্থ "তাহলেই আমরা বিশ্বাস করবো" অথবা অদূরে অবস্থিত ঐ পাহাড়টা রূপান্তরিত করুন সোনায়—তাহলে আমরা বিশ্বাস করবো কিম্বা মরুর বুকে প্রবাহিত করুন ঝর্ণা তাহলেও আমরা বিশ্বাস করবো।

প্রত্যাদেশে সন্দিগ্ধ সেইসব অযৌক্তিক দাবির সামনে শুনুন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর শান্ত মধুর জবাব ঃ "তোমাদের কাছে কি আমি বলি যে, প্রকৃতই আমি একজন আসমানী দূত? তোমাদের কাছে কি আমি বলি, আমার হাতেই রয়েছে আল্লাহ্‌র অফুরন্ত সম্পদ? - আমার কাছে যা প্রত্যাদিষ্ট হয় শুধু তাই অনুসরণ করি আমি।" অবিশ্বাসীদের জন্য আরও শুনুন তার প্রভু নির্দেশিত মহাসম্মানিত বাঙময় জবাব ঃ

قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

বলুন, নিদর্শন আল্লাহ্‌রই ইখতিয়ারে। আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র।— কুরআন ২৯ : ৫০

বিশেষ নিদর্শন বা অলৌকিকত্ব প্রদর্শনের সেই কপট দাবি, যা তাদের নির্বোধ পৌত্তলিক মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তারই সার্থক ও সমুচিত জবাব

হিসেবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে কুরআনুল করীমের নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ মারফত ঃ

اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

ইহা (আল-কুরআন) কি ওদের জন্যে যথেষ্ট নয়, যে আমি আপনার নিকট (হে মুহাম্মদ) কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়। এতে অবশ্যই অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে। সেই কওমের জন্য যারা ঈমান আনে। — কুরআন ২৯ : ৫১

পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনের অনুপম সত্যতা ও অলৌকিক তাৎপর্যের প্রমাণ স্বরূপ এখানে দু'টি যুক্তি উপস্থাপন করা যেতে পারে ঃ

১."আমরা (আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান) আপনার নিকট এই মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি"। 'আপনার' অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে যিনি একজন অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষ। একজন উম্মী নবী যিনি পড়তে ও লিখতে জানেন না, নিজের নাম পর্যন্ত স্বাক্ষর করতে যিনি অসমর্থ। টমাস কার্লাইল তাঁর "হিরো এ্যাণ্ড হিরো ওয়ারশিপ" বক্তৃতামালায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই শিক্ষাগত যোগ্যতার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন বড় সুন্দরভাবে ঃ "আমরা আর একটি ঘটনা নিশ্চয়ই বিস্মৃত হবো না যে, তাঁর কোন স্কুল শিক্ষা ছিল না, স্কুল শিক্ষা বলতে আমরা যা বুঝি তার একটুও না।"

আল-কুরআন যে কখনোই রচনা করেন নি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, এই মহাগ্রন্থের রচয়িতা যে কখনোই তিনি নন তাঁর এই দাবির প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ্ কী সাক্ষ্য প্রদান করেছেন দেখুন ঃ

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝

আপনি তো (হে মুহাম্মদ)-এর আগে কোন কিতাব পাঠ করেন নি এবং স্বহস্তে কোন কিতাব লেখেনও নি যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করবে।

— কুরআন ২৯ : ৪৮

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যদি একজন বিদ্বান ব্যক্তি হতেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যদি পড়তে ও লিখতে জানতেন, তাহলে "আল কুরআনই আল্লাহর বাণী, তাঁর এই স্পষ্ট উক্তিতে বাচালদের সন্দেহ করার মত হয়তো বা একটা যুক্তি হতে পারতো। তিনি যদি শিক্ষিত ব্যক্তি হতেন তাহলে এই মহাগ্রন্থ ইহুদী বা খৃস্টানদের পবিত্র গ্রন্থ থেকে তিনি স্রেফ কপি করেছেন বা এরিস্টোটল ও প্লেটো পড়ে এবং "তওরাত", "জবুর" ও "ইঞ্জিল পাঠ করে সুন্দর ও সুললিত ভাষায় তিনি ইহা গ্রন্থনা করেছেন। তাঁর শত্রুদের এই বক্রোক্তি হয়তো বা প্রাসঙ্গিক হতো; তাহলে সেই অহংকারী মিথ্যাচারীদের উক্তির একটা সার্থকতা থাকতো। কিন্তু এটা এমনি একটা নাজুক যুক্তি যা ছিদ্রান্বেষী অবিশ্বাসীদের কাছেও অসত্য, এটা এমনি খোঁড়া যুক্তি, যা সত্যিকারভাবেই অবিশ্বাসীদের কাছেও অবিশ্বাস্য!

২. গ্রন্থখানি? হ্যাঁ, এই পবিত্র গ্রন্থখানিই সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করছে যে, এটি আল্লাহরই অমোঘ বাণী! যে কোন দিক থেকে অধ্যয়ন করুন একে সুস্পষ্টভাবে পর্যালোচনা করুন এই গ্রন্থখানি, দেখবেন সন্দেহকারীদের অমূলক সন্দেহ কী সুন্দরভাবে চ্যালেঞ্জ করেছেন পবিত্র এই গ্রন্থের গ্রন্থকার আল্লাহ জাল্লা শা'নহু নিজেই ঃ

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝

তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না? এটি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বাণী হতো তবে নিশ্চয়ই এতে তারা অনেক অসঙ্গতি পেত।

— কুরআন ৪ : ৮২

কোন মানুষের পক্ষেই একটানা তেইশ বছর ধরে তার শিক্ষা ও উপদেশাবলির মাঝে অবিচল থাকতে পারে না। চরম পরস্পর বিরোধী জীবনের উত্থান-পতনময় পথ অতিক্রমকালে একজন মানুষ কোথাও-না-কোথাও একটা রফা করে ফেলে, নিজের মধ্যে নিজেই প্রতিবাদী হয়ে ওঠে! কোন মানুষই ধর্মোপদেশমূলক কোন বক্তৃতা একই রকম থাকতে পারে না। যেমনটি অবিচল, সম্পূর্ণরূপে সুসমঞ্জস পবিত্র এই আল কুরআনের বাণী। হতে পারে, অবিশ্বাসীদের প্রতিবাদ কিন্তু শুধু প্রতিবাদের খাতিরেই এবং তাদের নিজেদের বিচার-বিবেচনার বিরুদ্ধেই হয়তো তর্কজনিত নিষ্ফল প্রতিবাদ!

বারবার যখন আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে নিদর্শন বা অলৌকিকত্ব দাবি করা হলো, তখন তাকে কুরআনুল করীমের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে বলা হলো; বলা হলো, উর্ধ্ব আকাশের বাণী।- এটা এক মহান মো'যেজা - অনেক মো'যেজার চরম মো'যেজা এটি এবং পণ্ডিত ও গুণীজন, বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক পরিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ, যাঁরা সত্যিকারভাবে সত্যপরায়ণ, তাঁরা আল কুরআনকে একটা অকৃত্রিম মো'যেজা হিসেবেই স্বীকার করেছেন, শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করেছেন। কুরআনুল করীমে দয়াময় আল্লাহ্ তাই ঘোষণ করেন ঃ

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ۝

বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরে এটি এক স্পষ্ট নিদর্শন। কেবল জালিমরাই আমার নিদর্শন অস্বীকার করে। — কুরআন ২৯ : ৪৯

অধ্যায় দুই

কুরআনিক প্রত্যাদেশের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ

আজকের এই পৃথিবীতে কমপক্ষে ন'শ মিলিয়ন মুসলমান আল কুরআনকে আল্লাহ্‌রই বাণী বলে দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করেছেন; এবং এটাই একটা "মির‍্যাকল" মুযিজা বা অলৌকিকত্ব। যেখানে ইসলামের স্বীকৃত শত্রুরা আল্লাহ্‌র বাণী এই আল্ কুরআনের অলৌকিকত্বের কাছে শ্রদ্ধাবনত, সেখানে তারা তা করবেই বা না কেন? রেভারেন্ড আর বসওয়ার্থ তাঁর "মুহাম্মেড এ্যান্ড মুহামেডানিজম" গ্রন্থে আল-কুরআনকে অলৌকিকত্বের পবিত্র একটি প্রতীক, একটি মহৎ জ্ঞান এবং একটি মহাসত্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অন্য আর একজন ইংরেজ লেখক মিঃ এ.জি. আরবেরী তাঁর ইংরেজিতে অনূদিত আল-কুরআনের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন, "যখনি আমি আল্ কুরআনের বাণী শ্রবণ করেছি, তখনি আমার মনে হয়েছে, আমার অন্তর প্রদেশ হতে উৎসারিত হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনের সাথে নি:সৃত হচ্ছে যেন একটি সুমধুর সুর তরঙ্গ!' তাঁর এই মন্তব্যের মধ্যে এবং তাঁর অনুবাদের অবতরণিকার অবশিষ্টাংশের মধ্যে একজন মুসলমানের উক্তিই ধ্বনিত হয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন একজন খৃস্টান হিসেবে।

এবং এ ছাড়া আরও একজন বৃটেনবাসী মারমাডিউক পিকথাল, তাঁর কুরআন উল-করীমের ইংরেজি অনুবাদের মুখবন্ধে বলেছেন, "কুরআনের অনুপম সুর, অত্যুৎকৃষ্ট ধ্বনি মানুষকে অশ্রু এবং আনন্দের জগতে নিয়ে যায়।" কুরআন অনুবাদের আগেই ইনি ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন; তাই হয়তো নিশ্চিত করে বলা যায় না যে, তাঁর এই অনুভূতি ইসলামে দীক্ষা নেবার আগে না পরে। কিন্তু যাই হোক, বন্ধু এবং শত্রু নির্বিশেষে সবাই একই ভাবে আন্তরিক শ্রদ্ধায় অভিসিক্ত করেছেন আল্লাহ্‌র এই সর্বশেষ মহান বাণী আল কুরআনকে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গ আল্ কুরআনের এই সৌন্দর্য ও মহিমা প্রত্যক্ষ করেছিলেন; আর পবিত্র এই বাণীর মহত্ত ও চমৎকারিত্ব এবং উদারতা ও মহানুভবতার মাঝে আল্লাহ্‌র অনন্ত কর্মের অফুরন্ত অলৌকিকত্ব প্রত্যক্ষ করে গ্রহণ করেছিলেন সুমহান ইসলাম।

শ্রদ্ধামিশ্রিত এইসব প্রশংসাবাণীর মাঝে একজন সন্দেহবাদী নাস্তিক ও অবিশ্বাসী হয়তো বলবে এগুলি ছিল স্রেফ আত্মিক অনুভূতি; এবং আরো একটু অগ্রসর হয়ে সে হয়তো আশ্রয় গ্রহণ করবে এই বিষয়টির উপর যে, সে তো আরবি জানে না। তোমরা যা দেখো, আমি তা দেখি না, তোমরা যা অনুভব করো,আমি তা করি না। তাহলে কেমন করে আমি জানবো যে, আল্লাহ্ আছেন, এবং সেই তিনিই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রত্যাদেশ হিসেবে পাঠিয়েছেন তাঁর এই অনিন্দ্য সুন্দর বাণী! সে হয়তো বলে যাবে, এর দার্শনিক সৌন্দর্যর সাথে আমি বিরুদ্ধভাবাপন্ন নই, ব্যবহারিক নীতি তত্ত্বে এবং উন্নত নৈতিকতায় ও আমি পরাঙ্মুখ নই! আমি স্বীকার করতে রাজী আছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সত্যিকারভাবেই একজন সৎ এবং মানুষের মঙ্গলের জন্য তিনি দিয়ে গেছেন অনেক সুন্দর সুন্দর নৈতিক শিক্ষা! কিন্তু আমি সম্মতি জ্ঞাপন করতে পারি না যে, তাঁর "সারগর্ভ বাণীর" জন্যে তিনি ছিলেন অলৌকিক প্রাধিকার প্রাপ্ত "একজন রাসূল" তোমরা মুসলমানেরা যেমনটি দাবী করো!

এইসব সহানুভূতিসূচক অথচ সন্দেহাকুল মনোবৃত্তির ধারকদের সন্দেহ নিরসনের জন্যে এই মহাগ্রন্থের (আল্ কুরআনের) গ্রন্থকার (আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন) অনেক যুক্তিরই অবতারণা করেছেন। এইসব নাস্তিক ও অজ্ঞেয়বাদী, এইসব অবিশ্বাসী ও সন্দেহবাদী, যাদের বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা অত্যন্ত প্রখর এবং নিজেদেরকে যারা মনে করেন অসাধারণ বুদ্ধিজীবী, এই বিশেষ বিষয়টি তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় মূল বস্তুটির দিকে, যেখানে সত্যিকারভাবেই তাঁরা যথার্থ বামনের মতো— সেই সব বামনের মতো, যারা তাঁদের শারীরবৃত্তীয় একটি বিশেষ অংশের ক্ষতি স্বীকার করে-ছোট্ট দেহের উপর বিরাট মস্তকের ন্যায়, অস্বাভাবিক উন্নতি অর্জন করেছেন। মহান সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে প্রশ্ন করেছেন।

কিন্তু আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর প্রশ্ন তাঁদের কাছে তুলে ধরবার আগে আমি মিটিয়ে নিতে চাই আমার কৌতূহল ঃ আপনারা যাঁরা বিজ্ঞানী, যাঁরা জ্যোতির ঃ শাস্ত্র গড়েছেন, কোন বস্তুকে আপন হাতের তালুতে পরীক্ষা করার মত- আপনারা যাঁরা শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে আমাদের এই মহা বিশ্বকে মনোযোগের সাথে পরীক্ষা করে চলেছেন, - তারা কি বলতে পারেন, কেমন করে সৃষ্টি হলো এই মহাবিশ্ব? আত্মিক জ্ঞানের অভাক সত্ত্বেও বিজ্ঞানের এই মানুষটি তাঁর জ্ঞানের হিস্সায় বড় উদার! সঙ্গে সঙ্গে সে জবাব দেয়, সহস্র কোটি বছর আগে আমাদের এই বিশ্বজগত ছিল একখণ্ড জড় পদার্থ; এবং সেই বিরাটজড় পিণ্ডের কেন্দ্রস্থলে একদা সংঘটিত হলো এক মহা বিস্ফোরণ আর চতুর্দিকে উড়তে আরম্ভ করলো বৃহদাকার সেই ভগ্ন জড়পিণ্ডের বিরাট টুকরো! সেই মহা বিস্ফোরণ থেকেই জন্ম লাভ করেছে আমাদের সৌরজগৎ, জন্ম

হয়েছে ছায়াপথের। এবং হেতু মহাশূন্যে সেই আদিম আকস্মিক বিস্ফোরণে উৎপাদিত আদিম ভরবেগের কোর প্রতিবন্ধকতা ছিল না, তাই নক্ষত্রমণ্ডলী আর গ্রহসমূহ সাঁতরে ফিরতে লাগলো তাদের কক্ষপথে! ধীরে ধীরে বিকশিত ও বিস্তৃত বিশ্বই আমাদের এই বিশ্বজগৎ! ছায়াপথসমূহ দ্রুত এবং দ্রুততবেগে সুরে পড়তে লাগলো আমাদের কাছ থেকে এবং একদা তারা লাভ করলো আলোর গতি। অতঃপর আর কোনো দিন তাদের সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হবো না আমরা! সুযোগ যদি আমরা না হারাই, তবে দ্রষ্টব্য বস্তুসমূহ গবেষণার জন্যে যথাশীঘ্র সম্ভব আমরা তৈরি করবো বড় ও উন্নতমানের দূরবীক্ষণ যন্ত্র।

আমাদের জিজ্ঞাসা, "কখন আবিষ্কার করলেন আপনার এই কল্পকাহিনী?" "—না, কল্প কাহিনী নয় এগুলো; এগুলো বৈজ্ঞানিক সত্য", জবাব দেন আমাদের বন্ধু। "বেশ , গ্রহণ করা গেল আপনার এই তথ্য; কিন্তু এই তথ্যসমূহের সাক্ষাৎ ঘটলো কখন আপনার?" তিনি জবাব দেন, এই সেইদিন বলা চলে, "মাত্র গতকাল।" মানুষের ইতিহাস পঞ্চাশটা বছর মাত্র গতকাল? আপনার এই মহাবিস্ফোরণ তথ্য, আপনার এই বিস্তৃত, সম্প্রসারিত মহাবিশ্বের জ্ঞান ১৪০০ বছর আগে মরুভূমির নিরক্ষর একজন আরবের নিশ্চয়ই ছিল না। ছিল কি? "না, নিশ্চয়ই না", গর্বভরে জবাব দেন তিনি। বেশ, তা হলে শুনুন, আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত বাণীতে কি বলেন তিনি ঃ

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا

যারা কুফরী করে, তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে? — কুরআন ২১ : ৩০

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ وَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ۝

আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র; প্রত্যেকেই বিচরণ করে আপনাপন কক্ষপথে। — কুরআন ২১ : ৩৩

হে বিজ্ঞানী, ভূগোলজ্ঞ, জ্যোতির্বিদবৃন্দ, এই বিস্ময়কর বস্তুসমূহ আবিষ্কার করে আপনারা যাঁরা পৌছে দিচ্ছেন মানুষের দুয়ারে দুয়ারে, তাঁরা কি দেখতে পান না যে,

এই আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে বিশেষ করে আপনাদেরই জন্যে? আপনারা কি এমনই অন্ধ যে, সেই মহাগ্রন্থকারকে এখনো দেখতে অক্ষম? "আমাদের এই সব বিজ্ঞান আর বিশ্বকোষের গবেষণাগারে বসে আমরা সেই পবিত্রতমকেই ভুলে যেতে তৎপর।" বিস্মিত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন টমাস কারলাইল। ১৪০০ বছর আগে এই "মহাবিস্ফোরণের" স্রষ্টার সাহায্য ব্যতিরেকেই কী মরুভূমির একজন উষ্ট্রচালক আপনা আপনিই বিবৃত করতে পেরেছিলেন আপনাদের এই সত্য ঘটনাটি?

এবং আপনারা জীববিদ, জৈব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র সম্বন্ধে যাঁরা ওয়াকিবহাল, সেই আপনারাই অস্বীকার করার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছেন মহাজীবনের অস্তিত্বকে। বলুন তো, "আপনাদের গর্বিত গবেষণায় প্রাণের উৎস কোথায়?" বিজ্ঞানের সেই অবিশ্বাসী জ্যোতির্বেত্তা বন্ধুটির মতো তিনিও আরম্ভ করেন," হ্যাঁ সহস্র কোটি বছর আগে মৌলিক জড়বস্তু সমুদ্রে প্রোটোপ্লাজম বা প্রানকোষের মূল উপাদানের উৎপাদন শুরু করে, যার থেকে সৃষ্টি হয় এ্যামিবা (সর্বদা আকার পরিবর্তনশীল সূক্ষ্মত জীবাণু বিশেষ) এবং সমস্ত প্রাণের সৃষ্টি সেই সারবস্তু থেকেই! এক কথায়, প্রাণী জগতের উৎপত্তি ঐ পানি থেকেই।"

"এবং পানি থেকেই সমস্ত প্রাণীজগতের উৎপত্তি" এই তথ্যটির আকস্মিক দর্শন আপনাদের মিললো কখন? জ্যোতির্বেত্তা বন্ধুটির মতোই তাঁর তথ্যটির জবাবও একটিই "গতকাল"। কোন পণ্ডিত, কোন দার্শনিক অথবা কোন কবি চতুর্দশ শতাব্দী আগে আপনাদের এই আবিষ্কার কি কল্পনাও করতে পেরেছিলেন? আমাদের জ্যোতির্বেত্তাদের ন্যায় জীববিদ জোড়ালো জবাব ঃ "না, কখনোই না!" বেশ, তা হলে শুনুন, সেই নিরক্ষর মরুপুত্রের মুখ নি:সৃত বাণী ঃ

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ؕ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে; তবু কি তারা বিশ্বাস করবে না? — কুরআন ২১ : ৩০

আপনাদের জন্যে অবধাবন করা হয়তো কঠিন হবে না, হে পণ্ডিতবর্গ, যে, আপনাদের আজকের সন্দেহবাদের সার্থক জবাব হিসেবেই মহাবিশ্বের মহান মালিক সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র এই সব বাণী প্রেরিত হয়েছে কেবল আপনাদেরই উদ্দেশ্যে। চতুর্দশ শতাব্দী আগে কোন আরববাসীর নাগালের বাইরে ছিল এই সব তথ্য! বিজ্ঞানের হে বিজ্ঞজন! মহান গ্রন্থকার আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন যুক্তির

অবতারণা করেছেন আপনাদের কাছে। ; আর সেই আল্লাহকে আপনারা কিভাবে অবিশ্বাস করেন? তার অস্তিত্বের অস্বীকার করার সর্বশেষ ব্যক্তিই তো হওয়া উচিত আপনাদের; কিন্তু আপনারাই অস্বীকার করছেন সবপ্রথম। কোন পীড়ায় আচ্ছন্ন আপনারা?

এবং উদ্ভিব বিজ্ঞানী, প্রাণীবিজ্ঞানী ও পদার্থবিজ্ঞানী—প্রকৃতি বিজ্ঞানে যাঁরা বিস্ময়কর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, সেই তাঁরাই তাঁদের বিচার বুদ্ধি সত্ত্বেও মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন মহান স্রষ্টাকে! আল্লাহ তা'আলার মুখপাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ নি:সৃত আল্লাহ্‌র বাণী তাহলে তারা খতিয়ে দেখুন একটু

سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ○

পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং ওরা যাদেরকে জানে না, তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে। — কুরআন ৩৬ : ৩৬

আল্লাহ্‌র পবিত্র এই মহাগ্রন্থের আয়াতগুলো স্বব্যাখ্যায় ভাস্বর! আল কুরআনের ছাত্ররা মানব আবিষ্কৃত প্রত্যেকটি দিকে দেখতে পান আল্লাহ্‌র সন্দেহাতীত সুস্পষ্ট অংগুলি নির্দেশ। সন্দেহ দূরীভূত করার জন্যে দয়াময় প্রভু ও মহান প্রতিপালকের নিকট থেকে এটাই নিদর্শন, এটাই মো'জেযা।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ○

জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্যে এর মধ্যেই রয়েছে নিদর্শন! — কুরআন ৩০ : ২২

আফসোস্! এই জ্ঞানবান ব্যক্তিরাই প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহী! বিশাল জড়-জ্ঞানই তাদেরকে করে তুলেছে অহংকারী। সত্যিকার জ্ঞানের মাঝে যে বিনয়-নম্রতা বিরাজ করে, তারই অভাব রয়েছে তাঁদের।

অধ্যায় তিন

পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনের বিশুদ্ধতা

পূর্বে উল্লেখিত আল্লাহ্‌র মহাগ্রন্থ আল কুরআনের অলৌকিকত্ব তো বিগত দিনের মানুষের ব্যাপার; কিন্তু আজকের দিনের মানুষের কাছে? আজকের অলৌকিকত্বের অবিশ্বাসের যুগে, আজকের খণ্ডিত অপ্রাকৃতিক যুগে, এবং ইলেকট্রনিক ইন্দ্রজাল কম্পিউটার—যে কম্পিউটার মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির এক চরম উৎকষt—সেই কম্পিউটারের যুগে? এই ইলেট্রনিক কম্পিউটারকে বাহন করেই আমরা আল-কুরআনের রত্নভূষিত বাণীর এক অদৃষ্টপূর্ব প্রান্তে উপনীত হলাম মাত্র, যা আল্লাহ্‌র এই মহাগ্রন্থকে প্রতিষ্ঠিত করে সৃষ্টির এক চরম ও পরম অলৌকিকত্ব, একটা মহান মো'জেযা হিসেবে! অলৌকিকত্বের সহজ সংজ্ঞা হচ্ছে, "এমন একটা কাজ, যা মনুষ্য ক্ষমতার অতীত! প্রতিটি নাস্তিক, প্রতিটি অজ্ঞেয়বাদী, প্রতিটি খৃস্টান এবং সাম্যবাদীর সন্তুষ্টি সাধনে কিভাবে আমরা প্রমাণ করবো যে, আল্ কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী এবং এই বাণী অলৌকিকের চেয়েও অলৌকিক? প্রমাণ সহকারে, যথার্থ বিজ্ঞান দ্বারা বিশ্বাসযোগ্য ভাবে আমরা তাদেরকে বিশ্বাস করবো; বিশ্বাস করাবো অংকশাস্ত্র দ্বারা যে অংকশাস্ত্র কখনোই পক্ষপাতিত্ব করে না এবং যার আবেদন ও ভাব প্রকাশভঙ্গি সার্বজনীন!

আল্ কুরআনের এই বৈশিষ্ট্য, এই অলৌকিকত্ব আপনি দেখতে পারেন, অনুভব করতে পারেন, স্পর্শ করতে পারেন এবং প্রয়োজনবোধে পরীক্ষাও করতে পারেন। আপনি আমেরিকান হোন অথবা চাইনীজ, আপনি রাশিয়ান হোন অথবা আফ্রিকান কিম্বা এশিয়ান—আপনি যাই হোন না কেন এর বৈশিষ্ট্য বা অলৌকিকত্ব বোঝার জন্য কুরআনের ভাষা আপনার জানবার দরকার নেই বা আরবিতে আপনার দক্ষ হবারও কোন প্রয়োজন নেই; শুধু এটুকুই আপনার প্রয়োজন হবে যে, আপনি চক্ষুষ্মান এবং ১৯ (১০+৯) সংখ্যা পর্যন্ত আপনি গণনা করতে সক্ষম।

এই সর্বশেষ অলৌকিকত্ব বা মু'যিজা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হলে কুরআনিক প্রত্যাদেশের প্রারম্ভ থেকেই শুরু করতে হবে আমাদেরকে। আমরা জানি, আল্ কুরআনকে যে অবস্থায় দেখছি, সেই ক্রমবিন্যাসরূপে কুরআন নাযিল হয়নি।

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পূর্বেই তার প্রত্যক্ষ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্টভাবে ক্রমবিন্যাস করা হয়েছে এই কুরআন। কুরআনের সময়ানুক্রমিক বিন্যাস ছিল অন্য রকম। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লমের কাছে পরিপূর্ণ কুরআন নাযিল হয়েছিল তাঁর আশু প্রয়োজনে— জনসাধারণকে পূর্ব ধারণা প্রদান, তাৎক্ষণিক সংবাদ পরিবেশন অথবা ঘটনার ঔজ্জ্বল্য প্রকাশের মতো সময়ে অল্প অল্প করে একে একে। আমরা স্মরণ করতে পারি তার প্রথম প্রত্যাদেশের, ঘটনাটি! মক্কার তিন মাইল উত্তরে একটি পবর্তগুহায় তিনি ধ্যানমগ্ন! এটা ছিল পবিত্র রমজান মাসের ২৭ তারিখ। তাঁর বয়স তখন চল্লিশ বছর। প্রশান্ত পরিবেশে আল্লাহর ধ্যানের নিমিত্তে এই পবর্ত-গুহায় তিনি গিয়েছেন তাঁর অভ্যাস মত- কখনো একা, আবার কখনো বা তাঁর প্রিয়তমা পত্নী উম্মুল মু'মিনিন হযরত খাদিজাতুল কোবরা রাদিআল্লাহু আনহাকে সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু এই মহৎ ঘটনার দিন তিনি ছিলেন একা! সহসাই তাঁর দর্শনে পতিত হলো এক অলৌকিক দৃশ্য—যার মধ্য হতে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ দূত হযরত জিবরাঈল (আ) হযরত নবীজীর মাতৃভাষা আরবিতে উচ্চারণ করলেন, "পড়ুন!" প্রথম পরিদর্শনে জিবরাঈল (আ)-এর কাছ থেকে তিনি লাভ করলেন সূরা "আল আলাকের" নিম্নোক্ত প্রথম পাঁচটি আয়াত, কুরআনুল করীমের ৯৬ অধ্যায়ে এখন যা সন্নিবেশিত ঃ

প্রথম প্রত্যাদেশ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ○ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ○ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ○ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ○ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ○

পাঠ কর, তোমার প্রভু এবং প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক (জমাট বাঁধা ঘনীভূত রক্তপিণ্ড) থেকেঃ পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহা মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন— শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জান্‌তো না।

— সূরা আলাক ৯৬ : ১-৫

নকসা-১

আল্লাহ তাঁকে মনোনীত করেছিলেন তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে। কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ঐ মহা মুহূর্তটি ছিল না কোন জৌলুসে ভরা বা আনুষ্ঠানিকতাপূর্ণ। তিনি প্রস্তুতই ছিলেন না আকস্মিক আবেগের সেই প্রচণ্ড ধাক্কার জন্য। কিংর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় তিনি ছুটে গেলেন তাঁর প্রিয়তমা পত্নী উম্মুল মু'মেনিন হযরত খাদিজাতুল কোব্‌রার কাছে, আশ্বাসবাণী আর পৃষ্ঠপোষকতা লাভের দুর্বার আকাঙ্ক্ষায়।

প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে উঠার পর তিনি তাঁর মনের মধ্যে গেঁথে নিলেন সেই অমিয় মোহন বাণী! আরও পাবার, আরও জান্‌বার প্রবল বাসনা জাগরূক হলো তাঁর মনে! দীর্ঘ প্রতীক্ষা চলতে লাগল; এই মধ্যবর্তী সময়ে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন আল্লাহ্‌র কথা; বলতে আরম্ভ করলেন উচ্চ ও মহৎ জীবনের কথা।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পাগল হয়ে গেছেন অথবা তাঁকে জ্বিনে আছর করেছে — এই কথা রটিয়ে বেড়াতে লাগলো বাচালেরা। এ অভিযোগের জবাবে দ্বিতীযবার এলেন জিবরাঈল (আ)। তিনি প্রদান করে গেলেন আরও কিছু আয়াত কারীমা- পবিত্র কুরআনের ৬৮তম অধ্যায়ে সূরা আল-কলমে এখন যা সন্নিবেশিত। এই বিশেষ মুহূর্তে আমরা পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই পবিত্র এই দ্বিতীয় আয়াটির দিকে ঃ

مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ○

তোমরা প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ নও!

দ্বিতীয় প্রত্যাদেশ

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ○ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ○ وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ○ وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ○

নুন! শপথ কলমের এবং উহারা যা লিপিবদ্ধ করে, তার; তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ নও। তোমার জন্য অবশ্যই রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার,তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।

— সূরা কলম ৬৮ : ১-৪

নকসা -২

পবিত্র এই আয়াতসমূহে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ অপবাদকারীদের অভিযোগসমূহ প্রতিহত করেছেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে সুস্থ মনের ও বিজ্ঞ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কিন্তু মানুষের অভ্যাসই হচ্ছে সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, আর বিজ্ঞতাকে পাগলামী আখ্যা দেওয়া। তাঁর মহান পূর্বপুরুষ ইসা আলায়হিস- সালামও (যীশুখৃস্ট) তাঁর শত্রুদের কাছ থেকে রেহাই পাননি এই মিথ্যা অপবাদ হতে। যোহন লিখিত সুসমাচারের এই শ্লোকটি প্রণিধানযোগ্য ঃ "এবং তাদের মধ্যে অনেকেই বললো, এ ভূতগ্রস্ত ও পাগল; তার কথা কে শুনছে?" (যোহন -১০ : ২০)। এমনকি তাঁর প্রিয় সাথী কখনো কখনো ভাবতেন যে,যিশু (ইসা আলায়হিস-সালাম) দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা থেকে বঞ্চিত ঃ "এবং এ কথা শুনে তার আত্মীয়েরা তাকে ধরতে বের হলো, কেননা তারা বললো,সে হতজ্ঞান হয়েছে। আর অধ্যাপকেরা যিরুশালেম হতে এসেছিল, তারা বলল, একে বেলসবূবে পেয়েছে ভূতগণের অধিপতি দ্বারা এ ভূত ছাড়ায়। (মার্ক- ৩ : ২১-২২)

এ বিদ্বেষ এবং তাঁর অন্যান্য বিস্ময়কর কৃতিত্বপূর্ণ কাজ সত্ত্বেও আমাদেরকে বলা হয় "তাঁর ভাইয়েরাও তাঁকে বিশ্বাস করতো না" (যোহন ৭ ঃ ৫)। সৌভাগ্যের বিষয় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে ঠিক এমনটি অশুভ ইঙ্গিত করা হয়নি। তার প্রধান ও স্থায়ী ধর্মান্তরিত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন তাঁরাই, যাঁরা ছিলেন তাঁর নিকটতম প্রিয় পাত্র, যাঁরা তাঁকে জানতেন ও চিনতেন সবচেয়ে বেশি।

আমরা একমত যে,তাঁর কাছে দ্বিতীয় প্রত্যাদেশ ছিল একটি অভিযোগের জবাব। তার পর জিবরাঈল (আ) এলেন তৃতীয়বারের মতো যেখানে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দেওয়া হলো সূরা "আল মুজ্জাম্মিলের প্রথম কয়েকটি আয়াত, পবিত্র কুরআনের ৭৩ অধ্যায়ে যা সন্নিবেশিত হয়েছে ঃ

তৃতীয় প্রত্যাদেশ

يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۙ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۙ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۗ اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۝

হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রি জাগরণ কর কিছু অংশ ব্যতীত, অর্ধ রাত্রি কিম্বা তদপেক্ষা অল্প অথবা তদপেক্ষা বেশি। আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে। আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করছি গুরভার বাণী।

— সূরা মুজ্জাম্মিল ৭৩ : ১-৫

নকসা -৩

কিন্তু আমি এখানে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এই সূরার পঞ্চম আয়াত শরীফের দিকে যেখানে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইঙ্গিত করেছেন, "আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করছি গুরুভার বাণী ইন্না সানুলকী আলাইকা কাওলান সাকীলা।"

আল্লাহ্র বিনীত বান্দাহ্ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যা কিছু নাযিল হচ্ছিল, তার সবই ছিল সুন্দর, যথার্থ প্রয়োজনীয় এবং পরিকল্পনা ছিল তাঁর বার্তাবহের জন্যে তারই ইঙ্গিত এই "ইন্না সানুলকী আলায়কা কাওলান্ সাকীলা।"

চতুর্থ সাক্ষাতে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবীজীর কাছে নিয়ে এলেন সূরা আল মুদ্দাসির-এর অর্ধেকেরও বেশি আয়াত ১ থেকে ৩০ পর্যন্ত কুরআনুল করীমের ৭৪ অধ্যায়ে যা দীপ্যমান; عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝

আর এই ৩০ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করেই জিবরাঈল আলাইহিস সালাম থেমে গেলেন, আর এগুলেন না।

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۙ قُمْ فَاَنْذِرْ ۙ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۙ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۙ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۙ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۙ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝ . . . .

. . . . . . فَقَالَ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۗ سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ ۝ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سَقَرُ ۗ لَا تُبْقِيْ وَلَا تَذَرُ ۚ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ۚ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝

(১) হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! (২) ওঠ আর সতর্ক কর, (৩) এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, (৪) তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ, (৫)

পৌত্তলিকতা (শিরক) পরিহার করে চল, (৬) অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করো না, (৭) এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ কর। .... (২৪) এবং ঘোষণা করলো এটা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন কিছুই নয়, (২৫) এটা তো মানুষেরই কথা, (২৬) আমি তাকে নিক্ষেপ করবো সাকার-এ, (২৭) তুমি কী জান সাকার কী? (২৮) তা ওদেরকে জীবিতাবস্থায় রাখবে না এবং মৃত অবস্থায়ও ছেড়ে দেবে না। (২৯) এটা তো গাত্র চর্ম দগ্ধ করবে। (৩০) এরও উপর রয়েছে উনিশ।

— সূরা মুদ্দাস্‌সির ৭৪ : ১-৭ ও ২৪-৩০

নক্‌সা ৪

এখানে একটি বৈঠকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করা হলো বেশ বড় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াতে করীমা। বলা যেতে পারে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সুবিন্যস্ত করা হলো; প্রথম প্রত্যাদেশের ৫টি আয়াত থেকে এখন উন্নীত করা হলো ত্রিশ আয়াত পর্যন্ত। যদি প্রত্যাদেশ ঐ ত্রিশটি আয়াতের পর আরও ২৬টি আয়াত নাযিল করা হতো তা হলে সম্পন্ন হতে পারতো সূরাটি। কিন্তু জিবরাঈল (আ) থেমে গেলেন ৭৪ নম্বর সূরার ত্রিশ নম্বর আয়াত শরীফ পাঠ করেই।

অধ্যায় চার

সাহিত্য বিশারদবৃন্দের সত্যতা প্রতিপাদন

এক নজরে ত্রিশ নম্বর আয়াটির প্রসঙ্গ প্রমাণ করবে যে, এই ত্রিশ নম্বর আয়াত শরীফও একটি জবাব। আরও একটি অভিযোগের জবাব এটি। অবিশ্বাসীরা প্রথমে হাতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অভিযুক্ত করেছিল উন্মাদ বলে। জনগণকে এখন ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে তাঁর আহবানে সাড়া দিতে দেখে তাদের কিছু কিছু আত্মীয়-পরিজনকে তাঁর দ্বীনের দাওয়াত কবুল করতে দেখে এবং তার দীনে দীক্ষিত কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে সম্মানিত সম্প্রদায়ভুক্ত দেখে, তাদের অভিযোগের ধরনটা পাল্টে, উন্মাদের পরিবর্তে আখ্যা প্রদান করলো 'যাদুকর' বলে। তারা অভিযোগ উত্থাপন করলো যে কুরআনের আয়াতসমূহ সুন্দর সুললিতভাবে আবৃত্তি করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্মোহিত করে চলেছেন জনসাধারণকে।

এই অভিযোগের সম্মুখীন হবার আগে আমি উদ্ধৃত করতে চাই টমাস কার্লাইলের একটা প্রামাণিক বিবৃতি, পূর্বোল্লিখিত বক্তৃতায় যিনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমর্থনে বিধর্মী পৌত্তলিকদের অভিযোগসমূহ খণ্ডন করেছেন খুবই সুন্দরভাবে প্রতারক এবং যাদুকর ? না, না, চিন্তার এক বিরাট অগ্নিকুণ্ডে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত এই বিরাট জ্বলন্ত হৃদয় যাদুকর হতে পারে না। চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় জীবন যাপনে অভ্যস্ত ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মক্কার পৌত্তলিকেরা সেই ঊর্ধ্বলোকের পথ নির্দেশ হৃদয়ঙ্গম অক্ষম ছিল বলেই,তাদের নর-নারীর উপর এর আশ্চর্য কার্যকরী প্রভাবের ব্যাখ্যা প্রদান করেছিল 'ইন্দ্রজাল' বা 'জাদু' বলে। কারণ তারা ছিল তাদের যুগ, পারিপার্শ্বিকতা এবং কালের উৎপন্ন ফসল।

তাদের প্রসঙ্গে ৪ নম্বর নক্সায় উল্লেখিত আয়াতসমূহ পুংখানুপুংখরূপে বিশ্লেষণ করে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, আল কুরআনের সূরা 'আল মুদ্দাচ্ছিরে' এটা তো যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়...উদ্ধৃত করে তাদের এই অবিশ্বাস্য অভিযোগের মীমাংসা

করে দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই। কিন্তু ৭৪ নম্বর সূরায় (আল মুদ্দাচ্ছির) ২৫ নম্বর আয়াতে উল্লিখিত অভিযোগটির বড় মারাত্মক, এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের সেই অবিশ্বাসীদের অসুস্থতা আজকের অকটও পরহিতপরায়ণ অমুসলিম বন্ধুদের মনে এখনো প্রবহমান। এমনকি টমাস কার্লাইল নিজেও মুক্ত ছিলেন না এই পক্ষপাতিত্ব থেকে। সেই অপরিবর্তিত অসুস্থতা বা নৈতিক অবক্ষয়ই তাদেরকে প্ররোচিত করেছে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আল কুরআনের গ্রন্থস্বত্ব আরোপ করতে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাবী করেন, আল কুরআনের বাণীসমূহ তাঁর কাছে দেয়া হয়েছে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। কিন্তু প্রতিপক্ষের ভাষ্য ঃ

إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۝

এটা তো মানুষেরই কথা। — কুরআন ৭৪ : ২৫

অন্য কথায়, অবিশ্বাসীদের বক্তব্য যে, মুহাম্মদ (সা) নিজেই রচনা করেছেন এই কুরআন। নিজেরই বাণী তিনি প্রচার করছেন আল্লাহর বাণী বলে ঃ তিনিই রচনা করেছেন এই মহাগ্রন্থ, তিনিই উদ্ভাবন করেছেন; জাল করেছেন এটি। হয়তো বা তাদের ধারণা তিনি এই মহাগ্রন্থ আল কুরআন কপি করেছেন ইহুদী ও খ্রিস্টানদের গ্রন্থ থেকে।

ইসলামের অমুসলিম সমালোচকদের সপ্রশংস সমর্থনসূচক কিছু বাণীর আমি উদ্ধৃতি দিতে চাই, যারা জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারে, এই ভ্রমে পতিত হয়েছেন যে, মুহাম্মদ (সা) রচনা করেছেন এই কুরআন ঃ

১. সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক গীবন তাঁর "ডিক্লাইন এ্যান্ড ফল্ অব্ দি রোমান এম্প্যায়ার" গ্রন্থে ইসলাম ও কুরআন সম্বন্ধে অভিমত ব্যক্ত করেছেন ঃ "মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ধর্মমত সম্পূর্ণভাবে সন্দেহমুক্ত এবং কুরআন হচ্ছে, আল্লাহ্র একত্ববাদের একটা গৌরবময় প্রমাণ । এবং তথাপি এই মহৎ মানুষটি মৃত্যুবরণ করেছেন একজন অজ্ঞেয়বাদী হিসেবে।

২. গত শতাব্দির এক বিশিষ্টি চিন্তাবিদ টমাস কার্লাইল তাঁর 'হিরো এ্যান্ড হিরো ওয়ারশীপ' গ্রন্থের "দি হিরো এ্যাজ্ প্রফেট" এই বিশিষ্ট শিরোনামে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী সম্বন্ধে আবেগ বিজড়িত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন ঃ এই মানুষটির সারগর্ভ বাণী সরাসরি উৎসারিত হয়েছে প্রকৃতির আপন

অন্তর্লোক থেকে। মানুষ তা শুনে এবং তাকে শুনতেই হয়,-এর যেন কোন অন্যথা নেই, তুলনামূলকভাবে সমস্ত অন্যথাই এখানে হাওয়া। অন্য কথায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মত মানুষ যে বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন, সেখানে সমমত অন্যথাই উষ্ণ বাতাস, নিরর্থক! এই মহৎ ব্যক্তিটিও মৃত্যুবরণ করেছেন একজন এ্যাঙ্গলিক্যান খ্রিস্টান হিসেবে।

৩. একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজক রেভারেন্ড আর বস্ওয়ার্থ স্মীথ তাঁর 'মুহাম্মেড্ এ্যান্ড মুহামেডানিজম" গ্রন্থে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আল্ কুরআন সম্বন্ধে তাৎপর্যপূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। "স্বয়ং নিরক্ষর কদাচিৎ পড়তে বা লিখতে সক্ষম ঃ সেই তিনিই একটি গ্রন্থের গ্রন্থকার—-যে গ্রন্থ কবিতা, আইন সংহিতা, উপাসনা পুস্তক এবং একটি বাইবেল-একের মধ্যে সব! সমস্ত মানব জাতির এক-ষষ্ঠাংশ দ্বারা আজ অবধি সম্মানিত, এটাই একটা অলৌকিকত্ব-অলৌকিকত্ব পদ্ধতির পবিত্রতায়,অলৌকিকত্ব বিজ্ঞতার মাপকাঠিতে, অলৌকিকত্ব সত্যের প্রতিষ্ঠিত নীতিতে। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাকেই দাবী করেছেন তাঁর একটি মিরাকল্ বা মো'যেজা হিসাবে, অভিহিত করেছেন তাঁর স্থায়ী একটি মো'যেজা রূপে; এবং সত্যি সত্যিই এটা একটা মো'যেজাই বটে! এবং তবুও বস্ওয়ার্থ মৃত্যুবরণ করেছেন একজন ত্রিত্ববাদী রূপে।

৪. ফ্রেন্স ঐতিহাসিক লা' মার্টিন তার "হিসট্রি অব দি টার্কস" এ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এভাবে ঃ দার্শনিক -বাগ্মী, ধর্ম প্রচারক, আইন প্রবর্তক, যোদ্ধা, মতাদর্শে বিজয়ী, প্রতিমাবিহীন ধর্মীয় পদ্ধতির যুক্তিবাদী ধর্মবিশ্বাসের পুনঃস্থাপক, বিশটি পার্থিব সাম্রাজ্যের ও একটি আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নামই হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। মানুষের মহত্তকে মাপা যায় এমন কোন নিক্তির ভিত্তিতে আমরা প্রশ্ন করতে পারি, "তার মত আরও কোন মহৎ ব্যক্তি আছেন কি?" লা মার্টিন তাঁর নিজের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন প্রশ্নটার অনুসিদ্ধান্ত দিয়েই কোন মানুষই তাঁর মত মহৎ নয়। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রকৃতপক্ষেই ছিলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি। এবং সম্ভ্রান্ত এই ফরীশা মৃত্যুবরণ করেন ইসলাম কবুল না করেই।

৫. যুক্তরাষ্ট্রের মনো সমীক্ষক জুল্স্ মেজারম্যান ১৫ জুলাই, ১৯৭৪ এর "টাইম" ম্যাগাজিনের একটি বিশেষ পাতায় "নেতারা কে কোথায়?" এই

শিরোনামে ইতিহাসের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিশ্লেষণ শেষে তাঁর গবেষণার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এই বলে যে "মুহাম্মদ (সা) বোধ করি সর্বকালের নেতা!" অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় একজন ইহুদী হয়েও তিনি তাঁর নিজের নবী মূসা আলাই-হিস-সালামকে কে দিয়েছেন দ্বিতীয় স্থান। তার বস্তুগত নীতিতে যিশু ও বুদ্ধ ও উচ্চতর শ্রেণীভুক্ত।

৬. মাইকেল এইচ হার্ট নামে একজন আমেরিকান জ্যোতির্বিদ, ঐতিহাসিক ও গণীতজ্ঞ "দী হানড্রেড" বা দী হানড্রেড বা দী প্রেক্টে হানডেড্র ইন হিস্ট্রি " নামে ৫৭২ পৃষ্ঠার একটি বই প্রকাশ করেছেন। আদম থেকে আজ পর্যন্ত ইতিহাসের সমস্ত নর (এবং নারীর) একটি সমীক্ষা শেষে ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে ১০০ জনকে নির্বাচন করেছেন তিনি। তাঁর এই নির্বাচনে ১০০ জনের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে রেখেছেন সবার উপরে। তাঁর এই তালিকটির আশ্চর্য দিক হচ্ছে এই যে, তিনি তাঁর নিজের 'ত্রাণকর্তা প্রভু যিশুকে দিয়েছেন তৃতীয় স্থান।

এমনিভাবে আমরা আরও অনেক অমুসলিম প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব যেমন জর্জ বার্নার্ড শ'জন ড্যাভেনপোর্ট, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতির উল্লেখ করতে পারি, যাঁরা আল্লাহ্‌র মহান বার্তাবাহক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এই বলে "হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন অসংখ্যের মধ্যে একজন", ইতিহাসের তিনি ছিলেন একজন সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব", "ধর্মপরায়ণ সমস্ত ব্যক্তিত্বের মধ্যে সবচেয়ে কৃতকার্য ছিলেন তিনিই" মনে হয়, তাঁর মত আর একজনও হবে না অনন্তকালেও! এসব এবং এর থেকে আরও অনেক বেশি সত্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেলায়! কিন্তু মুসলমানদের নিকট এসব সপ্রশংস সমর্থনসূচক উপহারবাণী একটা সমস্যাই বটে। কারণ এতদ্‌সত্ত্বেও এসব ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-কে অনুসরণ করছেন না কেন? আর কেনই তাঁরা গ্রহণ করছেন না ইসলাম?

আমার ধারণা, এসব অমুসলিমরা ছিলেন কপটাচারী; কিন্তু তাদের ব্যাপারে বোধ করি ভুল বললাম আমি! অতি সম্প্রতিক কুরআনিক আবিষ্কারের নিরিখে এইসব মহৎ ব্যক্তিদের প্রতি আমার ধারণা পাল্টেছি। উপরোক্ত মহৎ ব্যক্তিরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে তাঁদের পয়গম্বর ও পথ প্রদর্শকদের উপরে স্থান দেওয়া সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না এই বলে তাঁদের মনের গভীরে

এই বিশ্বাস ছিল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামই ছিলেন ইসলামের স্রষ্টা এবং তিনিই রচনা করেছেন আল্ কুরআন। উপরোক্ত লেখকবৃন্দের অনেকেই স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে এটাই বলেছেন আবার, কেউ বা চতুরতার সাথে এই ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। কিন্তু মোটামুটিভাবে প্রত্যেকেরই বিশ্বাস ছিল যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাফল্যের মূল কারণটাই ছিলো তাঁর নিজের অসাধারণ মানবিক প্রতিজ্ঞা!

প্রশংসাসূচক এই তালিকায় মাইকেল হার্টের অবস্থা সর্বশেষে। ধর্মনিরপেক্ষ এবং ধর্মপরায়ণ এই উভয় ক্ষেত্রে ইতিহাসে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব এই বলে তিনি চেষ্টা করেছেন তাঁর প্রবন্ধের উপসংহারে সত্যতা প্রতিপাদন করতে। এইটা করবার সময় তাঁর পুস্তকের ৩৯ পৃষ্ঠায় তিনি স্পষ্ট করে তার উল্লেখ করেছেন, তাতে অবশ্যই প্রষন্ন রয়েছে, তাঁর ইসলাম গ্রহণ না করার কারণটি ঃ অধিকন্তু তিনিই হচ্ছেন মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনের রচয়িতা; মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর পরিজ্ঞানের নির্দিষ্ট একটা সংকলন যা আল্লাহর কাছ থেকে সরাসরি তার কাছে নাযিল হয়েছিল বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।" তাঁর বক্তব্য 'তিনিই.......রচয়িতা' কার্লাইলের ভাষ্য ঐ মানুষটির সারগর্ভ বাণী " এবং বসওয়ার্থের বক্তব্য- "তবু তিনি একটি গ্রন্থের রচয়িতা (ক্রমিক নম্বর ২ ও ৩) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য! আল্ কুরআনের পবিত্র বাণীর অংশ বিশেষের প্রতি দৃষ্টি রেখে এবং পূর্বাপর সম্বন্ধ উপেক্ষা করেই তাঁরা উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সর্বজ্ঞ আল্লাহ অবিশ্বাসীদের এই অভিযোগ সম্পর্কে কুরআনুল করিমে তাদের মহাশক্তির ইঙ্গিত দিয়ে পূর্বাকেই উল্লেখ করেছেন ঃ তারপর সে বলে, এটা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ভিন্ন আর কিছুই নয়,এটা তো মানুষেরই কথা" (৭৪ : ২৪-২৫)! ইসলাম গ্রহণ না করার এটা তাদের একটা কৌশলই বটে!

অধ্যায় পাঁচ

"এর উপরে রয়েছে উনিশ"

অবিশ্বাসীদের এই মিথ্যা অভিযোগের জবাবে মহান গ্রন্থকার আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ভয়ংকর শাস্তির উল্লেখ করেছেন, "শীঘ্রই আমি তাকে নিক্ষেপ করবো 'সাকারে-জাহান্নামের মহা অগ্নিকুণ্ডে ....।"শাস্তির এই বাণী প্রদান করার পরই আল্লাহ্ পাক বাক্যটি সম্পূর্ণ করেছেন এই ভাবে ঃ

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ○

এরও উপরে রয়েছে উনিশ। — কুরআন ৭৪ : ৩০

অন্য কথায় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে কেউ যদি মিথ্যা অপবাদ দেয় এই বলে যে, তিনিই রচয়িতা আল্লাহ্‌র এই মহাগ্রন্থের, তবে সেই ব্যক্তি বাঁধা পড়বে ১৯ এর চক্রে; গুণতেই হবে তাকে উনিশের গুরুত্ব!

কিন্তু কী এই উনিশের গুরুত্ব

অতীতে বহু ব্যাখ্যাকার এই ১৯ সংখ্যাটির কী অর্থ হতে পারে তার সুন্দর সুন্দর অনেক অনুমিত ব্যাখ্যা প্রদনা করেছেন। কেউ বলেছেন, ১৯জন ফিরিশ্‌তার কথা বলা হয়েছে, যাদের তত্ত্বাবধানে থাকবে দোজখবাসী; কেউ বলেছেন মানুষের ১৯টি ইন্দ্রিয়বৃত্তির উল্লেখ এই ১৯ সংখ্যাটি; আবার কেউবা উল্লেখ করেছেন, ইসলামের মূল স্তম্ভসমূহ এবং নির্দেশশাবলি নিহিত রয়েছে এই ১৯-এর মাঝেই। (আবদুল্লাহ্ ইউসুফ আলী ও মাওলানা দারিয়াবাদীর তাফসীর দ্রষ্টব্য)। কিন্তু প্রত্যেক ব্যাখ্যাকারই তাদের অনুমানের ইতি টেনেছেন এই বলে যে, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ই সবিশেষ অবগত আছেন বিষয়টি সম্পর্কে। আমাদের কোন ব্যাখ্যাকারই তথ্য নির্ভর নয় তার উক্তির নিশ্চয়তা সম্পর্কে। কিন্তু আল্লাহ্ই সবিশেষ অবগত-এই উক্তি কেন? কারণ নবী

করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও দিয়ে যাননি ১৯-এর প্রকৃত সংখ্যা বা ব্যাখ্যা। তিনি যদি এর ব্যাখ্যা দিয়ে যেতেন তাহলে কোন অবকাশই থাকতো না এই সব অনুমানের।

প্রকৃতপক্ষে ১৯ একটি সাধারণ সংখ্যা। প্রত্যাদেশের পূর্বে আমাদের আলোচিত এই আয়াতের এই সংখ্যাটির কী অর্থ ছিল আবরদের নিকট? এর আর কোন অর্থই ছিল না দশ যোগ নয় (১০+৯) ছাড়া। ওহী নাযিলের পর থেকে আজ পর্যন্ত এই ১৪০০ বছরেও ১৯ সংখ্যাটির আর কোন অর্থ কি আমরা পেয়েছি? না, কিছুই না। ১৯ (১০+৯) উনিশই রয়ে গেছে।

পৃথিবীর বহু সংখ্যক ভাষায় তাদের নিজেদের সংখ্যাতাত্ত্বিক মূল্যায়ন ছাড়াও বিভিন্ন সংখ্যার রয়েছে বিভিন্ন অর্থ বা তাৎপর্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যেতে পারে '৭৮৬' সংখ্যাটি! দক্ষিণ আফ্রিকার (বা পৃথিবীর) যে কোন মুসলিম বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করুন। '৭৮৬'-এর অর্থ কী? নির্দ্বিধায় সে জবাব দেবে ঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

যার অর্থ হলো "দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে!" কিভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল, তার একটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা দরকার। সংক্ষেপে বলা যায় হিব্রু এবং আরবি বর্ণ মালায় ঐতিহ্যগত একটা বিশেষ সংখ্যাতাত্ত্বিক মূল্য রয়েছে। উল্লিখিত আয়াতের প্রত্যেকটি অক্ষরের সংখ্যাতাত্ত্বিক মূল্য যদি যোগ করা যায়, তাহলে তার যোগফল দাঁড়াবে "৭৮৬"। সুতরাং উপরোক্ত আয়াত শরীফের "৭৮৬" হচ্ছে একটি সংক্ষিপ্ত রূপ বা সাধারণ সংকেত।

এটা কি আশ্চর্যের বিষয় নয়, যে মুসলমানরা ১৪০০ বছর ধরে **"এর উপরে রয়েছে উনিশ"** আয়াতটি বার বার আবৃত্তি করা সত্ত্বেও-এর এমন কোন আনুষঙ্গিক অর্থ তাদের বোধগম্য হয়নি? আল্ কুরআনের এই উনিশ সংখ্যাটি রয়ে গেছে উনিশ-ই রয়ে গেছে অপরিবর্তিত-বিশুদ্ধ!

"হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই গ্রন্থের রচয়িতা" এই অভিযোগের জবাবে যেহেতু প্রদত্ত হয়েছে সংখ্যাটি, তাই গ্রন্থটির প্রকৃত গ্রন্থকার সর্বশক্তিমান আল্লাহ্-ই জানেন সংখ্যটির প্রকৃত অর্থ কি! কিন্তু যদি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামই হতেন আল্ কুরঅনের রচয়িতা, তাহলে কি বিষয়ের উপর তিনি কথা বলেছেন , তা অবশ্যই তাঁর জানা থাকতো।

আমরা জানি, আল্ কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী, যা নিসৃত হয়েছে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর জবানে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই দাবীই করেছেন, এবং আল্ কুরআনও দিচ্ছে সেই সাক্ষ্যই ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝ عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۝

তিনি (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) তার নিজের ইচ্ছামত মনগড়া কথা বলেন না; এটা তো ওহি যা নাযিল হয় তাঁর প্রতি; তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন ক্ষমতাশালী কর্তৃক। — কুরআন ৫৩ : ৩-৫

এবং তাঁকে পুনঃ পুনঃ বলা হয়েছে মানুষকে বলার জন্যে ঃ

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

বল, আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ; আমার নিকট প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র আল্লাহ্‌ই। — কুরআন– ১৮ : ১১০

মুসলমান হিসেবে আমরা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি এবং সত্য বলে মানি যে, আল্ কুরআনের একটি অক্ষরও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজে লেখেন নি বা বানান নি; তবুও সমালোচকদের খাতিরে আমরা মুহূর্তের জন্য হলেও যদি একমত হই (এবং তর্কের খাতিরে মনে করি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম রচনা করেছেন এই গ্রন্থ) তা হলেও অতিদ্রুত আমরা দেখাতে সমর্থ হবো যে, আল্ কুরআন সত্যিই সৃষ্টির এক চরম ও পরম বিস্ময় মু'যিজা এবং সম্পূর্ণরূপে তা মানুষের কল্পনার অতীত।

কালক্রমানুসারে যদি আমরা কুরআনিক প্রত্যাদেশ পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা করি তাহলে আমরা প্রত্যক্ষ করবো, জিবরাঈল (আ) তার চতুর্থ পরিদর্শনকালে সূরা আল মুদ্দাস্‌সিরের যে আয়াতসমূহ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম - এর নিকট পেশকর ছিলেন তার শেষ আয়াতটি ছিল এই ৩০ নম্বর আয়াতটি ০ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ 'এর উপরে রয়েছে উনিশ!'এইখানেই বিরতি টানেন

জিবরাঈল (আ) সূরাটির অবশিষ্ট ২৬টি আয়াত না দিয়েই, যাতে করে সম্পূর্ণ হতে পারতো সূরাটি; বরং প্রথম প্রত্যাদেশে প্রদত্ত ৯৬ নম্বর সূরাটির অবশিষ্টাংশ দেন পড়তে। ১৪টি আয়াত তাঁকে দেওয়া হলো সেখানে। প্রথম পরিদর্শনে প্রদত্ত হয়েছিল ৫টি আয়াত; ১৪টি আয়াত যুক্ত হলে এবারে। আয়াতের সংখ্যা তাহলে হলো কয়টি? উনিশটি। কি করে এটা সংঘটিত হলো যে, উপরোক্ত প্রত্যাদেশের উনিশ শব্দটি বলার পরই সম্পূর্ণ হলো উনিশ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা। "স্রেফ একটা ঘটনাচক্র " সম্ভবত এই জবাবই প্রদান করবে সন্দেহবাদীরা! 'ঘটনাচক্র' হতে পারে এটা আমরা অবশ্যই স্বীকার করি। কিন্তু প্রথম প্রত্যাদেশের ঐ নির্দিষ্ট ৫টি আয়াতের শব্দসংখ্যা যে সঠিক ১৯, তা আপনাদের জানা ছিল কি? অর্থাৎ ১৯×১ কি করে সংঘটিত হলো এটা? আবারও কি "ঘটনাচক্র"? ঐ ১৯টি শব্দের অক্ষরও কিন্তু ৭৬ যা' সম্পূর্ণভাবে ১৯-এর গুণীতক অর্থাৎ ১৯× ৪ = ৭৬ । এটাই বা সংঘটিত হলো কিভাবে? এই ৯৬টিও সূরা কী "ঘটনাচক্র"? কুরআনুল করীমের সর্বশেষ অধ্যায় বা সূরার পেছন থেকে যদি আমরা গণনা শুরু করি অর্থাৎ ১১৪ থেকে শুরু করে ১১৩, ১১২, ১১১ এমনি ভাবে এগুতে থাকি, তবে ৯৬ নম্বর সূরাতে আমরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করবো, পশ্চাৎ দিক থেকে এই ৯৬ নম্বর সূরাটি ১৯তম সূরা! কি করেএটা সংঘটিত হলো যে, ১৯ আয়াত বিশিষ্ট সূরাটি পশ্চাৎ দিক থেকেও ১৯-এর বন্ধনে আবদ্ধ? "ঘটনাচক্র" এই জবাবই হয়তো আসবে ফের।

একখানা গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য গ্রন্থকারকে অবশ্যই তা প্রথমেই সূত্রবদ্ধ করে নিতে হয় তার মস্তিষ্কে। দুই দশক ধরে তার পূর্ব উপাদানকে সাজিয়ে পুস্তাকা করে রূপ দেওয়ার জন্য কেউ-ই তার অসতর্ক রচনার উপর নির্ভর করে থাকতে পারে না। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি রচয়িতাই হতেন আল্ কুরআনের তাহলে অন্যের মতো তাকেও তাড়িত হতে হতো তাঁর পরিকল্পনাকে সূত্রবদ্ধ করে রাখতে। সুতরাং তাকেও হয়তো ভাবতে হতো ঃ "আমি তো রচনা করতে চলেছি একখানা বৃহদাকার গ্রন্থ। এই আরাধ্য কাজটি সম্পন্ন করতে আমার প্রয়োজন হবে জীবনের ২৩টা বছর। আর আমার অনুসারীদের সহজ নির্দেশনা ও পাঠের জন্যে গ্রন্থখানিতে প্রয়োজন হবে কয়েকটি অধ্যায়ের! এর পর আমরা মনে করতে পারি, তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন ১১৪ অধ্যায়ে গ্রন্থখানি সমাপ্ত করতে। ১১৩ নয়, ১১৫ নয়, কিন্তু ১১৪! " ১১৪ কেন? কারণ এটা ১৯-এর গুণীতক বলেই কি? .... আল্ কুরআনের সঠিক ১১৪টি অধ্যায় বা সূরার সন্নিবেশ সম্ভব হলো কি

করে? আমাদের ছিদ্রান্বেষী সমালোচকদের সেই একই জবাব “ঘটনাচক্র”। বিস্ময়কর এই বিষয়টি ব্যাখ্যায় তার অভিধানে কি আর কোন শব্দ নেই? সুস্পষ্টই বলতে হয়, “নেই”। মানুষের এটাই একটা ব্যাধি যে, যখনি কোন ঘটনার সন্তোষজনক কৈফিয়ত সে দিতে চায়, তখনি এমনি একটা শব্দ সে আবিষ্কার করে বসে, যা দিয়ে সমস্যাটাকে সমাধান দেবার নামে নিজেকেই সে দিয়ে যায় ধোঁকা। শব্দটি আড়ালে সে নিতে চায় আশ্রয়। একজন অবিশ্বাসী মিথ্যে অভিযোগ আনতে প্রস্তুত যে হযরত মুহাম্মদ স্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রচনা করেছেন এই গ্রন্থ, কিন্তু এই স্বীকৃতি দিতে সে রাজী নয় যে, ১৪০০ বছর আগে মরুভূমির এই নিরক্ষর মানুষটি কোন কাগজ-কলম ব্যতিরেকেই কী সুন্দর গাণিতিক বিন্যাস অবলম্বন করেছেন এই গ্রন্থখানি প্রণয়নে।

ইতিমধ্যেই আমরা ৫টি “ঘটনাচক্রে”র সম্মুখীন হয়েছি । যেহেতু কোন অবিশ্বাসীই স্বীকার করতে রাজী নয় যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই অসাধ্য সাধনে সাফল্য লাভ করতে পেরেছিলেন, সেহেতু তাদের সবাইকে হিসেব থেকে বাদ দেবার যথেষ্ট উদারতা দেখানো আমাদের প্রয়োজন এবং এই উদারতা আমরা প্রদর্শন করতে পারি। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে এই বিষয়টি সম্বন্ধে তবু আমরা একমত হতে পারি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষে কুরআন রচনা অসম্ভব। এই বিষয়টির উপরেই আমরা জোর দিতে চাই এইজন্যে যে, শত্রুপক্ষ অভিযোগ আনয়নে তৎপর কিন্তু সমর্থন করতে প্রস্তুত নয় এতটুকু।

সুহৃদ ও শত্রু সমভাবে একমত যে, প্রতিশ্রুতি পালনে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়। নবুয়ত প্রাপ্তির বহু পূর্বেই তাঁর পৌত্তলিক স্বদেশবাসী তাঁকে ভূষিত করেছিল অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় ও উৎকৃষ্ট উপাধি “আস্‌সাদিক আল্‌ ওয়াদ আল্‌ আমিন” সৎ, প্রতিজ্ঞাপরায়ণ ও সত্যবাদী হিসেবে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নামের এই মানুষটি যদি বলতেন-এর উপরে রয়েছে উনিশ-উনিশের গণনায় আবদ্ধ করা হবে তোমাকে, তোমার উপরে আরোপ করা হবে উনিশতাহলে অবশ্যই তিনি জানিয়ে যেতেন তার এই ভয় প্রদর্শনের ব্যাপারটি সম্বন্ধে। প্রতিজ্ঞা পূরণে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর হৃদয় কতখানি বৃহৎ এবং উদার ছিল তা আমাদের খতিয়ে দেখা দরকার।

আমরা ধরে নিতে পারি , হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়তো বা মনে মনে ভেবেছিলেন (?), আমার গ্রন্থখানি হবে একখানি অনুপম গ্রন্থ! এমন কোন গ্রন্থ কখনো লিখিত হয়নি পূর্বে, এবং হবে না ভবিষ্যতেও, গাণিতিক কাঠামোই হবে এর ভিত্তি! যাবতীয় বিরূপ হস্তক্ষেপ হতে রক্ষা করবার জন্য এই গ্রন্থখানিকে আমি প্রতিষ্ঠিত করবো জটিল গাণিতিক বুননে। একটি শব্দও কেউ সংযোজন করতে পারবে না এতে, বিনষ্ট করতে পারবে না এ গ্রন্থ অথবা নতুন কিছু সন্নিবেশ করতে পারবে না এর মধ্যে; আর ১৯ই হবে এই পদ্ধতির বুনিয়াদ।”

কিন্তু ১৯ কেন?এটা কি এই জন্য যে, কার্যকারিতায় এই সংখ্যাটি অতি সহজ ? না, মোটেই না; -বরং বড় বেশি কঠিন এই সংখ্যাটি! এর কোন বিভাজক নেই। অসম এই সংখ্যাটির সহ সংখ্যা ১৮-কে আপনি ২,৩,৬ ও ৯ দিয়ে ভাগ করতে পারেন; এবং এর আর একটি সহসংখ্যা ২০-কে আপনি ২,৪,৫ ও ১০দিয়ে ভাগ করে করতে পারেন; কিন্তু ১৯ অবিভাজ্য। অংকশাস্ত্রে এটা একটা মৌলিক সংখ্যা এবং এটা একটা অদ্বিতীয় অনুপম সংখ্যাও বটে; কারণ অংকশাস্ত্রের সবচেয়ে ছোট সংখ্যা ১ দিয়ে -এর শুরু। আর বড় সংখ্যা ৯-এ এর শেষ! গাণিতিক পদ্ধতির হয়তো বা এটা “আদি” এবং “অন্ত” সম্ভবত ঃ ১৯-এর নামতায় পারদর্শী ছিলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, অথচ বিশিষ্ট গণিতশাস্ত্রবিদ আইনস্টাইন নিজেও জানতেন না ১৯-এর নামতা। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কি পরিমাণ জানতেন এই ১৯-এর নামতা? ধরা যাক, নিশ্চয়ই অনন্ত পরিমাণ। আমরা গোঁ ধরে যদি বলতেই থাকি, যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামই আল্‌ কুরআনের রচয়িতা তা হলে চলার পথে অবশ্যই তা উদঘাটনে সক্ষম হবো আমরা।

অধ্যায় ছয়

গাণিতিক হিসাব এবং অনন্য শতাব্দী

স্বীয় গ্রন্থখানিকে অদ্বিতীয় করবার জন্যে হয়তো বা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবারও মনে মনে ভেবে থাকবেন,(নাউযুবিল্লা)"আমার গ্রন্থখানির প্রথম বাক্যটি অবশ্যই হতে হবে ১৯ অক্ষরের"। এ জগৎ সংসারে 'প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন' ব্যতিরেকে কিভাবে একজন শুরু করতে পারেন তার পুস্তকের সূচনার বাক্যটি? সুপ্রিয় পাঠক, একটি গ্রন্থ রচনার প্রারম্ভে আপনি এবং আমি যদি ঠিক এমনি একটা প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়ে পড়ি, তাহলে তো আমাদের মনে আবির্ভূত বাক্যসমূহকে নিশ্চয়ই আন্দায করে নিতে হবে আমাদেরকে। ...... আপনার চিন্তাধারা বা কল্পনাকে লিপিবদ্ধ করতে হবে আপনাকে এবং অক্ষরগুলোর করতে হবে গণনা। এ ছাড়া আর কোন পথই নেই। সহসা লব্ধ আমার চমৎকার ফন্দিগুলো একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা আমি দিতে পারি, আর আপনিও তা পারেন, যদি প্রচেষ্টা চালান এই পরীক্ষার! কিন্তু কোন কাজেই আসবে না। সম্ভবত আপনার জীবদ্দশায় ১৯ অক্ষরের একটি বাক্যের সাক্ষাৎ আপনি নাও পেতে পারেন আপনার পুস্তক রচনার শুরুতে। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদের গ্রন্থকার (?) এ ব্যাপারে লাভ করেছেন বিরাট সাফল্য; লক্ষ ভেদ করেছেন তিনি আমাদের ধারণা অনুযায়ী তিনি যে সত্যিকারভাবেই একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি তা ভুলে যাওয়া নিশ্চয়ই সমীচীন হবে না। তিনি শুরু করেছেন ঃ পরম করুণাময় দয়ালু দাতা আল্লাহ্‌র নামে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

গুণে দেখুন অক্ষরগুলো। ওগুলো যথাযথই উনিশ ১৯×১=১৯ (লক্ষ্য করুন ৫ নম্বর নক্সাটি)। অক্ষরগুলো গুণতে সহজতর করা হয়েছে আপনার জন্যে। সামনে এগুবার আগেই বিষয়টির যথার্থতা যাচাই করে নিন আপনি নিজেই ঃ
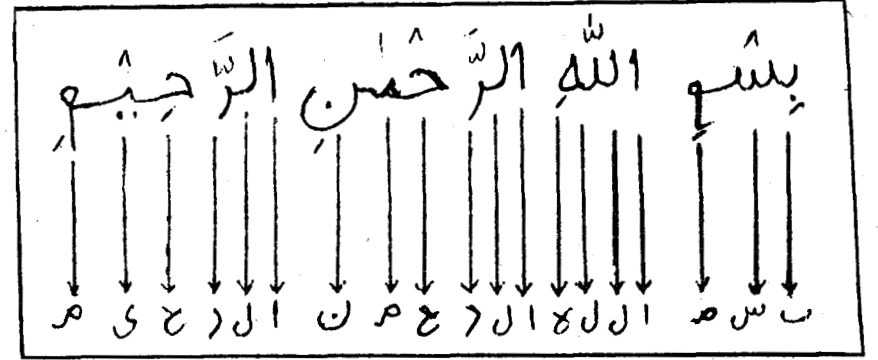
কিভাবে সংঘটিত হলো এটা? জড়বাদী অবিশ্বাসী বন্ধু হঠাৎই বলে উঠেন "ঘটনাচক্র"। পূর্ববর্তী ৫টি ঘটনাচক্র যেহেতু হিসেব থেকে আমরা ইতিমধ্যেই বাদ দিয়েছি, তাই আমাদের বন্ধুর সাথে আমরা একমত হতে পারি যে, এখন এই ঘটনাচক্র সংঘটিত হতে পারে এই প্রথমবার। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কি বলেননি, -"এরও উপরে রয়েছে উনিশ"? "উনিশ চাপিয়ে দেয়া হবে আপনার উপর, গুণতেই হবে আপনাকে উনিশ সংখ্যাটি! হাঁ বলেছিলাম তিনি; কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর (?) এই ভীতি প্রদর্শনের ব্যাপরটি সঠিক অর্থে ব্যবহার করেন নি, নিশ্চয়ই যুক্তি প্রদর্শন করেন অবিশ্বাসীরা।

ধরা যাক, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হয়তো আবারও মনে মনে বলেছিলেন, "উনিশ অক্ষরের এই প্রথম বাক্যটি অত্যন্ত সহজ ছিল আমার কাছে; এখন যা আমি করতে যাচ্ছি- তা হলো আমার এই প্রথম বাক্যটির প্রতিটি শব্দ আমার (নাউযুবিল্লাহ) গ্রন্থখানিতে যতবার পুনরাবৃত্ত হবে তা হবে উনিশের গুণীতক। আমাদের গ্রন্থকার (?) তাঁর এই বিস্ময়কর পরিকল্পনায়, যতটুকু কৃতকার্য হয়েছিলেন তার যথার্থতা প্রতিপাদনের জন্য পবিত্র কুরআনকে সুসংবদ্ধভাবে কম্পিউটারের সাহায্যে তথ্যাদি নিরূপণপূর্বক নিশ্চিত হতে পারি আমরা প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি অক্ষর গণনার জন্য বারবার পবিত্র কুরআনের আদ্যান্ত পাতা উল্টানোর সময় বা ধৈর্য আমাদের নেই। তাহলে আসুন, কম্পিউটারকৃত পূর্ণাঙ্গ তথ্যের সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে তৎপর হই আমরা । প্রথমে শব্দ اسم অর্থাৎ 'নাম' কুরআনুল করীমে এসেছে মাত্র ১৯ বার (১৯×১= ১৯)। কেমন করে সংঘটিত হলো এটা? বিষন্ন স্বরে অবিশ্বাসীর উচ্চারণ "কোইনসিডেন্স" বা ঘটনার যুগপৎ সংঘটন। আমাদের "সমকালীন ঘটনার" নতুন তালিকায় এটা দ্বিতীয়! আপনাদের কো-ইনসিডেন্স "সমকালীন ঘটনার' তালিকায় প্রথমবার হওয়াটাই স্বাভাবিক, কিন্তু দ্বিতীয়বার নিশ্চয়ই অসম্ভব। যাই হোক কম্পিউটাকে আমরা প্রশ্ন করতে পারি, اللّٰه। শব্দটি

কুরআন মজীদে এসেছে কতবার? চোখের পলকে জবাব আসে ঃ ২৬৯৮ বার। আপনার ক্যালকুলেটারটি বের করুন এবং সংখ্যাটিকে ভাগ করুন ১৯ দিয়ে, মুহূর্তেই জবাব ঃ ১৯×১৪২ = ২৬৯৮। কি করে সম্ভব হলো এটা? "ঘটনার যুগপৎ সংঘটন কী আবারৎ ? হ্যাঁ, আপনারা জানেন না "অসম্ভব"এর শুরুই তো এটা ! এবারে দেখা যাক পরের শব্দ الرَّحمن। অর্থাৎ "পরম করুণাময়" কতবার ? জবাব হলো, ৫৭ (১৯×৩) বার। এটাই বা সম্ভব কিভাবে? হ্যাঁ আবারও! নিশ্চয়ই এটা একটা অলৌকিত্ব বা মোজেযা। পরের শব্দ الرَّحِيم। বা পরম দয়ালু কতবার? জবাব, ১১৪ (১৯×৬ = ১১৪) বার। এটাইবা সম্ভব কীভাবে। কো-ই-ন-সি-ডে-ন্স- ঘটনার যুগপৎ সংঘটন, সেই বিরক্তিকর, কিন্তু স্বল্প শ্রুতিযোগ্য জবাব এটি। ঘটনাসমূহের সম্ভাবনা অলৌকিক থেকেও অলৌকিক কোন ব্যক্তি এমন কি, হযরত মুহাম্মদ (সা) যা করতে পারেন তার থেকেও অনেক বেশি।

শেষ শব্দ الرَّحِيم। "পরম করুণাময়" উদ্ধৃত হয়েছে ১১৪ বার। কুরআনুল করীমে যতটি সূরা আছে, ঠিক তত বার, যেন الرَّحِيم। বা পরম করুণাময় শব্দটি সুষ্ঠভাবে বিভাজ্য হতে পারে, প্রতিটি সূরার সাথে। কোন পাণ্ডিত্য ছাড়া, কোন কাগজ ও কলম ছাড়া, কোন কম্পিউটার এবং ক্যালকুলেটর ছাড়া হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পক্ষে এসব সম্পন্ন করা যে কখনোই সম্ভব ছিল না, তা অনুভব করার জন্য কোন প্রতিভাধরের প্রয়োজন আজও আমরা দেখি না।

কিন্তু আল্লাহর নিকট থেকে নাযিলকৃত একটি মহাগ্রন্থের যথার্থতা প্রতিপাদনের জন্য অবশ্যই কিছু প্রামাণিকতা থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেকটি দলিলের-ই রয়েছে তার নিজস্ব গুরুত্বপূর্ণ সীল। সুপ্রীম কোর্টের সমন বা 'রীট'এর আছে সুস্পষ্ট সীল! পাসপোর্টের সীলটি খোদিত -যাতে করে অন্য ছবি বসিয়ে কেউ তা জাল করতে না পারে। আল্লাহ্‌র বাণী বলে স্বয়ং স্বীকৃত "আল কুরআনেও ঠিক তেমনি একটা গুরুত্বপূর্ণ সীল থাকা স্বাভাবিক, আর তা আছেও। সেই অনুমোদিত "ফরামূলা" বা সাংকেতিক চিহ্ন হলো ঃ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ০

"পরম করুণাময় অনন্ত দয়ালু দাতা আল্লাহ্‌র নামে"

চমৎকার এই প্রার্থনাসূচক আয়াতটি, আপনি ঠিক উপরে যেমনটি আছে, তেমনি করে সোজাসুজি লিখতে পারেন অথবা নকসা আকারে যেমনটি দেখা যাচ্ছে অপর পৃষ্ঠায় যেভাবেই আপনি লিখুন না কেন, এই সংকেত সূত্রটিই একটি সীল। এটা নির্মিত হতে পারে কাঠ দিয়ে, রাবার দিয়ে কিংবা ধাতু দিয়ে। ১১৪ টি সূরার জন্য ১১৪ টি সীল থাকাই বাঞ্ছনীয়- আল্ কুরআনের প্রত্যেকটি সূরার জন্যে ১টি করে। আবরীতে অজ্ঞ একজন লোকও চিনতে সক্ষম আল্ কুরআনের প্রত্যেকটি সূরার প্রথমে লিখিত এই সীল বা সংকেত সূত্রটি। আশ্চর্যের বিষয়, এই সংকেত সূত্র বা সীলটি কিন্তু কুরআন মজীদের ৯ নম্বর সূরায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সমস্যার উদ্ভব এখানেই। আল্ কুরআনে সূরার সংখ্যা ১১৪, কিন্তু সীল মাত্র ১১৩টি এবং ১১৩ বিভাজ্য নয় ১৯ দিয়ে;তথাপি মহান গ্রন্থকার তাঁর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন : **"১৯-এর বন্ধনে আবদ্ধ করা হবে তোমাকে।"**

১১৪ সীল

১১৪ সূরা

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

পরম করুণাময় অনন্ত দয়ালু দাতা আল্লাহ্‌র নামে

কিন্তু ৯ নম্বর সূরাটির বেলায়?

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ
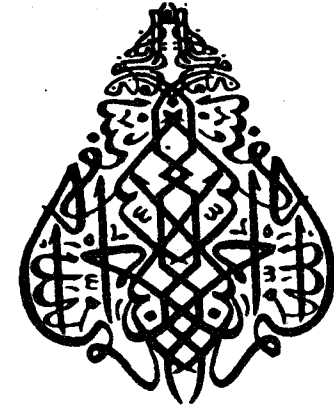
নক্‌সা—৮

লক্ষ্য করুন, ব্যতিক্রম মাত্র একটিই; কোন "বিসমিল্লাহ্" শরীফ নেই সূরা "আত্ তাওবার' প্রারম্ভে। সমস্যার উদ্ভব এখানেই। ১১৪টি সূরা, কিন্তু বিসমিল্লাহ্' ১১৩টা; এবং ১১৩ বিভাজ্য নয় ১৯ দিয়ে। এখন প্রশ্ন হলো ঃ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ "এরও উপরে রয়েছে উনিশ" এর তাৎপর্য কী?

একটা অধিনিয়মের সৌন্দর্য বা চারুকলা নিহিত রয়েছে, অবাধে কাটিয়ে উঠা সমস্যাদির মাঝেই- সেটা দাড়াবাজী, নভোশ্চারণ, জলক্রীড়া বা গণিত বিদ্যা-যাই হোক না কেন? একটা সমস্যা সৃষ্টি করুন, এবং সমাধান করুন সেই সমস্যার। কিন্তু ৯ নম্বর সূরার শুরুতে কী করে উদ্ভব হলো এই সমস্যা? আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে যে, ৯ নম্বর সূরাটি আত্ তাওবা' নামেই পরিচিত যার শাব্দিক হলো ঃ অনুশোচনা বা পরিতাপ। মুসলমানদের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে আবদ্ধ চুক্তিটি যারা ভঙ্গ করেছিল, সেই মুশরিকদের জন্য এটা একটা চরম পত্র। সূরাটির তৃতীয় স্তবকের শেষাংশের প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ আল্লাহ্ পাক বলছেন, وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ "এবং কাফিরদের সংবাদ দিন মর্মন্তুদ শাস্তির।"

বিজ্ঞজন যুক্তি প্রদর্শন করেন, মহান প্রভু যখন এমনিভাবে ভয়াবহ অমঙ্গলের ইঙ্গিত দেন, তখন অনুকম্পা ও কৃপাপূর্ণ প্রার্থনাসূচক বাণী দিয়ে স্তবকটির শুরু হওয়া বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। মানব জীবনের এটাই একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যে এক তরফাভাবে কেউ যখন তার চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে,তখন অত্যাচারিত পক্ষ নিশ্চয়ই কোন রুচিকর শব্দ প্রয়োগ করে প্রদান করেন না তাঁর সতর্কীকরণ 'চরমপত্রটি'। কেউ এমনিভাবে শুরু করেন না, আমি খুবই সহৃদয়, উদার ও সজ্জন ব্যক্তি কিন্তু আমার টাকার থলিটি ফিরিয়ে না দিলে তোমার ঘাড়টি দেব মট্‌কিয়ে। নিশ্চয়ই এটা ন্যায়সঙ্গত ও অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত একটা ব্যাখ্যা। কিন্তু আমাদের সমস্যার সমাধান এটা করে না। ১১৪টি সূরা, আর বিস্‌মিল্লাহ ১১৩ টা। সংক্ষেপে বলতে গেলে একটা সীল আমাদের কম। কিন্তু এই তথ্য সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না আমাদের মহান গ্রন্থকার আল্লাহ্ জাল্লাহ্ শানুহু (এবং নন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)! মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করুন, তাঁর স্বসৃষ্ট সমস্যার কী চমৎকারভাবে সমাধান করেছেন তিনি। সূক্ষ্ম একজন গাণিতিকের মত সমস্যার সৃষ্টি করে তা সমাধানের নৈপুণ্যের মাঝে তিনি তাঁর প্রতি জাগিয়ে তুলেছেন আমাদের সশ্রদ্ধ সম্ভ্রম।

অধ্যায় সাত

গ্রন্থকার কোন মানুষ নয়

২৭ নম্বর সূরা "আন্ নমল"-এর ২৯ নম্বর আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন মহান আল্লাহ্ কী সূক্ষ্মভাবে এখানে অন্তর্ভুক্ত করেছেন বিজ্ঞ বাদশাহ সুলায়মান এবং শেষবার রানী বিল্‌কীসের কাহিনী। হযরত সুলায়মান কেবল মাত্র দুনিয়ার একজন বিজ্ঞ বাদশাহই ছিলেন না, সৎপথ নিদের্শক আল্লাহ্‌র একজন নবীও ছিলেন তিনি। তাঁরই প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সুশিক্ষিত প্রজাবৃন্দের শাসক ছিলেন এক হিতৈষী রানী । কিন্তু তিনিও তাঁর প্রজাবৃন্দ ছিলেন অগ্নি উপাসনায় বিশ্বাসী মুশরিক। বাদশাহ সুলায়মান একখানা পত্র লিখলেন রানী বিল্‌কিসের নিকট-তাঁর এবং তাঁর প্রজাবৃন্দের আধ্যাত্মিক মঙ্গলকামনা করে। দারুণ শ্রদ্ধায় পত্রখানি গ্রহণ করলেন রানী বিলকিস। কিন্তু আল্লাহর মনোনীত ধর্ম দীন ইসলাম গ্রহণের জন্য সুলায়মানের এই দাওয়াত কবুলের ব্যাপারে তাঁর প্রজাবৃন্দের ঐচ্ছিক অনুমোদন তিনি অর্জন করবেন কীভাবে? জাতীয় মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি তো পুরা মাত্রায়-ই ওয়াকিবহাল। প্রজা সাধারণের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যদি সুলায়মানের এই দাওয়াত তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তাদের কাছ থেকে 'হা' করানোর সকল প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হবে তার। তাই অমাত্যবর্গকে ডেকে বিষয়টি তাদের অবহিত করার জন্য তাদের উদ্দেশ্যে তিনি প্রদান করলেন একটি অভিভাষণ ঃ আল্ কুরআনে ঘটনাটি বিধৃত হয়েছে এভাবে ঃ

قَالَتْ يَاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْٓ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ○ اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ
وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ○

২৯. সেই নারী (রানী বিল্‌কীস্) বললো, হে পারিষদবর্গ আমাকে একটি সম্মানিত পত্র দেওয়া হয়েছে।

৩০.এটি সুলায়মানের নিকট হতে এবং তা এই ঃ দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

৩১. অহমিকাবশে আমাকে অমান্য করো না এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট উপস্থিত হও। — কুরআন ২৭ : ২৯ থেকে ৩১

অত্যন্ত কুশলতার সাথে আমাদের মহাবিজ্ঞ গ্রন্থকার সূরাটির মাঝখানে "বিসমিল্লাহ্" শরীফ অন্তর্ভুক্ত করে ১১৪টি সীল পূরণের কাজটি করেছেন সুসম্পন্ন; একই সাথে মাত্র ৩টি আয়াতে তিনি চরিতার্থ করেছেন তাঁর আরও বহুবিধ উদ্দেশ্য।

১. আল্ কুরআনের ১১৪টি সূরার প্রত্যেকটির হিসাব বিভাজনের জন্য তিনি প্রবর্তিত করেছেন তাঁর ১১৪ টি সীল।

২.পৃথিবীর রাজন্যবর্গকে অহংকারী ও উদ্ধত না হবার জন্য পুনরায় শিক্ষা প্রদান করেছেন তিনি এখানে। এমন কি শাসক হিসেবে পারস্পরিক আলোচনা, ভিত্তিতে তাদের কার্যাবলী সমাধা করার উপর আরোপ করেছেন গুরুত্ব। আর তাদের অধীনস্থদেরকে মানসিকভাবে উপযোগী করে তোলার তাকিদ প্রদান করেছেন এই দৈববাণী গ্রহণ করার জন্যে।

৩. লিখবার সময় এই কথা মনে করেই তোমরা লিখবে যে তোমার সম্মুখেই রয়েছে তোমার প্রভু পরম করুণাময় দয়ালু দাতা আল্লাহ্। যিনি তোমার সকল পোপন চিন্তা ও উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় এর চিরন্তন সাক্ষী।

৪. এমন কি দুনিয়ার একজন বাদশাহ্‌র তরফ থেকে আর এক বাদশাহ্‌র কাছে লিখ্‌বার সময় -যত শক্তিশালী লোক-ই হোন না কেন তিনি, এবং তাঁর বাণী যত পবিত্রই হোক না কেন তার কাজটি সম্পন্ন করতে হবে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে যেন আল্লাহ্‌র দৃষ্টিসীমার মধ্যেই সম্পন্ন হচ্ছে সেই কাজ।

৫. এবং আমাদের মহাগ্রন্থকার এগুলো করবার সময় আরও সম্পাদন করেছেন ঃ

(ক) আল্ কুরআনের ১৯টি শব্দ اِسْمِ "ইস্‌ম" বা নাম।

(খ) আল্ কুরআনের ২৬৯৮ টি শব্দ اَللّٰهُ "আল্লাহ্"

(গ) আল্ কুরআনের ৫৭টি শব্দ اَلرَّحْمٰنُ "আররাহ্‌মান"

(ঘ) আল্ কুরআনের ১১৪টি শব্দ اَلرَّحِيْمِ "আর রাহীম"

সূরাটির (আন্ নমল) মাঝখানে ৩০ নম্বর আয়াত শরীফে ঐ সীলটি ছাড়া উপরোক্ত ৪টি শব্দ সংখ্যার প্রত্যেকটিতে ১টি করে শব্দ কম হতো; আরও কম হতো ঐ নিরুদ্দিষ্ট ৯ নম্বর সূরার সম্পূর্ণ সীলটি।

এখন পর্যন্ত আমরা যা দেখছি তাতে কী ধারণা করা যায়, যে ১৪০০ বছর আগে মরুভূমির একজন অধিবাসী সব কিছু পাশ কাটিয়ে কোন বিদ্যা শিক্ষা ছাড়া কোন কাগজ ও কলম ব্যতিরেকে পবিত্র কুরআনের প্রতিটি "আল্লাহ্" শব্দ ২৩টি বছর ধরে ধারণ করে রেখেছিলেন তাঁর মস্তিষ্কে? এবং সপ্তম দিনে বিশ্রামের পর হিসেব মিলিয়ে দেখলেন যে, ২৬৯৮ প্রকৃতপক্ষেই ১৯-এর গুণীতক? এতে প্রতিভাত হয়, যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নামের এই মানুষটি যদি এটা করেই থাকেন তবে এ ছাড়া আর কোন কাজই ছিল না তার জীবনে এবং এই গাণিতিক সমাধান অনুশীলনের জন্য তাঁর ছিল অফুরন্ত অবসর। কিন্তু না তা নয়; ইতিহাসে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ব্যস্ততম একজন মানুষ। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অযস্র ক্রিয়া কর্ম সম্বন্ধে লা-মার্টিনেল্স উদ্ধৃতি আরোপ করা যেতে পারে এখানে ঃ তাঁর পৌত্তলিক স্বদেশবাসী তীব্র বিরোধিতা করেছে তাঁর সংস্কারমূলক কাজের জন্য। তাঁকে তাঁর ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য মদিনার ইহুদী, খৃস্টান আর মুনাফিকবৃন্দ চালিয়েছে দারুণ তৎপরতা-অত্যধিক ব্যস্ততার মাঝে তিনি কি এতটুকু। অবসর পেয়েছেন এসবের হিসেবে রাখতে? এত সহজ প্রাপ্তি কী কারুর পক্ষেই সম্ভব? এ সবই কী কেবল ঘটনাচক্র? হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গাণিতিক বিস্ময়ের সামান্যই কিছু উল্লেখ করেছি আমরাএ পর্যন্ত। তাঁর (?) গ্রন্থখানি আল্ কুরআন বহু দিক থেকে একটি অনুপম গ্রন্থ। সাধারণ একজন মানুষ হিসেবে আল্লাহ্‌র এই মহাগ্রন্থ আল কুরআনের ডজনখানিক অনুপম গুণ উপস্থাপন করতে পারি আমি আপনাদের সমীপে। সন্দেহাতীতভাবে আরও বেশি দিতে সক্ষম হবেন সুশিনত পণ্ডিতবর্গ। উপরোল্লিখিত গাণিতিক বিষয়াদি নিয়ে যেহেতু আমরা কারবার করছি। সেহেতু এরই উপর আমরা বিস্তারিত আলোচনা করতে পারি।

দুনিয়ার বুকে পবিত্র কুরআন-ই একমাত্র গ্রন্থ, যার নির্দিষ্ট কতকগুলো সূরার প্রারম্ভে নির্দিষ্ট কতকগুলো আদ্যাক্ষর বা সাংকেতিক অক্ষর রয়েছে, আরবীতে যাকে বলা হয় "মুকাত্তায়াত" বা সংক্ষিপ্ত অক্ষর সম্মিলন। এই সব আদ্যাক্ষর বা সাংকেতিক অক্ষরসমূহের হয়তো বা সহজবোধ্য কোন অর্থ নেই।

আরবী বর্ণমালা মোট ২৮টি অক্ষরের মধ্যে আল কুরআনে শব্দের আদ্যাক্ষর হিসেবে রয়েছে ঠিক তার অর্ধেক (নক্‌সা ঃ ৬)

আরবি বর্ণমালার ২৮টি অক্ষর

মুকাত্তায়াতে ব্যবহৃত ১৪টি অক্ষর ঃ
সমগ্র বর্ণমালার ঠিক অর্ধেক

নক্‌সা ঃ ৬

এই ১৪টি অক্ষর অবলম্বনে গঠিত হয়েছে ১৪টি বিভিন্ন সম্মিলন বা মুকাত্তায়াত ১৪ রকমের "সম্মিলনের" পুনরাবৃত্তি ঘটেছে আল্ কুরআনের ২৯টি সূরায়। আমরা যদি ১৪টি আদ্যাক্ষরের সাথে ১৪টি 'সম্মিলন' এবং ২৯টি সূরার যোগফল নির্ণয় করি তবে আমরা পাবো ৫৭ সংখ্যাটি (১৪+১৪+২৯=৫৭), যা প্রকৃতপক্ষেই ১৯-এর গুণীতক (১৯×৩=৫৭)। এটা সংঘটিত হলো কীভাবে? ঘটনার যুগপৎ সংঘটন বা "ঘটনাচক্র" তবে কী এখানেও? ....

নিচের ৭ নম্বর নক্‌সাটির দিকে দ্বিতীয় বারের জন্য যদি আমরা ক্ষণিক দৃষ্টি ফেরাই,তাহলে তৎক্ষণাৎ আমরা দেখতে পাবো যে, ওই ১৪টি অক্ষরের প্রত্যেকটি এক, দুই, তিন, চার এবং পাঁচটি অক্ষর সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এক-একটি সম্মিলন বা "মুকাত্তায়াত" ঃ

১৪টি অক্ষর

১৪টি অক্ষর সমন্বয়ে গঠিত
১৪টি বিভিন্ন সম্মিলন বা মুকাত্তায়াত

الٓمٓ حٰمٓ الٓرٰ الٓمٓرٰ

طسٓ طسٓمٓ يسٓ

كٓهيعٓصٓ الٓمٓصٓ صٓ

قٓ حٰمٓ عٓسٓقٓ نٓ طٰهٰ

নক্‌সা ঃ ৭

২৯টি সূরায় পুনরাবৃত্ত মুকাত্তায়াত
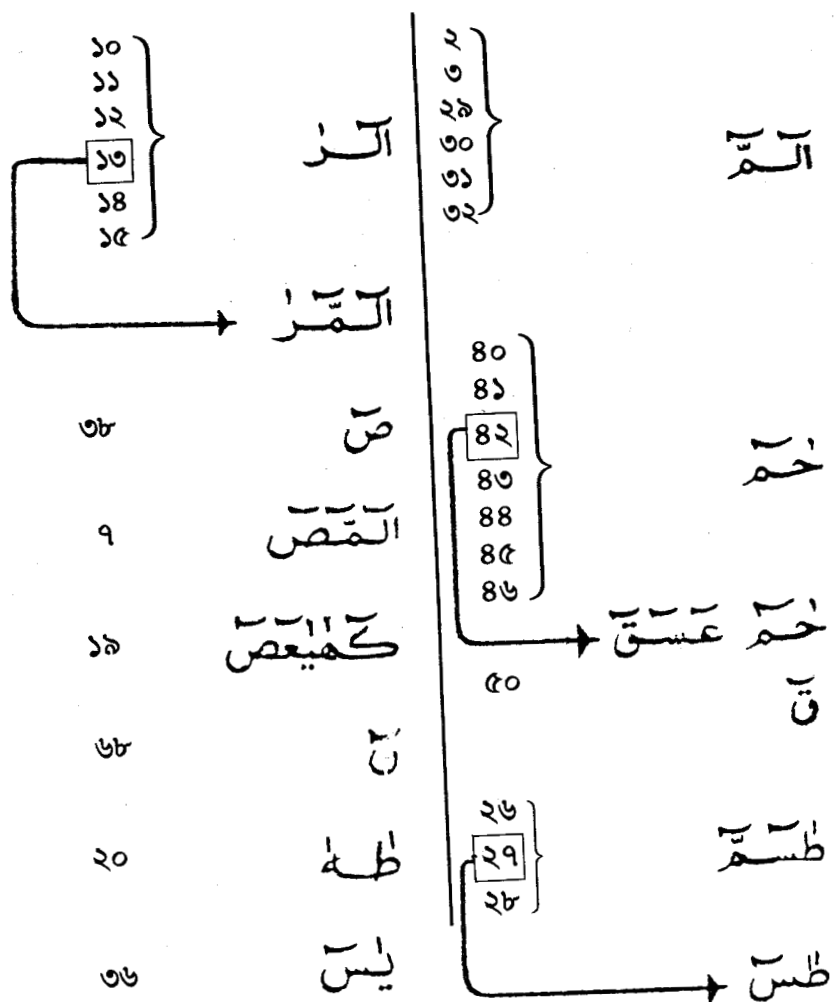
নক্‌সা ঃ ৮

১৪টা অক্ষর

الٓمٓر	الٓر	حمٓ	الٓمٓ
نٓ	يسٓ	طسٓمٓ	طسٓ
صٓ	الٓمٓصٓ	كٓهيعٓصٓ	
طه	عٓسٓقٓ	قٓ	

১৪টা সম্মিলন বা মুকাত্তায়াত

২	৩	৭	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৫	১৯	২০	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
৩১	৩২	৩৬	৩৮	৪০	৪১	৪২	৪৩
৪৪	৪৫	৪৬	৫০	৬৮	•	•	•

২৯টা সূরা

৫৭ = (১৯×৩)

عَلَيۡهَا تِسۡعَةَ عَشَرَ ۝

এরও উপরে রয়েছে ১৯ (উনিশ)

নক্‌সা ঃ ৯

সূরা কলম ঃ ৬৮ নং সূরা

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۝ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝

১. নূন,শপথ কলমের এবং ওরা যা লিপিবদ্ধ করে তার,

২. তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ নও।

৩. আর তোমার জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার,

৪. তুমি নিশ্চয়-ই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।

১৩৩ ن (নূন)
১৯×৭ = ১৩৩

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝

এরও উপরে রয়েছে উনিশ

নক্‌সা ঃ ১০

পরীক্ষার জন্য এক অক্ষর বিশিষ্ট সূরা নিতে চাইলে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের নির্বাচনে আসবে ৬৮ নম্বর সূরাটি, ঐতিহ্যগত সংখ্যা ভিত্তিক ক্রমে যেটা সর্বশেষ সূরা হলেও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নাযিলকৃত"মুকাত্তায়াত" বিশিষ্ট সূরাসমূহের মধ্যে এই সূরাটিই প্রথম, সূরা "আল্ কলম -এর প্রারম্ভেই এই ن অক্ষরটি দীব্যমান (নক্সা নং ১০)। "আল কুরআন-এর এরই প্রারম্ভিকতা সম্বন্ধে পণ্ডিতোচিত ব্যাখ্যার জন্য জনাব আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী বিরচিত "দি মিনিং অফ দি গ্লোরিয়াস্ কুরআন-এর ৫৫৯২ নম্বর টীকাটি অনুগ্রহ পূর্বক দেখা যেতে পারে। কিন্তু যেহেতু আল্ কুরআন-এর অত্যাশ্চর্য অকৃত্রিম গবেষণার জন্য ১৯ সংখ্যাটিকে আমরা যথোপযুক্ত কুঞ্জি হিসাবে গ্রহণ করেছি, তাই গণনা ও পরীক্ষার জন্য আমরা বেছে নিই না কেননা ن অক্ষরটি - যে অক্ষরটি সত্যিকার ভাবেই ৬৮ নম্বর সূরার সর্বপ্রথম অক্ষর। সূরাটির ن (নূন) অক্ষরগুলো গণনা করলেই দেখা যাবে, এখানে এই অক্ষর রয়েছে ১৩৩টি - ১৯দিয়ে যা নিঃশেষে বিভাজ্য। ক্যালকুলেটরে এর নির্ভুল জবাব হচ্ছে -৭ (১৯×৭-১৩৩)। কিন্তু এর জন্য বিশ্বাস করার প্রয়োজন নেই আমার কথায়। আপনি নিজেই গুণে দেখুন না প্রত্যক্ষভাবে এই গণনার মাঝে একটি আত্মিক আনন্দও পাবেন, আপনি। এতে পাঁচ মিনিট সময়ও লাগবে না আপনার। ১৩৩টি ن "নূন" যে আবারও ১৯-এর গুণীতক, তা সম্ভব হলো কী করে? অবশ্যই আমি চাপ প্রয়োগ করবো আপনাকে, এই জবাবের জন্য।

৮ নম্বর নস্‌কার দিকে খেয়াল করলে আপনি পুনরায় দেখতে পাবেন যে, আরও দুটো সূরা রয়েছে একক অক্ষর হিসেবে যা তার সাথে সংযোজিত। সূরা দুটো হলো ৫০ নম্বর সূরা আল্ "ক্বাফ" এবং ৪২ নম্বর সূরা আস্ শুরা"। ৫০ নম্বর সূরাটির শুরু ق "ক্বাফ" দিয়ে; আর সূরাটির শিরোনামও ق "ক্বাফ"। পক্ষান্তরে ৪২ নম্বর সূরা ৫টি অক্ষর সমন্বয়ে, যার শেষ অক্ষরটি ق "ক্বাফ"। আমরা যদি এই ৫টি অক্ষর حم عسق সংশ্লিষ্ট ৪২ নম্বর সূরাটিতে যতবার আছে, সেই সংখ্যাগুলোকে যোগ করি তাহলে সর্বমোট সংখ্যা পাবো আমরা ৫৭০ (১৯×৩০= ৫৭০)। মহান গ্রন্থকার পুনরায় আঘাত হেনেছেন মোক্ষম জায়গাটিতেই। জটিল এই হিসেব আয়ত্তে আনা কঠিন বৈকি। ৫০ ও ৪২ নম্বর সূরায় সাধারণভাবে ব্যবহৃত ق "ক্বাফ"অক্ষরটি উপরেই আমাদের অবস্থান নেওয়া উচিত, কেননা একটি অক্ষরই যেখানে আমরা আয়ত্তে আনতে সক্ষম নই, সেখানে ৫টি অক্ষরের অশ্বারোহণে ফায়দা কী?

লক্ষ্য করলেই আপনি বুঝতে পারবেন, যে বাস্তব তথ্য নিয়ে আমরা আলোচনা করছি এখানে, তাতে দৃষ্টি সম্পন্ন এবং সংখ্যা নিরূপনে সক্ষম যে কোন ব্যক্তিই এটা যাচাই করে দেখতে পারেন। এইসব 'মিরাকল্' বা "মোজেযা ব্যক্তিগতভাবে তিনি পরীক্ষা করে প্রমাণও করে নিতে পারেন, যে পবিত্র এই গ্রন্থখানি মানব রচিত নয়। ভয়ংকর এই বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করার জন্য আরবি ভাষায় ব্যুৎপত্তির কোন প্রয়োজন নেই আপনার। কোন অনুমান প্রসূত মত, কোন ধারণা বা কোন প্রকার বিশদ ব্যাখ্যাও প্রয়োজন নেই এখানে। কেবল দুই "নোকতা" বিশিষ্ট মাথার প্রতি লক্ষ্য করুন আর গুণে গুণে দেখুন সেগুলো। ৫০ নম্বর সূরায় রয়েছে ৫৭ টি মাথা (১৯×৩=৫৭), আর ৪২ নম্বর সূরায়েও ৫৭টি (১৯×৩=৫৭)। মনুষ্যোচিতভাবে বা যান্ত্রিক উপায়ে কী সম্ভব এটা? পরবর্তীতে এটাই আমরা জিজ্ঞাসা করবো ইলেট্রনিক কম্পিউটারকে।

সূরা ক্বাফ ঃ ৫০ নম্বর সূরা ঃ

ق ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ۝ بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ۝

১. ক্বাফ্ শপথ সম্মানিত কুরআনের, (তুমি অবশ্যই সতর্কবাণী)।

২. এবং তারা বিস্ময়বোধ করবে যে, ওদের মধ্যে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হয়েছে, আর কাফিররা বলে এটা তো এক আশ্চর্য ব্যাপার।

দুই ক্বাফ বিশিষ্ট সূরা দুটির মধ্যে ق 'ক্বাফ' অক্ষর রয়েছে ১১৪ (১৯×৬)টি। এটা একটা যুক্তিযুক্ত ধারণা যে, কুরআনুল কারীমে ق অক্ষরটি যেহেতু সূরাসমূহের

সমান, তাই ق(ক্বাফ) কুরআনের-ই প্রতীক। ১১৪টি 'ক্বাফ' বা 'ক' পবিত্র কুরআনের সূরা সংখ্যার সম্পূর্ণ সমান যেন প্রত্যেকটি সূরার জন্য একটি করে । আমাদের মহান গ্রন্থকার যেন বলতে চেয়েছেন,- কুরআন মজিদের প্রত্যেকটি সূরাই এক একটি কুরআন, একটি সম্পূর্ণ কুরআন এবং কুরআন ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই সূরা দুটোর ق 'ক্বাফ' অক্ষরগুলো গুণতে আপনার লাগবে মাত্র কয়েক মিনিট। আল্ কুরআনের এই অত্যাশ্চর্য প্রকৃতি বা মু'জিযা বাস্তবিকই অনুভব করতে পারবেন আপনি! যারা পবিত্র কুরআন কণ্ঠস্থ করে রেখেছেন, সেই হাফিযদের প্রতি আমার আরয এই ق অক্ষরগুলো আপনাদের স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে চয়ন করুন এবং দেখুন মোট সংখ্যাটি সঠিক বের করতে পারেন কি না? বার বার যদি আপনারা অসমর্থ হন, একবার গুণে দেখুন তাহলে প্রত্যক্ষভাবে, তবেই বুঝবেন, কী বিস্ময়কর এই কৃতিত্ব। আমাদের রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই ধরনের হিসেব যদি করেই থাকেন তাবে সেগুলোতাকে করতে হয়েছে স্মৃতির সাহায্যেই কারণ লেখা-পড়া তিনি জানতেন না।

এমনকি অতি প্রতিভাবন একজন ব্যক্তিত্ব এই ধরনের একটা কর্ম সম্পাদনকালে ঠিক এমনি একটা কষ্টকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন। মহান গ্রন্থকার কিন্তু তা হননি,নিছক একটা দৈব ঘটনা বা একটা ভৌতিক কম্পিউটার-এর পেছনে কাজ করছে। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবার পূবেই সেই মহান সত্তা তাঁর নিজস্ব কায়দায় আমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, মানব হৃদয়ের চেয়েও এক মহা শক্তিশালী শক্তি জড়িত রয়েছেন এই কর্মকাণ্ডে। আমাদের গ্রন্থকার (হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-ই যদি এটা করে থাকেন) যখন পরিকল্পিতভাবে ২ق "ক্বাফ" বিশিষ্ট সূরা তাঁর মস্তিষ্কে ধারণ সম্পন্ন করলেন, তখন অবশ্যই তাকে গুণে দেখতে হয়েছিল সম্যত ق " ক্বাফ" অক্ষরগুলো, এবং ১৯ দিয়ে তা ভাগ করার পরই সংখ্যাটি যখন ১৯ এর গুণীতক বলে প্রতীয়মান হয়েছিল, তখনি তাঁর শ্রুতি লেখকদের কাছে সেগুলো আবৃত্তি করেছিলেন, তিনি- কারণ একবার আবৃত্তি করার পর তিনি আর তা প্রত্যাহার করতেন না কখনোই।

আমরা ধরে নিতে পারি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ৪২ নম্বর সূরায় ৫৭টি= "ক্বাফ" অক্ষর সংযুক্ত করে বিরাট সাফল্য অজন করেছিলেন, কিন্তু ৫০ নম্বর সূরায় যখন তিনি ঐ ق ক্বাফ অক্ষরগুলো গুণে দেখলেন বিস্ময় ভাবে তখন

পেলেন ৫৮টি এবং ৫৮ গুণীতক নয় ১৯-এর। ১৯ সংখ্যাটি পূরণের জন্য হয় তাঁকে আরও কিছু পঙ্‌তি যোগ করে ১৮টি ق "ক্বাফ" অক্ষর সংগ্রহ করতে হতো, নতুবা বাদ দিতে হতো একটি ق "ক্বাফ"। অবশ্যই শেষোক্তটি তাঁর জন্য ছিল সহজ পন্থা। কিন্তু বাদ দিতে হবে কোন ق "ক্বাফ" টি?

সূরাটি শুরুই করেছেন তিনি ق "ক্বাফ" অক্ষর দিয়ে। প্রথম ق "ক্বাফ" অক্ষরটি বাদ দেওয়াই তাঁর জন্য ছিল সহজতর। আর তার সমস্যার সমাধানও হতো এতে। কিন্তু না। তার পুরো পরিকল্পনাটাই ছিল, কুরআনিক প্রারম্ভিকতা বা মুকাত্তায়াত" সমূহ গণনা করে, ১৯ দিয়ে ভাগ করে সেই মহা পরাক্রমশালী সূক্ষ্ম গাণিতিক বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে তুলে ধরা। -বিগত চতুর্দশ শতাব্দিতে ১১৪ টি সূরার মধ্যে একটি সূরাও যদি হারিয়ে যেত তাহলে সূরার সংখ্যাও কখনোই বিভাজ্য হতো না ১৯ দিয়ে শুধু এমনিই নয়, আরবী বর্ণমালা ১৪টি অক্ষরের মধ্যে যদি একটি মাত্র অক্ষর যোগ করা হতো; মুছে দেওয়া বা পরিবর্তন করা হতো, তাহলে আল্ কুরআনের এই বিস্ময়কর গাণিতিক পদ্ধতি টুকরো টুকরো হয়ে যেত, আর কুরআন উল-করীম পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ন্যায় যুক্ত হতো সংশোধনীর তালিকায়। পবিত্র গ্রন্থের প্রকৃত গ্রন্থকার সত্য সত্যই পালন করেছেন তার অঙ্গীকার ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ○

নিশ্চয়ই আমি নাযিল করেছি কুরআন, আর তার হিফাজতকারী নিশ্চয়ই আমি। — আল কুরআন ১৫ : ৯

কুরআনুল কারীম এর প্রায় অর্ধাংশ ২৯টি মুকাত্তায়াত বিশিষ্ট সূরা এই দুর্ভেদ্য গাণিতিক বুননের সাথে জাড়ি, যেমনি আপনি ৮ নম্বর নক্সায় লক্ষ্য করেছেন হয়তো। পরোক্ষভাবে ঠিক তেমনিই আল্লাহ্‌র এই মহাগ্রন্থের হেফাজত করা হয়েছে সুনিশ্চিত। নিশ্চয়ই আপনাদের স্মরণে আছে ২৬৯৮টি الله। "আল্লাহ্" শব্দ রয়েছে কুরআনুল করীমে। গড়ে তাহলে প্রতি ২.৫টি আয়াতে রয়েছে ১টি করে الله। "আল্লাহ" শব্দ। এমনি الله। "আল্লাহ্ নাম যুক্ত একটি মাত্র বাক্য যদি সংযোজন বা বিয়োজন হতো,তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিজস্ব প্রতিরক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে হতো ব্যর্থ।

অধ্যায় আট

গাণিতিক অলৌকিকত্ব

পবিত্র কুরআনকে সংরক্ষণ ও সুরক্ষা জন্যে পারস্পরিক বন্ধন পদ্ধতির এমনি জটিল প্রক্রিয়ায় অপ্রত্যাশিত ভাবে, হঠাৎ দৈবক্রমে বা ঘটনাচক্র হিসেবে সংঘটিত হওয়া কী সম্ভব? রেভারেন্ড বস্‌ওয়ার্থ যেমনটি মত প্রকাশ করেছেন, "বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনা শৈলীর বিশুদ্ধতা, জ্ঞান ও সত্যের,এই অলৌকিক নিদর্শন কী একটি অচেতন কম্পিউটার সৃষ্টি করতে সক্ষম? আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল কুরআনের গ্রন্থকার দেখাতে চেয়েছেন,অপ্রত্যাশিতভাবে সৃষ্টি হয়নি তাঁর এই গ্রন্থ; দেখাতে চেয়েছেন, একজন সচেতন সত্তা বিজড়িত রয়েছেন এই গ্রন্থখানি প্রণয়নে। তাঁর অপরিসীম দক্ষতা ও অপূর্ব কর্ম সম্পাদন প্রণালী আবিষ্কারের জন্য গুপ্ত কথার ইঙ্গিতে অনেক রহস্যের সূত্র তিনি ছড়িয়ে রেখেছেন গ্রন্থখানিতে।

আল কুরআনের মত অতিপ্রাকৃত একখানি গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ যদি কোন মানুষ গ্রহণ করতো, তাহলে এই গুরুত্বপূর্ণ অসম্ভব কাজটি সম্পাদনের প্রচেষ্টা দুরূহ বিবেচনায় তার মধ্যে অবশ্যই আসতো একটা দ্বিধান্বিত ভাব। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁর অনায়াস প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাস্তব বা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সৃষ্ট এই সব সমস্যাসমূহের সার্থক সমাধান করতে পারতেন অত্যন্ত সহজে, আমাদের অগোচরেই। কিন্তু তার সচেতন কর্ম পদ্ধতির দিকে আকর্ষণ করেছেন আমাদের মনোযোগ। সুস্পষ্টভাবে তিনি বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন আমাদেরকে যে, কোন মানুষ যদি রচয়িতা হতো পবিত্র কুরআনের আর তাঁর সমস্ত কাজই যদি সম্পন্ন হতো সুচারুরূপে তবুও হয়তো তার কাছ থেকে বাদ পড়ে যেত একটি ق "ক্বাফ"অক্ষর। লক্ষ্য করুন, দুই ق বিশিষ্ট সূরা দুটি লেখার পর তিনি হয়তো পেয়ে গেলেন, ১১৫টি ق "ক্বাফ" অক্ষর এবং ১১৪টি নয় যেমনটি আমরা দেখছি। যদি হযরত

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম- ই লেখক হতেন ওগুলির তাহলে তাঁর স্মৃতিতে সূরা দুটি প্রথমে বিন্যস্ত করার সময় তার অতিরিক্ত অসুবিধার কথা সহজেই আমরা অনুমান করতে পারি, কারণ তিনি পড়তেও জানতেন না, লিখতেও জানতেন না। একবার তার মস্তিষ্কে সেগুলো ধারণ করার পর তাঁকে মুখস্থ করে নিতে হতে সেগুলো। অলিখিত বাণীগুলো যা কখনো দেখা যায়নি বা শোনা যায়নি। তা মুখস্থ করে পুনাবৃত্তি করা অলীক কল্পনা মাত্র। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখনি পবিত্র কুরআনের কোন অংশ আবৃত্তি করতে মনস্থ করতেন তখনি তিনি ডেকে নিতেন কুরআন লেখকদেরকেএবং স্রেফ আরম্ভ করে দিতেন পড়া যেন স্বাচ্ছ্যন্দে গ্রন্থখানি তিনি পাঠ করে যাচ্ছেন। মনে হতো, সবই যেন তাঁর মুখস্থ রয়েছে।

মুহূর্তের জন্যে হলেও অবিশ্বাসীদের মতো আমরাও যদি ধরে নিই যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (?) এই অসম্ভব কৃতিত্বপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করেছেন, এবং দুই ق "ক্বাফ" বিশিষ্ট সূরার ق "ক্বাফ" অক্ষরগুলো যোগ করে সর্বমোট সংখ্যা পেলেন ১১৫; তারপর সেগুলোকে ১৯ দিয়ে ভাগ করলেন তিনি এবং অবশিষ্ট পেলেন ১, যা বাদ দেওয়ার প্রয়োজন ছিলো শ্রুতি লেখকদের কাছে বলে যাবার আগেই । তার জন্যে সহজতর উপায় ছিল প্রথম ق "ক্বাফ" অক্ষরটি মুছে ফেলা, কিন্তু পূর্বে উল্লিখিত কারণসমূহের জন্যে (মুকাত্তায়াত বিশিষ্ট সূরাসমূহ থেকে বাদ দিলে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে বলে) ওগুলোকে রাখাই ছিল যুক্তিযুক্ত। পরবর্তী ق "ক্বাফ" অক্ষরটি নিম্নোক্ত শব্দসমূহের মধ্যেই বিরাজিতঃ

وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ

"গৌরবময় কুরআনের শপথ"

قُرْاٰنِ 'কুরআন' - এই একটি শব্দের আরও ত্রিশটি সমার্থক শব্দ রয়েছে 'আল কুরআনের আর সেই সমার্থক শব্দগুলো হলো ঃ 'আল্ কিতাব', 'আল্ ফুরকান', 'আল্ বুরহান', 'আজ জিক্র', 'আত্ তান্জিল' ইত্যাদি। এবং আমরা কেউই এমন জ্ঞানী নই যে, মহান গ্রন্থকার কী করেছেন, তা আমরা অবহিত, শুধু বিষয়টি উত্তমরূপে উপলব্ধি করানোর জন্যেই তিনি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলতে চেয়েছেন, যে ق "ক্বাফ" কুরআনেরই প্রতীক, যেমন 'আ' আপেলের। তাছাড়া সংঘাতও এতে হ্রাস হওয়া সম্ভব। আমাদের এই গ্রন্থকার পূর্ণ নৈতিক বিশুদ্ধতা

অর্জ্জনে বিশ্বাসী! তাঁর সত্তায় রক্ষিত, ق "ক্বাফ" অক্ষরটি মুছে ফেলার জন্য তাই তিনি পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা করবেন, এটাই স্বাভাবিক। বিরাট এক গুচ্ছ ق "ক্বাফ" অক্ষর তিনি লক্ষ্য করেন ১৩ নং আয়াত শরিফ-এর চতুর্দিকে। সংখ্যায় সেগুলো পুরো ৫টি;এর-ই একটিকে বর্জন বা অপসারণ করাই যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়ই। পরীক্ষার জন্যে চলুন না আমরা দৃষ্টি ফেরাই ১২ নম্বর নক্সাটির প্রতি এবং পাঠ করে যাই ১২,১৩ ও ১৪ নম্বর আয়াত শরীফ। আয়াত ৩টিতে ق "ক্বাফ"এর সংখ্যা ৪। হ্যাঁ, কিন্তু থাকার কথা ৫টি। তাহলে কী আপনি বলতে চান, পরিবর্তিত হয়েছে আল কুরআন? আমি বলি, "না।" তাহলে এই অসঙ্গত বক্তব্যের অর্থ কি? দেখুন মহান গ্রন্থকার আল্লাহ্ অথবা ধরা যাক (অবিশ্বাসীদের কথায়) হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিকল্পনায় এই ৩টি আয়াতে ق "ক্বাফ"এর সংখ্যা ছিল ৫টিই। ১৩ নম্বর আয়াতেই রয়েছে রহস্য সমাধানের সূত্রটি। ঐ اِخْوَانُ لُوط শব্দটি লক্ষ্য করুন। এট হওয়া উচিত ছিল قَومُ لُوطٍ; কিন্তু কেন قَومُ لُوطٍ "কাওমু লুত"? কারণ সমগ্র কুরআনুল করীমের বিভিন্ন স্থানে মহান গ্রন্থকার লুত আলায়হিস্ সালামের জাতিকে মোট ১২বার উল্লেখ করেছেন قَومُ لُوطٍ বলে। গ্রন্থকার, যিনি লূত আলাইস হিস সালামের সম্প্রদায়কে যারা তাদের কামনা চরিতার্থ করবার জন্যে অস্বাভাবিক ঘৃণ্য উপায় অবলম্বন করে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল, তাদের বর্ণনার ক্ষেত্রে তার দৃঢ় অপরিবর্তনীয় নীতি অনুসরণ করেছেন, সেই তিনিই কেন ত্রয়োদশ বারে ত্রয়োদশ আয়াতে তাদেরকেই আবার বর্ণনা করলেন اِخْوَانُ لُوط "ইখাওয়ানু লুত" বলে? একজন গ্রন্থকার, যিনি একদল লোকের বর্ণনা দিতে ১২ ও ১৩ নম্বর আয়াত শরীফের মত দুটি আয়াতে করীমার মধ্যে ৩টি প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে পারেন এবং এমনকী একটি জাতির ধারণা দেন, কেন বিশেষণ ছাড়াই قَومُ لُوطٍ "কাওমু লুত" ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর সেই অপরিবর্তনীয় একই নীতিতে দৃঢ় থাকাই তো স্বাভাবিক। কোন মনোযোগী পঠক ১৩ নং আয়াত শরীফে নিশ্চয়ই হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন এই অপরিবর্তনীয় ধারাটি। দ্বাদশ বার পর্যন্ত এক-ই নীতিতে অবিচল থেকে ব্যবহৃত প্রতিশব্দের সৌন্দর্য মুগ্ধ কোন মনুষ্য রচয়িতা স্বাভাবিকভাবেই হয়তো বা قَومُ لُوطٍ "কাওমু লুৎ-ই" পুনরুক্ত করতেন এবং পূর্ণ করতেন ১৩টি! ঐরূপ অবস্থায় সূরা " ক্বাফ"এর ق ক্বাফ অক্ষরটি হয়তোবা হতো ৫৮; কিন্তু ৫৮ নয় ১৯-এর গুণীতক। তিনি কি বলেন নিও ১৯ গুণতে বাধ্য করবো আমি তোমাকে?

عَلَيۡهَا تِسۡعَةَ عَشَرَ ۝

এরও উপরে উনিশ।

قَوْمُ لُوطٍ

কোন পরিবর্তন ব্যতিরেকে পবিত্র কুরআনে ১২ বার পুনরাবৃত্ত হয়েছে:
লক্ষ্যণীয় একমাত্র ব্যতিক্রম ১৩ নম্বর আয়াতে

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّأَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ
وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ
وَّأَصْحٰبُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ

নক্‌সা -১২

কেবল একটি মাত্র সূরা রয়েছে. যার শুরু একটি মাত্র "মুকাত্তায়াত" দিয়ে, আর সেই সূরাটি হলো "আল কুরআনের ৩৮ নম্বর সূরা "আস্ সাদ" ص লক্ষ্য করুন, যেমনটি ৫০ নম্বর ও ৬৮ নম্বর সূরা যথাক্রমে ق ও ن এর কোন অনুবাদ কখনোই হয়নি, ঠিক তেমনি ص "ছোয়াদ" ছোয়াদই রয়ে গেছে ৬৮ নম্বর সূরাতে। কোন অনুবাদকই দুঃসাহস দেখাননি ঐগুলোর অর্থ করার। হ্যাঁ ব্যাখ্যা দিয়েছেন অনুমান সিদ্ধ ব্যাখ্যা। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অনুগ্রহে আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি। দূষণ বা বিকৃতী থেকে স্বীয় পবিত্র বাণী সংরক্ষণের গ্যারেন্টি হিসেবে তাঁর এই গাণিতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন আল্লাহ নিজেই। বিচার বা যাচাই-এর জন্যে এটা একটা সহজ পদ্ধতি—অত্যন্ত সহজ, যা যে কেউ এমন কি একটা শিশুও বুঝতে পারে। কিন্তু আমাদের প্রখ্যাত টীকাকারগণ এরূপ স্পষ্ট ও অকাট্য ঘটনাসমূহ উপেক্ষা করলেন কিভাবে? জবাবটা সহজ সময়টা—পরিপক্ক ছিল না। ছিল অসময়োপযোগী।

৩৮ নম্বর সূরা সোয়াদ ছাড়াও অন্য আরো দুটো সূরা রয়েছে, অক্ষর সমষ্টির অংশ হিসেবে যেগুলোতে ব্যবহৃত হয়েছে একই সাধারণ বিভাজক। সেগুলো হচ্ছে ৭ ও ১৯

নম্বর সূরা। বিচিত্র অক্ষর বিন্যাস বা 'মুকাত্তায়াত' যেখানে একাধিক দৃষ্ট হয়, সেখানে সবগুলো অক্ষরই আমাদের গুণে দেখা উচিত এবং দেখা উচিত তা ১৯-এর গুণীতক কি না! কিন্তু এখানে উল্লেখিত ৩টি সূরার মধ্যে এক অক্ষর বিশিষ্ট 'মুকাত্তায়াত' ص "সোয়াদ" এর সাথেই আমরা সম্পৃক্ত; এই ৩টি সূরায় ص "সোয়াদ" এর মোট সংখ্যা হচ্ছে ১৫২। ১৫২ নিঃশেষে বিভাজ্য ১৯ দিয়ে (১০×৮=১৫২)।

ص

সূরা ৭ আ'রাফ ঃ المص

সূরা ১৯ মরিয়ম ঃ كهيعص

সূরা ৩৮ সোয়াদ ঃ ص

ব্যবহৃত অক্ষর	সাধারণ অক্ষর	প্রারম্ভিক শব্দ	সূরা
৯৮	ص	المص	৭
২৬	ص	كهيعص	১৯
২৮	ص	ص	৩৮

১৫২ ÷ ১৯

= ৮ অর্থাৎ ৮×১৯ =১৫২

عَلَيۡهَا تِسۡعَةَ عَشَرَ ۝ এরও উপরে রয়েছে উনিশ

নক্‌সা-১৩

কিন্তু আপনাদের আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যে একটি মাত্র অক্ষর বিবেচনায় আনতে আদৌ অনুরাগী নন আমাদের গ্রন্থকার। ৭ নম্বর সূরাটি লক্ষ্য করুন, দেখবেন, মুকাত্তায়াত বিশিষ্ট ৪টি অক্ষর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সেখানে, আর ৫টি রয়েছে ১৯ নম্বর সূরাতে। ৩৮ নম্বর সূরার সাথে এই অক্ষর সমষ্টির মধ্যে তিনি বিবেচনায় আনতে

চানা পুরো ১০ টি অক্ষরের দশটিকেই। গণনা করুন ওগুলো অথবা উপস্থাপন করুন কম্পিউটারে; দেখবেন, আশ্চর্যের আর সীমা-পরিসীমা রইবে না আমাদের। এর সবগুলোই কী ছিল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রার্থনার জবাব? সব সময়ই তো তিনি সাগ্রহে প্রার্থনা করেছেন তাঁর প্রভুর কাছে, ইয়া আল্লাহ্ বৃদ্ধি করে দাও আমাদের জ্ঞান। ইয়া আল্লাহ্ প্রসারিত করো আমার ধীশক্তি । ইয়া আল্লাহ্,অনন্ত বিস্ময়ে পরিপূর্ণ করে তোল আমাকে।

৭ নম্বর সূরা المص। "আলিফ" "লাম" "সোয়াদ"এ "আলিফ" রয়েছে ২৫২৯ টি ,"লাম" রয়েছে ১৫৩০ টি, "মিম" রয়েছে ১১৬৪ টি আর "সোয়াদ"রয়েছে ৯৭টি যার সর্বমোট যোগফল দাঁড়ায় ৫৩২০ অর্থাৎ ১৯×২৮০।

১৯ নম্বর সূরায় كهيعص "ক্বাফ" "হা" "ইয়া" "আইন" "সোয়াদ"এ অক্ষরগুলির সংখ্যা হচ্ছে ঃ

ق "ক্বাফ" -১৩৭

ه "হা"- ১৭৫

ى "ইয়া" -৩৪৩

ع "আইন"- ১১৭

ص "সোয়াদ" ২৬

৭৯৮ (১৯×৪২)

আলোচ্য "সেটটির প্রথম সূরা অর্থাৎ ৭ নম্বর সূরায় মহান আল্লাহর তরফ থেকে আমরা পাই একটি চমকপ্রদ রহস্যময় ইঙ্গিত। ৬৯ নম্বর আয়াত শরীফে بَصۜطَةً "বাসতাতান" শব্দটি পাঠ করুন, দেখবেন, "বাসতাতান" শব্দটির বানান লেখা রয়েছে ص "সোয়াদ" দিয়ে কিন্তু ঐ ص "সোয়াদ"এর ঠিক উপরে রয়েছে ছোট্ট একটা س "সিন" আমাদেরকে জানিয়ে দেয় ص "সোয়াদ" দিয়ে শব্দটি লেখা হলেও অবশ্যই আমরা উচ্চারণ করবো س "সিন"এর মতোই। একশ মিলিয়ন আরবী ভাষাভাষীদের মধ্যে অসংখ্য উপভাষায় بَصْطَةً "বাসতাতান" শব্দটি ص "সোয়াদ" দিয়ে লেখার কোন নজির দৃষ্ট (নক্সা ১৪ ও ১৫) হয় না।

وَاذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِى ٱلْخَلْقِ بَصۜطَةً

এবং স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে নূহের সম্প্রদায়ের পরে তা'দিগের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদিগের অবয়ব অন্য জাতি অপেক্ষা শক্তিতে অধিকতর সমৃদ্ধ করেছেন। — কুরআন ৭ : ৬৯

بَصۜطَةً

ص দিয়ে লেখা, কিন্তু উচ্চারণ س এর মত।

লক্ষ্য করুন ص এর ঠিক উপরে ছোট্ট একটি

কেন ص লেখা সেখানে উচ্চারণ س এর মত?

শ্রুতি লেখকরা কী বানানটি জানতেন না?

জবাবের জন্যে দেখুন আল্ কুরআনের ২ : ২৪৭ আয়াত শরীফ নক্সা- ১৫

নক্সা- ১৪

قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَـٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ

بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

নবী বললেন, আল্লাহ্ তাকে তোমাদের জন্যে মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন। — কুরআন- ২ : ২৪৭

বানান এই রকম

সুতরাং শ্রুতি লেখকরা বানানটি জানতেন। " س " বা " ص " যা দিয়েই বানানটি লেখা হোক না কেন। অর্থ কিন্তু থাকছে একই। যেমন দান, প্রদান। ইংরেজিতে Docile বা Doxile কিংবা Circle বা Sircle যাই লেখা হোক অর্থ একই। কিন্তু ৭ ঃ ৬৯ আয়াত শরীফে س "সীন" লেখা হতো তাহলে ص "সোয়াদ" -এর সংখ্যা হতে ১৫১ ঃ

তাই عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ০ এই সাবধান বাণীটির থাকত না কোন সার্থকতা।

নক্সা - ১৫

আরবী একটি উচ্চারণভিত্তিক ভাষা। ইংরেজীর মত উচ্চারণ যেখানে "nife" কিন্তু বানান "knife", উচ্চারণ "Filosofer" কিন্তু বানান Philosopher এর মত করে আমরা উচ্চারণ করি না, যেমন স্পষ্টভাবে আমরা উচ্চারণ করি, বানানও করি ঠিক তেমনিভাবেই। তাহলে بَصْطَةً শব্দটিতে এই ভিন্নতা কেন?

বর্ণিত আছে যে, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরোক্ত ৬৯ আয়াত শরীফটি তাঁর শ্রুতি লেখকদের কাছে বলে যাবার সময়য যখন بَصْطَةً শব্দটির কাছে এলেন, তখন তার শব্দটির বানান ص "সোয়াদ" দিয়ে লিখবার জন্যে জিবরাঈল আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আদিষ্ট হলেছিলেন বলে তাঁদেরকে জানিয়েছিলেন, আর তাই তাঁরা ص সোয়াদ দিয়েই শব্দটির বানান লিখেছিলেন এবং সেই কারণেই ১৪০০ বছর ধরে এই বানানেই লিখিত হয়ে আসছে শব্দটি। এখন প্রশ্ন হতে পারে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শ্রুতি লেখকগণ কী বানানটি জানতেন না? নিশ্চয়ই তাঁরা অবহিত ছিলেন বানানটি; (অনুগ্রহপূর্বক ১৫ নম্বর নক্সাটি দেখুন) এবং ২ঃ২৪৭ আয়াত শরীফে আপনারা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবেন যে এই একই بَسْطَةً "বাস্তাতান" শব্দটি س সীন বানানেই লেখা হয়েছে সেখানে। বানানটি যদি সেখানে তাঁরা শুদ্ধ করে লিখতে পারেন তবে ৭ঃ৬৯ আয়াত শরীফে এই ব্যতিক্রম কেন? আরো শব্দটির বানান س দিয়ে লেখাই হোক অথবা "ص" দিয়ে, অর্থের কোনই তারতম্য তো হচ্ছে না। সত্য বটে, ইংরেজি "docile" অথবা "docile" যে বানানে লেখা হোক অর্থ থাকছে একই; অথবা "Circle" শব্দটি "Sircle" দিয়ে লিখলেও কোনই পরিবর্তন হচ্ছে না অর্থে। কিন্তু তাহলে জিবরাঈল আলাই হিস সাল্লাম কেনই বা তাঁদেরকে বলতে বললেন কোন বানানে লিখতে হবে শব্দটি?

প্রায় সহস্রাধিক বছর ধরে পবিত্র কুরআন কপি করা হতো হাতে লিখে আর এক জনের নিকট থেকে অন্যজনের নিকট করা হতো হস্তান্তর। কুরআন অবতীর্ণ হবার সহস্রাধিক বছর পর্যন্ত কোন ছাপাখানা ছিল না। প্রত্যেক বিজ্ঞ ব্যক্তিই কুরআন মজিদ হাতে লিখে নকল করার সময় ২ঃ২৪৭ নম্বর আয়াত শরীফের নিকট পৌঁছে আপনা আপনিই بَسْطَةً শব্দটির বানান س সীন দিয়েই লিখে গেছেন; ভাষাটি উচ্চারণভিত্তিক বলে বানানের ব্যাপারে কোন প্রচেষ্টাই চালাতে হয়নি। কিন্তু একই

নকলকারী ৭ঃ৬৯ আয়াত শরীফের নিকট পৌঁছে হয়তো নিশ্চয়ই হতচকিত হয়ে পড়তেন শব্দটির “ভুল” (?) বানান দেখে। তাঁর পিতা বা পিতামহ অবনধনতাবশত বানানটি ভুল করে যাননি তো? না, বানানটি পরিবর্তন করার সাহসই তাঁর ছিল না, কারণ আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তা জিবরাঈল আলাইহিস্‌ সালাম এইভাবেই লিখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন বানানটি। আর তাই এইভাবেই লিখিত হয়ে আসছে বানানটি। হস্তলিখিত অসংখ্য কপির মধ্যেই একটিতেও সংশোধন করা হয়নি বানানটি; কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি যদি স্বাভাবিক প্রবণতাবশত ঃ আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণীর এই শব্দটি সংশোধন করে বসতেন তবে “ ص ” সোয়াদ চিহ্নিত এটি আদ্যাক্ষর বা মুকাত্তায়াত বিশিষ্ট সূরায় ১টি “ ص ” ‘সোয়াদ’ কমে “ ص ” এর সংখ্যা দাঁড়াতো ১৫১এবং ১৫১ বিভাজ্য নয় ১৯ দিয়ে।

যিনি তার অসীম শক্তি ও সীমাহীন গুণরাজার পরিচয় প্রদানের জন্যে মোযেজার পর মু'জিযা প্রদর্শন করে নিত্যনিয়ত আমাদেরকে চমৎকৃত করে চলেছেন, সেই মহান গ্রন্থকার, মহাবিশ্বের একচ্ছত্র মহান অধিপতি, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ জাল্লা শানহুর প্রতি অসীম শ্রদ্ধায় আপনার শিরনুনত হয়ে আসে নাকি? বস্তুত তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন তিনি।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ○

আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি আর আমিই এর রক্ষক—হেফাজতকারী।

— আল কুরআন ১৫ : ৯

আল্‌ কুরআনের প্রত্যেকটি অধ্যায় বা সূরার শুরুতে যেসব প্রারম্ভিক অক্ষরবিন্যাস বা মুকাত্তায়াত রয়েছে তার সবগুলোতেই অনুসরণ করা হয়েছে একই রকম বিস্ময়কর প্যাটার্ন বা আদর্শ সূরাসমূহে ব্যবহৃত প্রারম্ভিক সংক্ষিপ্ত অক্ষরসমূহ গণনা করে দেখুন এবং সেগুলো ভাগ করু ১৯ দিয়ে; দেখবেন অবিশ্বাস্যভাবে সংখ্যাটি ১৯ এর গুণীতক। কার এমন সময় এবং শক্তি রয়েছে এই জটিল গাণিতিক পদ্ধতি উদ্ভাবন

করার? নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নয়— ইতিহাসে যিনি ছিলেন একজন অতি ব্যস্ততম মানুষ। এর পরও কি ছিদ্রান্বেষীরা আমাদেরকে বিশ্বাস করাতে তৎপর হবেন যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বালির অভ্যন্তরে লুকিয়ে রেখেছিলেন কিছু “কম্‌পিউটার” যার সাহায্যে তিনি এই জটিল গাণিতিক বন্ধনে বিন্যস্ত করেছিলেন, পবিত্র কুরআনকে। আমি এখনি গ্রহণ করতে প্রস্তুত এই কম্‌পিউটার থিওরী; তবে আবিলতা থেকে আপন গ্রন্থখানিকে রক্ষা করার জন্যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মতো একজন রক্তমাংসের মানুষ এমনি এক অবিচ্ছেদ্য পারস্পরিক জটিল গাণিতিক বন্ধন পদ্ধতি অবলম্বন করবেন—এ বিশ্বাস করা কঠিন বৈকি।

এই নিবন্ধে বিস্ময়কর এই আবিষ্কারের বরফ স্তূপের প্রান্তবর্তী ক্ষুদ্র একটি অংশ আমি স্পর্শ করেছি মাত্র। বিয়ষটি আরো গভীরে যেতে যাঁরা ইচ্ছে পোষণ করেন তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক আবেদন, তাঁরা যেন ইস্‌লামিক টেপ লাইব্রেরী, ৩১৮ সায়ানী সেন্টার ১৬৫ স্রে স্ট্রীট , ডারবান থেকে ডঃ রাশাদ খলিফা পি, এই,ডি বিরচিত পুস্তিকা ও টেপ সংগ্রহ করে পাঠ করেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি ডঃ খলিফার কাছে ঋণী এইজন্য যে, তিনিই আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনে সহায়তা করেছেন বিষয়টির উপর। নিঃস্বার্থভাবে ইসলামেরা খেদমত করার জন্য মহান আল্লাহ্‌ দীর্ঘজীবী করুন তাঁকে।

কিন্তু এই অলৌকিক গাণিতিক আলোচনা ছেড়ে যাবার পূর্বে الـم। “আলিফ”, “লাম”, “মিম” মুকাত্তায়াত বিশিষ্ট সূরাগুলির উপর আমার শেষ নক্‌সাটি আপনাদের সমীপে উপস্থাপন করার সুযোগ দিন আমাকে। একশটি কাগজে ছকাংকিত তথ্যটি শুধু কপি করুন আর মিলিয়ে নিন মোট সংখ্যাটি। তারপর স্বতন্ত্রভাবে অক্ষরগুলোর নিরূপিত সংখ্যা বিন্যস্ত করুন বৈদ্যুতিক ইন্দ্রজাল কম্‌পিউটারে—সঙ্গে সঙ্গে আপনি অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর কি দারুণ অন্যায়ভাবে আরোপিত করা হয়েছে এই বিরাট প্রকৃতির অতি মানবীয় কাজটি।

الم

সূরা	মিম	লাম	আলিফ
২. আল-বাকারা	২১৯৫	৩২০৪	৪৫৯২
৩. আলে ইমরান	১২৫১	১৮৮৫	২৫৭৮
৭. আ'রাফ	১১৬৫	১৫২৩	২৫৭২
১৩. রাদ	২৬০	৪৭৯	৬২৫
২৯. আন্কাবুত	৩৪৭	৫৫৪	৭৮৪
৩০. রুম	৩১৮	৩৯৬	৫৪৫
৩১. লুকমান	১৭৭	২৯৮	৩৪৮
৩২. সাজ্দা	১৫৮	১৫৪	২৬৮
	৫৮৭১	৮৪৯৩	১২৩১২ → আলিফ

৮৪৯৩ → লাম

৫৮৭১ → মিম

১৯ × ১৪০৪ = ২৬৬৭৬

عَلَيۡهَا تِسۡعَةَ عَشَرَ ۝

এরও উপরে রয়েছে উনিশ

নক্সা : ১৬

উল্লিখিত ৮টি সূরা ا ل م । "আলিফ" "লাম" "মীম"-এর অক্ষর সংখ্যা হচ্ছে ২৬,৬৭৬। ধরা যাক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ২৩টি বছর ধরে গুণে গেছেন এবং এই বিস্ময়কর সংখ্যাটি ভাগ করেছেন তার মনন যন্ত্রে, আর সন্তুষ্ট হয়েছে এখনি যখন সংখ্যটির উত্তর এসেছে ১৯×১৪০৪; কিন্তু এটা অবিশ্বাস্য বৈকি। কিন্তু এর চেয়েও বিস্ময়কর ঘটনা এটাই যে, বিরাট গাণিতিক নৈপুণ্যের কথা তিনি প্রকাশ করেন নি কারুর কাছেই—এমন কী তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহচর আবু বকর রাজিআল্লাহু আনহুর কাছেও না, তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী বিবি আয়েশা সিদ্দীকা রাদিআল্লাহু আনহার কাছেও না। তাঁর ওফাতের দিন পর্যন্ত তিনি এর জন্য দাবী করেন নি কোন কৃতিত্ব। এই নিঃসীম নীরবতার কোন ব্যাখ্যা কী আপনি দিতে পারেন?

অধ্যায় নয়

ভবিষ্যদ্বাণী ও সিদ্ধিলাভ

হৃদয়স্পর্শী এই সব অলৌকিক ঘটনাসমূহের নিরিখে আমরা উপনীত হতে বাধ্য যে, কোন—মানুষই। এমনকী গোটা মানবজাতি তাদের সমস্ত কম্‌পিউটার ও ক্যালকুলেটর সহ প্রচেষ্টা চালিয়েও চরম ও পরম অলৌকিকত্ব সৃষ্টির সর্বশেষ মোযেজা এই পবিত্র গ্রন্থ আল্ কুরআন রচনা করতে সমর্থ নয়। এরপরও যদি এর পবিত্র গ্রন্থস্বত্ব নিয়ে আপনাদের এতটুকু সন্দেহের উদ্রেক হয়, তবে জিজ্ঞাসা করুন না কেন আপনাদের কম্‌পিউটারকে?

হ্যাঁ, ইতিমধ্যেই কুরআনকে বিন্যস্ত করা হয়েছে কম্‌পিউটারে। ডক্টর রাশাদ খলিফা বিরচিত "দি পারপিচুয়্যাল মিরাক্‌ল অব মুহাম্মদ (সা)"* পুস্তকখানির উল্লেখ করা যেতে পারে এখানে। পূর্বলিখিত সমকালীন ঘটনা বা "ঘটনাচক্র"কম্‌পিউটারে বিন্যস্ত করার এই বৈদ্যুতিক ইন্দ্রজালকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, পরস্পর বন্ধনযুক্ত ১৯ সংখ্যার বুননে আল্ কুরআনে মত একটি মহান গ্রন্থ আকস্মিকভাবে কোন মানুষের পক্ষে রচনা করা কি আদৌ সম্ভব? কম্‌পিউটারের জবাব ঃ ৬২৬ সেপ্‌টিলিয়ন বার প্রচেষ্টা চালানোর পর হয়তো বা মাত্র একটিবারই সংঘটিত হতে পারে অনুরূপ একটি ঘটনা। বিস্ময়কর এই বিরাট অংককে সহজবোধ্য করবার জন্য এমনিভাবে সাজিয়ে নিলে অর্থাৎ ৬২৬,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০, ০০০,০০০ বার প্রচেষ্টা চালানোর পর আকস্মিভাবে সফলতা আসতে পারে মাত্র ১ বারই।

এই একই গাণিতিক ভিত্তিতে অবিরামভাবে আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে নিত্য নতুন তথ্য; আর এমনিভাবেই "কো-ইনসিডেন্স" বা 'ঘটনাচক্রের বিরুদ্ধে অনবরত বেড়েই চলেছে বিতর্ক।

ঘটনাচক্রের ধারাবাহিকতা বা আকস্মিকভাবে এই পৃথিবীতে জীবন সৃষ্টির অনুক্রম, অজ্ঞেয়বাদীরা যেমনটি আমাদেরকে বিশ্বাস করাতে তৎপর, এর চেয়ে

* বইটি সংগ্রহের জন্য রশীদ খলিফার ঠিকানা হচ্ছে ঃ Islamic Production 5937 Pima Street Tucson. AZ 85712 U.S.A.

অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ উল্লিখিত সংখ্যাটি। বিস্তৃত এই পৃথিবীতে জীবনের উদ্ভব, আর টিকে থাকার জন্য এখানে পূর্বাহ্নেই প্রয়োজন এমনিই কিছু দৈব ঘটনা ঃ

১. পৃথিবীকে অবশ্যই সাড়ে ২৩ ডিগ্রী ঝুঁকে থাকতে হবে তার অক্ষরেখার উপর।

২. পৃথিবীর চক্রাকারে আবর্তন অবশ্যই হতে হবে যথার্থ গতিবেগ সম্পন্ন।

৩. সূর্য থেকে অবশ্যই অধিক নিকটবর্তী বা অধিক দূরবর্তী হবে না পৃথিবীর দূরত্ব।

৪. চাঁদকেও অবশ্যই অবস্থান করতে হবে বর্তমান দূরত্বেই।

৫. আমাদের চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত গ্যাসের ব্যাপ্তি অবশ্যই থাকতে হবে বর্তমান অনুপাতেই ইত্যাদি ইত্যাদি।

জীবন ধারণের জন্য সম্ভাব্য উপাদানের প্রতিটি উপাদান ঠিক যেমনিভাবে পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন আমাদেরকে তা দৈবক্রমে সংঘটিত হতে পারে লক্ষ কোটির মধ্যে মাত্র ১টি বারই। কিন্তু কুরআনিক মোজেযার একটি মাত্র দৃষ্টিকোণ এই আকস্মিকতাকে উপস্থাপিত করেছে সেপ্‌টিলয়নে। আল্লাহ্‌র মহান এই বিস্ময়কর গ্রন্থের অন্যান্য দিকের আবিষ্কার এখনো করে যেতে হবে আমাদেরকে।

এই সর্বশেষ কুরআনিক আবিষ্কারের উদ্দেশ্যবা তাৎপর্য কী হতে পারে আমাদের নিকট—মুসলমানদের নিকট? আজকের পৃথিবীতে আমরা রয়েছি নব্বই কোটি মুসলমান কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন কাজেই লাগতে পারিনি আমরা। আসলে আমরা গণ্য হয়ে আছি একটি তৃতীয় শ্রেণীর জাতিরূপে। ইসলামী উম্মাহ্‌র পুনর্গঠনে যদি গঠনমূলকভাবে আমাদের সমস্ত পেট্রো ডলারও কাজে লাগাই তবুও রাশিয়া, চায়না বা আমেরিকার নাগাল পাওয়া সম্ভব হবে না আমাদের পক্ষে, এই মুসলমানদের পক্ষে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে, পারমাণবিক পদার্থ বিজ্ঞানে এবং মহাশূন্য গবেষণায় যদি আমরা এক ধাপ এগুই তো উপরোল্লিখিত জাতিসমূহ এগিয়ে থাকবে ১০ ধাপ। তাদের নাগাল পাওয়া কখনোই সম্ভব হবে না আমাদের পক্ষে। তাই বলে হতাশাগস্ত হওয়া উচিত হবে না আমাদের, এটা সত্য; কিন্তু আমাদেরকে হতে হবে বাস্তববাদী।

তথাপি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর অভ্রান্ত, নিখুঁত ও স্বচ্ছ -সাবলীল মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর দীনকেই (দীন অর্থ ঃ জীবন বিধান সাধারণত : ধর্ম হিসেবেই যা অনূদিত) শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন অন্যান্য দীনের উপর। মহান আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণা ঃ

هُوَ الَّذِيٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝

তিনিই পাঠিয়েছেন তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ, সকল দীনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য, যদিও মুশ্‌রিকগণ অপছন্দ করে তা।

— কুরআন ৬১ : ৯

এই একই অঙ্গীকার পুনরাবৃত্ত হয়েছে সূরাতুল "ফাত্‌হ" শরীফের ২৮ নং আয়াত শরীফে, সামান্য কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে ঃ

...... وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيدًا

.... এবং সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

পৃথিবীর হাস্যাস্পদ জাতি হিসেবে আমরা যখন পরিণত, তখন এইসব ভবিষ্যৎবাণী কার্যে পরিণত হবে কীভাবে? কীভাবে এই পৃথিবীদে প্রমাণ ও যুক্তির মাধ্যমে আমাদের দীনের ওপর নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী, খৃস্টান, কমিউনিস্ট ও অন্যান্য জাতির বিশ্বাস জন্মাতে আমরা সক্ষম হবো, যখন আমাদের সমস্ত সম্পদ আমরা অযথা অপব্যয় করে চলেছি নেহায়েত বাজে কাজে? যাই হোক, আমাদের বর্তমান বিষাদময় করুণ অবস্থা সত্তেও বিজয়ী আমরা হবোই। যাঁর কুদরতি হাতে রয়েছে অসীম ক্ষমতা, সেই সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহই কার্যকর করবেন এই অলৌকক ঘটনা।

.... وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ....

.... আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য ....

— কুরআন ৪ : ১২২

ইতিহাসে এটা বারবার নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে, কিভাবে আল্লাহ তাঁর পরিকল্পনাসমূহ কার্যকর করেন। ইসলামের পরশ নিয়ে অশ্লীলতার অন্ধকার থেকে মহত্তের স্বর্ণশিখরে আরব জাতির আকস্মিক উত্থানের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদানে সক্ষম নয় ইতিহাসবেত্তাগণ। টমাস কার্লাইল তাঁর প্রচলিত অননুকরণীয় পন্থায় বিষয়টি বর্ণনা করেছেন এইভাবে ঃ "পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে এর মরুভূমির বুকে

অগোচরে ঘুরে বেড়িয়েছে একটি নিঃস্ব যাযাবর জাতি ঃ (কেউ-ই তাদের প্রতি দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দেয়নি-মহামতি আলেকজান্ডার তাদেরকে লক্ষ্য করেননি, পারসীয়ানরা তাদেরকে লক্ষ্য করেনি, রোমানরা তাদেরকে লক্ষ্য করেনি। এই মুনষ্য জঞ্জাল- হবু বিজেতাদের সকলের কাছেই বিবেচিত হয়েছে একটা দারুণ দায় হিসেবে) "একজন মহান পয়গম্বরকে পাঠানো হয়েছিল এমন একটি বাণী দিয়ে যা তারা বিশ্বাস করতে পারতো ঃ লক্ষ্য করুন, অনাদৃত জাতি হলো আদৃত, অখ্যাত পরিণত হলো পৃথিবী খ্যাত জাতি হিসেবে; এর পর মাত্র একটি শতাব্দীর মধ্যে আরব হলো একদিকে গ্রানাডা আর অন্যদিকে পরিণত হলো দিল্লীতে; - শৌর্যে অত্যুৎকর্ষ আর প্রতিভার দীপ্তিতে ভাস্বর জজিরাতুল আরব পৃথিবীর এক বিরাট অংশ জুড়ে অনেকদিন পর্যন্ত রইলো আলোকোজ্জ্বল। ...... এই আরব জাতি, মানুষ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং একটা মহান শতাব্দী; যেন মনে হয়, পতিত হয়েছিল একটা স্ফুলিঙ্গ পৃথিবীর অনাদৃত অন্ধকারাচ্ছন্ন মরুভূমির বুকে পতিত হয়েছিল একটা অত্যুজ্জ্বল আলো। আর দেখুন, মরুভূমির সেই বালুকণা বিস্ফোরক পাউডার হিসেবে প্রমাণিত হয়ে আকাশচুম্বী তার আলোকচ্ছটা প্রসারিত করলো দিল্লী থেকে গ্রানাডা পর্যন্ত।" এগুলো তো হলো বন্ধুভাবাপন্ন সমালোচকের উক্তি, কিন্তু এগুলোকেই তুলনা করুন বিদ্বেষপূর্ণ একজন ইহুদীর উক্তির সাথে, চিকিৎসাশাস্ত্র রচনায় যিনি তাঁর সেমিটিক জ্ঞাতিভাইকে তীব্র বিদ্রূপাত্মক খোচায় জর্জরিত করেছেন- "উটচালক ও ছাগপালক বসেছে সীজারের সিংহাসনে।" কি নিগূঢ় সত্য ঘটনা বিবৃত হয়েছে ঘৃণামূলে। সেমিটিকদের প্রায় সকলেই ফিনিসীয়রা ইউরোপে গিয়েছিল বণিক হিসেবে, ইহুদীরা গিয়েছিল বন্দী হিসেবে, কেবল মাত্র আরবীয়রাই ইউরোপে গমন করেছিল রাজা হিসেবে।

এইভাবে আল্লাহ্ তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছেন অতীতে এবং তিনি অতি সহজেই পারেন সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে। স্মরণ করুন মঙ্গোলিয়াদের কথা, কিভাবে ইসলাম বশীভূত করেছে ইসলামী সাম্রাজ্য বিজেতাদের? প্রারম্ভিক বর্বরোচিত প্রচণ্ড আক্রমণের পর শতাব্দী ধরে ইসলামের যোগ্য রক্ষক ও ধারক হয়ে থাকার জন্য তারা পরিণত হয়েছে ইসলামের একনিষ্ঠ সেবকে।

দয়াময় আল্লাহ তাঁর প্রচণ্ড কুদরতী শক্তিবলে একটি জাতিকে মুহূর্তের মধ্যে অবনতির অতল গহবর থেকে গৌরবময় অবস্থানে উন্নীত করতে পারেন, সেই সব দৃষ্টান্তে ইতিহাস ভরপুর। অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য তাঁর অনন্ত কুদরতী শক্তির প্রতি

লক্ষ্য করুন। আজকের বৃহৎ শক্তিবর্গের হাতে,তাদের আনবিক অস্ত্র তাদের মহাশূন্য ক্ষেপণাস্ত্র, তাদের সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্র ও সাংগঠনিক নৈপুণ্য এবং তাদের সকল প্রকার গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ দ্বারা যদি তাঁর দীনকে তিনি ন্যস্ত করতে চান, তাহলে এতে বিস্ময়ের কিছুই থাকবে না। কিন্তু জীবন যুদ্ধে পরাজিত, দুর্বল, অক্ষম ও অবহেলিত জনগোষ্ঠি দ্বারা যদি পৃথিবীর ক্ষমতাশালী, উদ্ধত শাসকবর্গকে তিনি পরাভূত করতে চান, তবে অবশ্যই সেটা হবে একটা অলৌকিক ঘটনা।

সংগ্রামে বিশ্বমানবতাকে জয় করার জন্য আমাদের মুসলমানদের রয়েছে বিশেষ কিছু সুবিধ; সেই সুবিধা বন্দুক বা ডিনামাইটের সুবিধা নয়, সে সুবিধা বুদ্ধি দীপ্ত অস্ত্রের সুবিধা। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে দিয়েছেন কর্তৃত্ব। আমাদের তিনি দিয়েছেন একটি জীবন বিধান; অতপর আমাদেরকে আর কারুর কাছেই হাত পাততে হবে না। মানব জাতির প্রতিটি সমস্যারই সমাধান রয়েছে ইসলামে। প্রথমে, বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত সমর্থন আদায় করতে হবে অবিশ্বাসীদের কাছ থেকে, তাহলে আপনা-আপনিই আসবে অবশিষ্টাংশ - যেমন করে রাত্রির পরে আসে দিন। আমাদের প্রতিপক্ষের কাছে প্রমাণ করতে হবে। আল-কুরআন "আল্লাহরই অমোঘ বাণী"। নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করতে হবে, এর অলৌকিক পদবিন্যাস, যা কেবল মাত্র রচনা করতে সক্ষম সর্বশক্তিমান, সর্বদর্শী এক মহান সত্তা।

এক হাতে আল কুরআন আর অন্য হাতে তর্কবিজ্ঞান নিয়ে অবিশ্বাসীদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোই হবে আমাদের বড় কর্তব্য। মানবজাতির হৃদয় ও মন জয় করবার জন্য আসুন আমরা সামনে এগিয়ে যাই।

.... اُدْعُوْ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ....

.... তুমি আহবান কর (সবাইকে) তোমার প্রতিপালকের পক্ষে জ্ঞান দ্বারা ...

এবং জ্ঞানের দাবি এটাই যে,একটা সম্প্রদায়ের কাছে তাদের মানসিক পটভূমিকা ও অভিজ্ঞতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই রাখা উচিত আমাদের বক্তব্য। আমরা এখন বাস করছি কম্পিউটার যুগে। এই ঈন্দ্রজালিক জন্তুটি ছাড়া আমাদের সব অগ্রগতিই হয়ে পড়বে অচল। আমাদের বিমানসংস্থা, আমাদের ব্যাংকের কারবার, আমাদের টেলিফোন সংস্থা হয়ে পড়বে সম্পূর্ণ বিকল এই ভৃত্যটি ব্যতিরেকে, যে-ভৃত্য রূপান্তরিত হয়েছে প্রভুতে। মাত্র একদিনের জন্য যদি আমেরিকার টেলিফোনগুলো কম্পিউটারহীন করা হতো, তবে ১৮ থেকে ৪৫ বছরের প্রতিটি মহিলাকে নিয়োগ

করতে হতো এই একটি মাত্র সেবা-প্রতিষ্ঠানকে চালু রাখতে। এবং হস্তকৃত সরঞ্জামের আর কোন অস্তিত্বই থাকত না।

প্রত্যেকেই, সে এই কম্পিউটার দেখুক আর নাই দেখুক, এই যন্ত্রটির বিস্ময়করতা সম্বন্ধে শুধু জ্ঞাত আছে, তার-ই জীবন প্রভাবান্বিত হবে এর দ্বারা। এবং আশ্চর্যজনকভাবে সব সময়ই এটা প্রদান করে সঠিক উত্তর, হোক না তা খ্রিস্টান কিংবা অন্য ধর্মাবলম্বী অধিকৃত। আপনি যদি কম্পিউটারকে জিজ্ঞেস করেন, এমনকি আপনার নিজের পূর্ব ধারণা নিয়েও জিজ্ঞেস করেন, এক যোগ এক যোগ এক" কত হয়? সব সবই নির্ভুল উত্তর আসবে "তিন"। রোমান ক্যাথলিক স্বত্ত্বাধিকারী কম্পিউটারকে আপনি যদি প্রশ্ন করেন God the father, God the son এবং God the Holy Ghost কজন God বা ঈশ্বর? একটু লজ্জিত বা দ্বিধান্বিত না হয়ে সঙ্গে সঙ্গে এটা উত্তর দেবে "তিন"। এতটুকুও অনুভূতি বা সহানুভূতি লক্ষিত হবে না এর মালিকের প্রতি যিনি উত্তর প্রত্যাশা করেন "এক"।

পৃথিবীর শিক্ষিত জনগোষ্ঠির কাছে বক্তব্য রাখুন এমন ভাষায়, যে ভাষা তাঁরা বুঝতে পারেন: যথার্থ বিজ্ঞানের ভাষা– গাণিতিক ভাষায় তাদেরকে আহবান করুন। আল কুরআন এর অত্যাশ্চর্য অবিচ্ছেদ্য গাণিতিক বন্ধনের বৈশিষ্ট্য ও অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করুন তাদের সামনে দেখিয়ে দিন সব রকম মানবিক অন্যায় হস্তক্ষেপ থেকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কিভাবে রক্ষা করেছেন তাঁর মহা গ্রন্থ আল- কুরআনকে এবং চ্যালেঞ্জ করুন মহান গ্রন্থকার আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখেঃ

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ
بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ○

বল, যদি এই কুরআনের অনুরূপ আনয়নের জন্য মানুষের ও জ্বিন সমবেত হয়, এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে, তবুও তারা এর অনুরূপ আনয়ন করতে পারবে না। — কুরআন- ১৭ : ৮৮

কুরআনুল করীমের আধুনিক তথ্যানুসন্ধানের মাধ্যমে আমরা পেতে পারি নিম্নলিখিত ৫টি ফলাফল ঃ

১. ইস্‌লামের বিরুদ্ধাবাদীদের অন্তরে এটা সৃষ্টি করবে মহা আতংক।

২. এটা যে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করবে জুল্‌স মেসারম্যান বা মাইকেল হার্ট-এর মত যথার্থ ইহুদী ও খৃস্টানদের মনে, যারা ইসলাম সম্বন্ধে অনুকূল ধারণা পোষণ করে, মুহাম্মদ (সা)-এর প্রত্যাদেশের উৎস হলো সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, এবং আল-কুরআন আল্লাহরই অমোঘ বাণী, যা সংরক্ষিত রয়েছে যথার্থ অবস্থায়।

৩. এটা আরও দৃঢ় ও শক্তিশালী করবে মুসলমানদের বিশ্বাস, যারা ইতিমধ্যেই কুরআনুল করীমকে করেছে আল্লাহরই কালাম বা বাণী বলে।

৪. মুসলমানদের, এবং এই পবিত্র গ্রন্থের অনুসারীদের সর্বপ্রকার দীর্ঘস্থায়ী সন্দেহ দূর করবে এটা।

৫. এবং অবশেষে এটা উন্মোচিত করবে সেই সব হতভাগ্য ধর্মান্ধ ভণ্ডদের, যারা স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করেছে তাঁর পথনির্দেশ; আর সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাদেরই জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন নিকৃষ্টতম গন্তব্যস্থল-জাহান্নাম।

উপসংহারে, আমার বিনীত প্রার্থনা এটাই যে,পরম করুণাময় আল্লাহ তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট করুণা বর্ষণ করুন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর এবং মুসলমানদের অনুপ্রাণিত করুন তাঁর কৃপা ও শ্রদ্ধা অর্জনে, যা তিনি প্রদান করেছেন সবাইকে- যাঁরা কৃতজ্ঞতাভরে একাত্মতার সাথে করছে তাঁর ইবাদত।

আমিন!

وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ۰

কিন্তু আল্লাহ শীঘ্রই পুরস্কৃত করবেন কৃতজ্ঞদেরকে।

— কুরআন ৩ : ১৪৪

হযরত মুহাম্মদ (সা) হযরত ঈসা (আ)-এর স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী

অনুবাদ

ফজলে রাব্বী

সূচি

অধ্যায় এক

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي

مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ط

এবং আমার পরে আহম্মদ নামে যে রাসূল আসিবে আমি তাহার সুসংবাদদাতা।— কুরআন ৬১ : ৬

বহুমাত্রিক উত্তরাধিকার

উত্তরাধিকার বহুবিধ হতে পারে যেমন, ইহুদী আইনে উত্তরাধিকার প্রথম সন্তানের জন্মগত অধিকার; অথবা জ্যেষ্ঠ পুত্র বা কন্যার সিংহাসনে আরোহণের উত্তরাধিকার। অথবা একজন প্রার্থীকে অধিকাংশের ভোটে নির্বাচন; অথবা ধর্মীয়ভাবে, স্রষ্টার পছন্দ মত তাঁর নির্দেশে বার্তাবাহকের নিয়োগপ্রাপ্তি। যেমন ইব্‌রাহীম, মূসা, ঈসা অথবা মুহাম্মদ (সকলের উপর আল্লাহ্‌র শান্তি ও করুণা বর্ষিত হোক) এদের সকলের আহ্বান। তাঁরা সকলেই দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। হযরত ঈসা (আ)-এর উত্তরাধিকারী হবার বহুমুখী দাবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রয়েছে ঃ

১. সময়ানুক্রমিকভাবে ঐতিহাসিক দিক থেকে ঘটনা পরম্পরা হিসেবে।

২. আল্লাহ্ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে।

৩. তার পূর্বসূরিগণের ভবিষ্যদ্বাণীকে পরিপর্ণতা দানকারী হিসেবে।

৪. স্রষ্টার পথনির্দেশকে পরিপূর্ণতায় আনয়নের দ্বারা 'কারণ তিনি পথ দেখিয়ে তোমাদেরকে সত্যের পথে নিয়ে যাবেন।" (যীশু)

ঐতিহাসিকভাবে

হযরত মূসা (আ)-এর ১৩০০ বছর পর হযরত ঈসা (আ)-এর আগমন এবং তাঁর ছয় শতাব্দী পরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর শূন্য স্থান পূর্ণ করার জন্য পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন।

১ম হস্তীবর্ষের ১২ই রবিউল আউয়াল, ২৯ আগস্ট ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র মক্কা নগরীতে বর্বর আরব জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁর জন্মসাল হস্তীবর্ষকে স্মরণে রেখেছিল কারণ, শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মের দুই মাস পূর্বে ইয়েমেনে নিযুক্ত আবিসিনিয়ার রাজপ্রতিনিধি আবরাহা আল আশরাম বিশাল সৈন্যবাহিনীর অগ্রভাগে এক বিরাট হাতির পিঠে আরোহণ করে পবিত্র কাবা শরীফ আক্রমণ করতে আসে। এই ভয়াবহ দৃশ্য, তদুপরি সেই আক্রমণের অধিকতর ভয়াবহ পরিণতি তাদের স্মৃতি থেকে সহজে মুছে যাবার নয়। অলৌকিকভাবে আবরাহা ও তার বাহিনী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। এ বর্ণনা সূরা ফীলে রয়েছে।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۝

তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক হস্তী -অধিপতিদের প্রতি কী করে ছিলেন? তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থ করে দেননি? তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী প্রেরণ করেন, যারা তাদের উপর প্রস্তর-কংকর নিক্ষেপ করে। অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করেন।

— কুরআন ১০৫ : ১-৫

আল্লাহ্‌র মানদণ্ড

মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাঁর নিজের ইচ্ছামতো বার্তাবাহক নির্বাচন করেন।

তিনি তার নিজস্ব মানদণ্ডের ভিত্তিতে সে কাজ সম্পন্ন করেন। সেই মানদণ্ড সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা নাও থাকতে পারে। এই অস্বাভাবিকতার জন্য সাধু পল ক্রন্দন করেছেন :

কেননা ইহুদীরা চিহ্ন চায় এবং গ্রিকেরা জ্ঞানের অন্বেষণ করে।

— ১ করিন্থিয়ান ১ : ২২

কিন্তু পার্থিব জ্ঞানে জ্ঞানী পল অনুধাবন করলেন যে ইহুদীদের নিকট তার জ্ঞান **'এক অনতিক্রম্য পর্বত'** এবং গ্রিকদের নিকট নিছক **'মূর্খতা'**।

আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ)-কে বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন পলায়নপর ও তোতলা। বাইবেলে তাকে বলা হয়েছে **'অচ্ছিন্নত্বক ওষ্ঠ'** বিশিষ্ট একজন মানুষ।

সকল প্রকার অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তাকে যখন পৃথিবীর নৃশংসতম জালিম ফেরআউনের সম্মুখীন হতে বলা হলো, তখন তিনি আল্লাহ্‌র নিকট করুণা প্রার্থনা করে বললেন ঃ

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ۝ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۝ هَارُونَ أَخِي ۝ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ۝ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ۝ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ۝ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ۝ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ۝ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ ۝

মূসা বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও। এবং আমার কর্ম সহজ করে দাও। আমার জিহবার জড়তা দূর করে দাও, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। আমার জন্য করে দাও একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনদের মধ্য হতে আমার ভাই হারুনকে; এর দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় কর ও তাকে আমার কর্মের অংশীদার কর। যাতে আমরা তোমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি প্রচুর এবং তোমাকে স্মরণ করতে পারি অধিক। তুমিই তো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা।' তিনি বললেন, 'হে মূসা! তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেওয়া হল।— কুরআন ২০ : ২৫-৩৬

যেমন ধরা হতো—কেন?

তারপর আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত বান্দা হিসেবে প্রেরণ করলেন হযরত ঈসা (আ)-কে। তাঁর পেশা ছিল কাঠমিস্ত্রী, এ পেশা ছিল তার পিতারও। গসপেলে তাঁর যে বংশক্রম লিপিবদ্ধ হয়েছে তা সন্দেহজনক–

"আর যীশু নিজে, যখন তিনি কার্য করেন, কমবেশ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক ছিলেন, (যেমন ধরা হতো)* যোসেফের পুত্র"- লুক ৩:২৩

বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান বিশ্বাস করে যে হযরত ঈসা (আ)-এ জন্ম অলৌকিকভাবে হয়েছিল, যেখানে কোন পুরুষ মানুষের প্রয়োজন হয়নি। যার কোন পিতা পিতামহ বা পূর্বপুরুষ ছিল না অথচ ঈসা (আ)-এর অনুসারীরা তার পূর্বপুরুষের দুটি পৃথক বংশতালিকা প্রণয়ন করেছে। মথি ও লূক তাদের গসপেলে এই মহান পয়গম্বরের ছেষট্টি জন পিতৃপুরুষ ও পিতামহের নাম সংগ্রহ করেছে। একটি নাম 'কাঠমিস্ত্রী জোসেফ' এ নাম পৃথক দু'টি তালিকাতেই স্থান পেয়েছে। অথচ এ নামটি কোথাও খাপ খায় না, কারণ তিনি **'ধরা যেতে পারে'** যীশুর পিতা ছিলেন।

বিশপদেরও সন্দেহ রয়েছে

১৯৮৪ সালের জুন মাসে আয়োজিত এ্যাঙ্গলিকান বিশপদের এক আকস্মিক জরিপে প্রকাশিত হয়েছে যে, ৩৯ জন বিশপের মধ্যে ৩১ জন মনে করেন 'যিশুর অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম, যীশুকে কুমারী মরিয়মের অলৌকিকভাবে গর্ভে ধারণ এবং সমাধি থেকে যীশু খ্রিস্টের উত্থান বাইবেলে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবে হয়ত তা ঘটেনি'।

স্কটল্যান্ডের চার্চ ইংল্যান্ডের চার্চের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে তাঁদের সাম্প্রতিকতম প্রকাশিত **"বিশ্বাসের বিবরণী"** হতে কুমারী মরিয়মের যীশু অলৌকিকভাবে গর্ভে ধারণ এই কথাটির কোন প্রকার উল্লেখ অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বাদ দিয়েছে। কুমারী মরিয়মের যীশুকে অলৌকিকভাবে গর্ভে ধারণ বিষয়টি পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান জগতে ক্রমশ উত্তপ্ত আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হচ্ছে।

*বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত পবিত্র বাইবেল : পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়ম গ্রন্থে (যেমন ধরা হইত) এভাবেই আছে। কিং জেমস এর ইংরেজি অনুবাদে আছে as was supposed.

দি ডেইলি নিউজ

ডারবান, মঙ্গলবার. মে ২২,১৯৯০

স্কটল্যান্ডের চার্চ কর্তৃক কুমারীর জন্মদানের বিষয়টি পরিত্যক্ত

লন্ডন ঃ চার্চের সদস্যদের মধ্যে সম্ভাব্য বিরোধ এড়াবার জন্য স্কটল্যান্ড চার্চ হতে সম্প্রতি প্রকাশিত **'বিশ্বাসের বিবরণীতে** কুমারী মরিয়মের যীশুকে অলৌকিকভাবে গর্ভে ধারণ বিষয়টি সরাসরি উল্লেখ বাদ দেয়া হয়েছে।

বিশেষ কার্যকর দলের সচিব শ্রদ্ধেয় ডেভিড বেকেট বলেন, এই বক্তব্য বাদ দেয়ার ফলে ঐতিহ্যবাহী এ্যাঙ্গলো ক্যাথলিক চার্চের ধর্মতত্ত্ব থেকে স্কটল্যান্ডের চার্চ দূরে সরে যাবে এবং ডারহামের বিশপ ডেভিড জেনকিনস যিনি ইংল্যান্ডের চার্চের উদার মতবাদের হোতা তার দিকে নিয়ে যাবে।

প্রকাশিত এই নতুন দলিলটি নিয়ে এডিনবরায় অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় স্কটল্যান্ডে চার্চের বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। ১৬৪০ সালে রচিত ওয়েস্টমিনিস্টার স্বীকারোক্তির ভাষা আধুনিকীকরণ করতে গিয়ে নির্বাচিত ধর্মবিশেজ্ঞষগণ এই সুযোগে যীশুকে কুমারী মরিয়মের অলৌকিকভাবে গর্ভে ধারণ বিষয়টির সংস্কার সাধন করেন।

মি. বেকেট বলেন, আমরা এভাবে বিবৃতিটি প্রণয়ন করতে চেয়েছি যাতে সেটি সকলের গ্রহণযোগ্য হয় এবং বিভেদ সৃষ্টি না করে। কুমারী মরিয়মের যীশুকে অলৌকিকভাবে গর্ভে ধারণ বিষয়টি যারা ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে গ্রহণ করেন, কেবল তারাই নয়, চার্চের অপর সকলেই যারা এই বিষয়টিকে প্রধানত ধর্মীয় চিত্রকল্প রূপে বিবেচনা করেন, তারাও যাতে গ্রহণ করেন আমরা সেভাবেই বিবৃতিটি প্রণয়ন করেছি। নেতৃস্থানীয় পুরোহিতগণ দাবি করেন যে, এর দ্বারা ওয়স্টেমিনিস্টার স্বীকারোক্তিকে পরিবর্তিত করা হয়নি, কেবল সংক্ষেপণ ও আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।

আর আল্লাহ্ ঈসা (আ)-কে পছন্দ করলেন

হযরত ঈসা (আ) যদিও আধ্যাত্মিক দিক থেকে জ্ঞান, আলো ও সততায় অনেক ধনবান ছিলেন তথাপি বিশ্বের তাবত ভিক্ষুকদের সম্পর্কে হালকাভাবে যখন বলেন :

"তখন একটি স্ত্রীলোক শ্বেত প্রস্তরের পাত্রে বহুমূল্য সুগন্ধি তেল নিয়ে তার নিকট এলো, এবং তিনি ভোজনে বসলে তার মস্তকে ঢেলে দিল।

কিন্তু তা দেখে শিষ্যেরা বিরক্ত হয়ে বললেন এ অপব্যয় কেন?

এগুলো তো অনেক টাকায় বিক্রয় করে তা দরিদ্রদের দিতে পারা যেত।

কিন্তু যীশু তা বুঝে তাঁদেরকে বললেন,.... কেননা দরিদ্ররা তোমাদের কাছে সর্বদাই আছে, কিন্তু তোমরা আমাকে সর্বদা পাবে না।" মথি (২৬ : ৭-১১)

কিন্তু দুর্গতি যখন অপলক চোখে তাঁর দিকে তাকিয়েছিল, যখন দারিদ্র্য, অর্থকষ্ট ও অভাব তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠ জড়িয়ে ধরেছিল তখন তিনি করুণ স্বরে আর্তনাদ করে বলেছিলেন :

যীশু তাকে বললেন, শৃগালের গর্ত আছে এবং আকাশের পক্ষীদের বাসা আছে, কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মস্তক রাখবার স্থান নেই।- মথি (৮ : ২০) এবং লুক (৯ : ৫৮)

তথাপি আল্লাহ্ তা'আলা তাকেই (ঈসা আ) মনোনীত করলেন : কী অসাধারণ রহস্যময় আল্লাহ্ তোমার মহিমা!

একজনকে মুস্তফা বা অনুগত মনোনীত করা

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

তিনি উম্মিদের মধ্যে তাদের একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূলরূপে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াত, তাদের পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।

— কুরআন ৬২ : ২

মনে হতে পারে রহস্যময়, অতি আশ্চর্যজনক কিন্তু হতবাক হই না, বিস্মিত হই না; কারণ এটাই তাঁর পদ্ধতি। তিনি তাই নিরক্ষর উম্মি জাতির জন্য উম্মি (অক্ষরজ্ঞানহীন) পয়গম্বর মনোনীত করেন।

"এক দরিদ্র মেষ পালক জাতি সকলের অগোচরে সৃষ্টির প্রথম হইতে মরু প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। যাহাকে কেহই চিনিত না সে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। একটি ক্ষুদ্র জাতি বিশ্বের মহত্তম জাতি হইল। মাত্র এক শতাব্দীকাল পরে আরব জাতি এক দিকে গ্রানাডা ও অপর দিকে দিল্লী পৌঁছাইল। শৌর্যে-বীর্যে, পরাক্রমে, সাহসে, দীপ্তিতে এবং জ্ঞানের গরিমার আলোক সহসা ঝলসাইয়া উঠিয়া বিশ্বের এক বিশাল ভূখণ্ড জুড়িয়া আরব সভ্যতা জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতে লাগিল। বিশ্বাসই মহাশক্তি, প্রাণ সঞ্চারণী। একটি জাতির ইতিহাস তখনই ফলপ্রসূ হয়, যখন সে বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়। তখন সে জাতি মহাজাতি হয়, আত্মা উদ্দীপক হয়। এই আরব জাতি, একজন মানুষ মুহাম্মদ এবং একটি

শতাব্দী-মনে কি হয় না যে একটি স্ফুলিঙ্গ আসিয়া পড়িল? একটি স্ফুলিঙ্গ কী কৃষ্ণকায় বালুকাময় পৃথিবীতে আসিয়া স্পর্শ করিল, এবং অকস্মাৎ সেই বালুকারাশি বিস্ফোরকে পরিণত হইল, আকাশ স্পর্শ করিল, দিল্লি হইতে গ্রানাডা পর্যন্ত জ্বলিয়া উঠিলো। আমি বলি,মহামানব সর্বদাই আকাশের বিদ্যুতের মত আর অপর সকল মানুষ জ্বালানির মত অপেক্ষমাণ তার স্পর্শে দাউ দউ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে।"

বিগত শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ থমাস কার্লাইল এভাবেই তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করেন। সেদিন ছিল শুক্রবার ৮মে ১৮৪০। বক্তব্যের বিষয় ছিল মহানায়ক রাসূল। তাঁর শ্রোতারা ছিলেন ইংরেজ খ্রিস্টান।

মনোনীত জাতি

আল্লাহ্ তাঁর বার্তাবাহককে বেছে নেন, বেছে নেন তাঁর পছন্দমত কোন জাতিকে। হযরত মূসার সময়ে আধ্যাত্মিকভাবে ইহুদীদের উৎকর্ষ থাকা সত্ত্বেও হযরত মূসা (আ) তার স্বজাতির বিরুদ্ধে ক্রন্দন করে বলেছিলেন।

তোমাদের সাথে আমার পরিচয়-দিন অবধি তোমরা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধাচারী হয়ে আসছ। দ্বিতীয় বিবরণ ৯ : ২৪

হযরত মূসা (আ)-এর সর্বশেষ ইচ্ছাপত্রে ইসরাইলীগণ তাদের 'দুর্বল ও ভদ্র' পয়গম্বরকে হতাশ করেছিল এবং তাঁকে বাধ্য করেছিল আল্লাহ্‌র নির্দেশের প্রতি তাদের কঠোর ও জেদী মনোভাবের জন্য তীব্র নিন্দা করার-

সেই স্থানে থাকবে। কেননা তোমার বিরুদ্ধাচারিতা ও তোমার শক্তিশালী গ্রীবার কথা আমি জানি; দেখ, তোমাদের সাথে আমি জীবিত থাকতেই অদ্য তোমরা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধাচারী হলে, তবে আমার মরণের পরে কিই বা না করবে?- দ্বিতীয় বিবরণ (৩১ : ২৭)

কী আশ্চর্য সত্য! আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে আমি দার্শনিক তত্ত্ব দ্বারা আবৃত করতে চাই না কিন্তু ঠিক তার পরের অনুচ্ছেদে ঈশ্বরের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। তিনি ইহুদীগণকে উচ্চকণ্ঠে তিরস্কার করে বলেন-

তারা অনীশ্বর দ্বারা আমার অন্তর্জ্বালা জন্মাল, স্ব-স্ব অসার বস্তু দ্বারা আমাকে অসন্তুষ্ট করল; আমিও নজাতি দ্বারা তাদের অন্তর্জ্বালা জন্মাব, মূঢ় জাতি দ্বারা তাদেরকে অসন্তুষ্ট করব। দ্বিতীয় বিবরণ– (৩২ : ২১)

ইহুদীগণের বিকল্প

যার সামান্যতম আধ্যাত্মিক জ্ঞান আছে, তিনি ধারণা করতে সক্ষম হবেন যে, কারা এই বর্ণবাদী, জাতি-বিদ্বেষী? জেদী ইহুদীদের দৃষ্টিতে **'অমানুষ'** -যার কোন

অস্তিত্ব নেই এবং **'নির্বোধ জাতি** তারা কারা? তাদেরই ইসমাইলি চাচাতো ভাই? আরবরা? কার্লাইলের ভাষায়- **"সৃষ্টির আদি কাল হতে মরুভূমিতে সবার অলক্ষ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল?"**

আরব জাতি : মহাবীর আলেকজান্ডার তাঁদেরকে উপেক্ষা করে চলে গেলেন,পারশিকরাও তাদেরকে উপেক্ষা করে চলে গেল, মিশরীয়রা তাদেরকে উপেক্ষা করে চলে গেল এবং রোমকরাও তাদেরকে লক্ষ্য না করে চলে গিয়েছিল। তাদেরকে জয় করা বা অধিকার করা হতো এক চরম বোঝা। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে উপেক্ষা করলেন না। তিনি তাদেরকে অন্ধকারের গভীরতম তলদেশ থেকে তুলে আনলেন এবং তাদেরকে বানালেন আলোকবর্তিকা বাহক, বিশ্বের জ্ঞানের দিশারী। **'আমি তাদেরকে (ইহুদী) ঈর্ষাপরায়ণতায় নিয়ে যাব।'** এই ঈর্ষা এক প্রকার পরিমার্জিত রোগ। স্মরণ করুন আল্লাহ্র বন্ধু ইবরাহীমের দুই স্ত্রী ছিলেন - সারাহ ও হাজেরা। সারাহর ঈর্ষা তাঁর সন্তানদের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে বংশানুক্রমে সমগ্র জাতির মধ্যে ও যাদের জন্ম হয়নি তাদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে।

অল্প কিছুদিন পূর্বে একজন ইহুদী চিকিৎসাবিজ্ঞানীর লেখা একটি বই পড়েছিলাম। দুঃখের বিষয় বইটির নাম ও লেখকের নাম কিছুই আজ আমার স্মরণে নেই। তবে মনে আছে তিনি যে ভাষায় তার সেমেটিক (আরব) চাচাতো ভাইদের প্রশংসা করেছিলেন, সে কথাগুলো ভুলবার নয়। তিনি বলেছিলেন :

ছাগলের পাল ও উট চালক, সিজারের সিংহাসনে আরোহণ করেছে।

কথাগুলোর মধ্যে রয়েছে চরম ঘৃণা, বিষাদগার ও ব্যঙ্গ! তথাপি কত সত্য কথা! আল্লাহ সত্যিই তাই করেছিলেন। আল্লাহ্ তাই করেন; তিনি যাকে ইচ্ছে সম্মানিত করেন। তিনি কি করতে পারেন তা দেখানোর জন্য করেন।

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۙ

ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ۝

যদি তোমরা বিমুখ হও তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মত হবে না।— কুরআন ৪৭ : ৩৮

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অলৌকিক ঘটনা সম্ভবত এটাই যে আরবের প্রতিকূল পরিস্থিতি লঙ্ঘন করে একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহচর, তার পর মাত্র কয়েক দশকের ব্যবধানে পিরেনিজ পর্বত হতে আরম্ভ করে চীন দেশের দোরগোড়া পর্যন্ত বিস্তৃত এক নতুন সভ্যতার সৃষ্টি করবে। (আবদুল ওয়াদুদ শালাবি: "ইসলাম জীবনের ধর্ম")

সর্বশেষ সাবধান বাণী

মানব জাতিকে আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনার যোগ্যতা হতে ইহুদী জাতির অপসারণ সম্পর্কে যীশু খ্রিস্টের (ইহুদী জাতির সর্বশেষ পয়গম্বর) নিজের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণ বাস্তবায়ন ছিল পূর্বোল্লিখিত সত্য। প্রভুর নিজের কথা :

এই জন্য আমি তোমাদিগকে (ইহুদী) বলছি, তোমাদের (ইহুদী) নিকট হতে ঈশ্বরের রাজ্য কেড়ে নেয়া যাবে, এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হবে, যে জাতি তার ফল দেবে। - মথি (২১ : ৪৩)

অধ্যায় দুই

প্রভুর ভাষায় একটি ভবিষ্যদ্বাণী

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ
مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ
مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ط

স্মরণ কর,মরিয়ম-তনয় ঈসা বলেছিল, 'হে বনী ইসরাইল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আমার পূর্ব হতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সমর্থক এবং আমার পরে আহ্‌মদ নামে যে রাসূল আসবে আমি তার সুসংবাদদাতা।" — কুরআন ৬১ : ৬

একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য

এক নজরে একবার উপরের আয়াতগুলো দ্রুত পাঠ করলেই যে কোন মুসলমান বিশ্বাস করবে যে ঈসা (আ) সত্যই আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। খ্রিস্টানরা তাদের একচোখা দৃষ্টিভঙ্গি, গোয়ার্তুমি ও তথাকথিত আত্মশ্লাঘার জন্য আপন অন্তর্দৃষ্টি অনুধাবন করতে পারে না। এবং আপন বিবেকের কথা শ্রবণ করে না, যা একান্তই বাস্তব সত্য সেই সত্যকে সে দেখতে পায় না, তখন মুসলমানরা বিব্রত না হয়ে পারে না।

অপরপক্ষে, একজন খ্রিস্টান হতবাক হয়ে দেখে অসাধারণ সৃষ্টিশীল প্রতিভালব্ধ জাতি ইহুদীরা তাদের নিজেদের পুরাতন নিয়ম বাইবেলে মসিহর আগমনের এক হাজার একটা ভবিষ্যদ্বাণী থাকা সত্ত্বেও তাদের ত্রাণকর্তা মহাপ্রভুকে পাষাণ হৃদয়ের গোয়ার্তুমির জন্য অনুধাবন করতে অক্ষম। তারা উভয়েই কি কিছুটা অন্ধ নয়?

না, ইহুদী ও খ্রিস্টান উভয়ই সত্য অনুধাবন করতে অসমর্থ নয়। সমস্যা একটাই আমরা সকলেই শৈশবকাল হতেই পর্যাপ্ত জ্ঞান ও অবিজ্ঞতা অর্জনের পূর্বেই মন স্থির করে ফেলি। আমেরিকানরা যাকে বলে প্রোগ্রামড (Programmed) হওয়া।

নিছক আয়াত পাঠ, ওয়াজ বা বক্তৃতা শোনার পর মনে মনে যেভাবে যথেষ্ট জেনেছি তার পক্ষে সত্য প্রচার সহায়ক হবে না। এই যুগটা হচ্ছে এভরিম্যান (Everyman) সিরিজের যুগ, যে সিরিজে ঘরে বসে সব কিছু শেখার বই প্রকাশিত হয়। পেশাদারী যুগের অবসান হয়েছে। উপরোক্ত আয়াতগুলো আগের ও পরের কোটেশনসহ মুখস্থ করতে হবে যাতে কোন অমুসলমানের সঙ্গে বাক্যালাপ কালে যথেষ্ট যৌক্তিকতার সঙ্গে বাক্যালাপ করা সম্ভব হয় এবং আমাদের দীনকে তাদের নিকট উপস্থাপন করা যায়, দাওয়াহর কোন সংক্ষিপ্ত পথ নেই।

প্রমাণ দেখাতে হবে

আপনি সম্ভবত এই প্রথম পাঠ করেছেন, তাই নয় এর আগেও হয়তো পাঠ করে থাকবেন যে ইহুদীদের ও খ্রিস্টানদের কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জিলে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। সম্ভবত এ কথা সত্য যে আপনি হয়তো কোন সময় বাইবেলে আমাদের নবী করীম কি বলেছেন তা জানতে কিছুটা চেষ্টাও করেছেন, কিন্তু যখন প্রমাণ চাওয়া হয়েছে, আপনি কোন তথ্য উপস্থাপন করতে পারেননি। কারণ আপনি যথেষ্ট চেষ্টা করেন নি, কাজও করেননি। মনে রাখতে হবে, কঠোর পরিশ্রমের বিকল্প নেই। আমি যা বলি আমি তা বিশ্বাস করি এবং আমি যা প্রচার করি তা অনুশীলন করি।

ব্যক্তিগতভাবে বাইবেলের বিভিন্ন অংশ বাছাই করে বিভিন্ন ভাষায় তা মুখস্থ করেছি, এমন কি আরবি ও হিব্রু বাইবেল থেকেও মুখস্থ করেছি। লোক দেখানোর জন্য নয় বরং ধর্মের এই সব টুকিটাকি বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের নিকট আমার বিশ্বাসকে প্রচার করার সুযোগ করে দেয় বলে। মানুষের হৃদয় স্পর্শ করার জন্য ভাষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

ফেরাউনের দেশে

একবার অনেক আশ্বাস পাওয়া সত্ত্বেও কায়রো বিমান বন্দরে এসে প্রবেশ ভিসার অভাবে আটকা পড়ে রইলাম। আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ভদ্রলোক

দয়াপরবশ হয়ে আমার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা চালিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রায় হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন এবং শুক্রবারের জুমার নামাজের সময় হয়ে পড়ায় আমাকে ও আমার পুত্র ইউসুফকে এক মিশরীয় অল্প বয়স্কা মহিলার হাওলা করে চলে গেলেন। মহিলা ইউরোপীয় পোশাকে শোভিত। বেশ কিছু সময় চেষ্টা তদ্বির করার পর মহিলা এসে বললেন, 'দিন, চল্লিশটি ডলার দিন'। আমি প্রশ্ন করলাম 'কেন'? মহিলা উত্তর দিলেন, 'ভিসার জন্য'। আমার জন্য বিশ ডলার আর আমার পুত্রের জন্য বিশ ডলার দিতে হবে। আমি আপত্তি জানিয়ে বললাম, আমি যেহেতু সরকারি দাওয়াতে সরকারি মেহমান হিসেবে এসেছি আমার কেন ফিস লাগবে। মহিলা জানালেন, তিনি সেসব কিছু জানেন না, ভিসার জন্য এই ফিস আমাকে দিতে হবে। বাধ্য হয়ে স্মিত হাসি হেসে মহিলার হাতে চল্লিশটি ডলার তুলে দিলাম।

মহিলার কথাবার্তায় আচরণে আমি অনুধাবন করতে পেরেছিলাম, মহিলা উচ্চ শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান। তাই নির্ভয়ে আমার ভাঙ্গা ভাঙ্গা আরবি ভাষায় তার নাম জানতে চাইলাম। তার নামটি মনে রাখবার মতই নতুন। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কি মুসলমান?' তিনি বললেন, 'না, আমি মিশরীয় খ্রিস্টান। এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম । বললাম, 'যীশু খ্রিস্ট ইহজগত পরিত্যাগের পূর্বে তার শিষ্যদের উদ্দেশ্য করে কি বলেছিলেন তা কি আপনি জানেন?'

এ কথা বলেই আমি চোস্ত আরবিতে বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি মুখস্থ আবৃত্তি করে তাকে শুনালাম। এই প্রকার সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য আমি আরবি বাইবেলের বিশেষ বিশেষ অংশ আগে হতেই মুখস্থ করে রেখেছিলাম।

لكني أقول لكم الحق
إنه خير لكم أن أنطلق.
لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي.
ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. إنجيل يوحنا ١٦
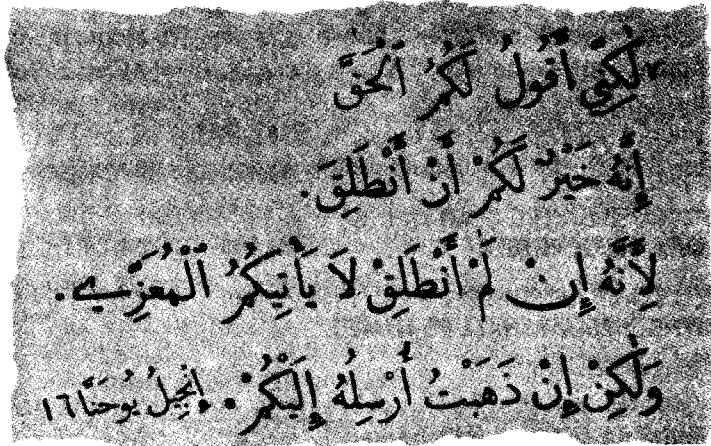
অনুবাদ :

বাইবেলের যে অংশ তাঁকে পাঠ করে শুনালাম তার আর ইংরেজি অনুবাদ প্রয়োজন হলো না। কারণ, মহিলার মাতৃভাষা আরবি। আমার পাঠকদের সুবিধার্থে সেই অংশ

ইংরেজি বাইবেল থেকে তুলে দিলাম। সেটিও আমি অবসর সময়ে কষ্ট করে মুখস্থ করে নিয়েছিলাম। পাঠক, আপনারও যদি আল্লাহ্‌র দীনের প্রতি ভালবাসা থাকে এবং আপনিও যদি মনে করেন অন্যরাও এই দীনের অংশীদার হোক তাহলে আপনিও এজন্য অবসর সময় বের করে নিতে পারেন।

তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে সেই সহায় তোমাদের নিকট আসবেন না : কিন্তু আমি যদি যাই তবে তোমাদের নিকটে তাকে পাঠিয়ে দেব। - যোহন (১৬ : ৭)

আল মুউজ্জি অর্থাৎ সহায়

আমার মুসলমান ভাইদের নিকট অনুরোধ করছি তারা যেন উপরের উদ্ধৃতি আরবি ইংরেজি উভয়ই, সম্ভব হলে অন্য ভাষায় অনুবাদসহ মুখস্থ করে নেন। তাহলে ইসলাম প্রচারে সামগ্রিকভাবে সুবিধা হবে। ইংরেজিতে বলা হয়েছে কমফরটার (Comforter), বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে সহায় এবং আরবিতে = আল মুউজ্জি। আমি ভদ্র মহিলাকে প্রশ্ন করলাম, এই সহায় = আল মুউজ্জি কে যার সম্পর্কে বাইবেলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে? মহিলা অহেতুক সময় ক্ষেপণ না করে বললেন যে তিনি জানেন না। তখন আমি বললাম 'আমাদের কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, যে ঈসা (আ) তাঁর শিষ্যদেরকে বলেছিলেন :

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ؕ

এবং আমার পরে আহ্‌মদ নামে যে রাসূল আসবে আমি তার সুসংবাদদাতা।— কুরআন ৬১ : ৬

আমি আরো বললাম, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অপর নাম আহ্‌মদ এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই মুউজ্জি'।

তখন তিনি বলে উঠলেন, 'ভারি আশ্চর্য! মিশরীয় কত মুসলমান আমাকে সিনেমায় নিয়ে যায়, নাচের পার্টিতে নিয়ে যায়, কিন্তু কেউ কখনো এই **মুউজ্জি** বিষয়ে কিছুই বলেনি'।

অতঃপর কায়রো বিমান বন্দর ত্যাগ করার পূর্বেই মনে হলো আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা আমাকে এই মহিলার মাধ্যমে সাত সের ওজনের হাতুড়ি দিয়েছেন যথাযোগ্য জায়গায় আঘাত করার জন্য। আলহামদুলিল্লাহ্! আমি সেই হাতুড়ি ঠিকই ব্যবহার করেছিলাম।

বাইবেলের যোহন অধ্যায়ের ১৬ : ৭ সহায়/মুউজ্জি এবং কুরআন শরিফের ৬১ : ৬ আহমাদ/মুহাম্মদ -এর একটি সমন্বিত ব্যাখ্যা বর্তমান অধ্যায়ের প্রারম্ভে যে আয়াত দেয়া হয়েছে সেটি ব্যাখ্যা করার সময় উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত করা হবে।

বাইবেলের স্বীকৃতি

মনে রাখতে হবে যে, খ্রিস্ট ষষ্ঠ শতকে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াস সালাম আল্লাহ্‌র বাণী যা ক্রমান্বয়ে তার মুখে দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি তা উচ্চারণ করছিলেন তখন কোন আরবি বাইবেল ছিল না কারণ তখনও বাইবেল আরবি ভাষায় অনূদিত হয়নি। তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না যে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী পূর্বসুরীর -ঈসা (আ)-এর উচ্চারিত বাণী পরিপূর্ণ ও নিশ্চিতভাবে স্বীকৃতি জানাচ্ছেন।

যীশু কেবলমাত্র ইহুদীদের জন্য

এই বারোজনকে যীশু প্রেরণ করলেন, আর তাদেরকে এ আদেশ দিলেন তোমরা পরজাতির পথে যেয়ো না, এবং শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করো না; বরং ইসরাইল কুলের হারানো মেষদের কাছে যাও।

— মথি (১০ : ৫-৬)

কুকুরের জন্য নয়

"আর দেখ কনানীয় একজন স্ত্রীলোক এসে বলে চেঁচাতে লাগল, হে প্রভু! দাউদ সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন, আমার কন্যাটা ভূতগস্ত হয়ে অত্যন্ত ক্লেশ পাচ্ছে। কিন্তু তিনি তাকে কিছুই উত্তর দিলেন না। তখন তার শিষ্যেরা নিকটে এসে নিবেদন করলেন, একে বিদায় করুন, কেননা এ আমাদের পেছনে পেছনে চেঁচাচ্ছে। তিনি উত্তর করে বললেন, ইসরাইল কুলের হারানো মেষ ছাড়া আর কারো নিকটে আমি প্রেরিত হইনি। কিন্তু স্ত্রীলোকটি এসে তাকে প্রণাম করে বলল, প্রভু আমার উপকার করুন। তিনি উত্তরে বললেন, সন্তানদের খাদ্য নিয়ে কুকুরদের কাছে ফেলে দেয়া ভাল নয়।" — মথি (১৫ : ২২-২৬)

এই ইহুদী পয়গম্বর অর্থাৎ ঈসা (আ)-এর বড় গুণ ছিল যে তিনি যা প্রচার করতেন তাই তিনি নিজে অনুশীলন করতেন। তাঁর জীবনকালে তিনি কখনও একটিও অইহুদীকে ধর্মান্তরিত করেন নি। বাছাই করে তিনি যে বারোজনকে তার শিষ্য করেছিলেন তিনি তাদের বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে নিয়েছিলেন তারা তার স্বজাতি, যেন তার অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক হয়। **"তোমরা যত জন আমার পশ্চাদগামী হয়েছ, পুনঃসৃষ্টিকালে যখন মনুষ্য পুত্র আপন প্রতাপে সিংহাসনে বসবেন, তখন তোমরাও দ্বাদশ সিংহাসনে বসে ইসরাইলদের দ্বাদশ বংশের বিচার করবে।"**

— মথি ১৯ : ২৮

নতুন কোন ধর্ম নয়

২. আমার পূর্বে আগত তাওরাত (আইন) নিশ্চিতকরণ।

ইহুদীদের মধ্যে মসিহ মধুরভাষী পয়গম্বর ছিলেন না। তাঁর পূর্ববর্তী নবী আমস, জেইকল অথবা ঈসাইয়াহ্ -র ন্যায় ইহুদীদের আনুষ্ঠানিকতা ও মোনাফেকির বিরুদ্ধে তাঁর ভাষা ছিল তীক্ষ্ম মর্মভেদী। তাঁর প্রস্তাবনার অভিনবত্ব জঙ্গী প্রচারণা ধর্মীয় পৌরহিততন্ত্রের মধ্যে আশঙ্কার সৃষ্টি করেছিল। তাদের ধর্মীয় পুরোহিত ও উপ-পুরোহিতরা বারম্বার তার নিকট এসে তাঁর যথার্থতা পরীক্ষা করে দেখেছে। তিনি বলেছেন :

মনে করো না যে আমি ব্যবস্থা ভাববাদি গ্রন্থ লোপ করতে এসেছি, আমি লোপ করতে আসি নি। কেননা আমি তোমাদেরকে সত্য বলছি, যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হবে, সে পর্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হবে না, সমস্তই সফল হবে।

অতএব যে কেউ এসব ক্ষুদ্রতম আজ্ঞার মধ্যে কোন একটি লঙ্ঘন করে ও লোকদেরকে সেরূপ শিক্ষা দেয়, তাকে স্বর্গরাজ্যে অতি ক্ষুদ্র বলা যাবে; কিন্তু যে কেউ সেসব পালন করে ও শিক্ষা দেয় তাকে স্বর্গরাজ্যে মহান বলা যাবে। — মথি ৫:১৭-১৯

বর্তমান অধ্যায়ের প্রারম্ভে কুরআন শরীফের আয়াতগুলোর মধ্যে আমার পূর্বে আগত তাওরাত (আইন) নিশ্চিতভাবে এই আয়াতটির সাতটি শব্দের সঙ্গে তুলনা

করলে উপরোক্ত বাইবেলের মথি অধ্যায়ের তিনটি পঙ্‌ক্তির শব্দগত সাযুজ্য লক্ষ্য না করে পারা যায় না। এখানে আল্লাহর বাণী অত্যন্ত সংক্ষেপ, স্পষ্ট ও তীক্ষ্ম।

সততার পিতা আপন পছন্দমত আপন পয়গম্বর নির্বাচন করেন এবং তিনি বজ্রের চাইতেও কঠিন কণ্ঠে তাদের নিকট তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন (সততার পিতা কথাটি আল্লাহ্ সম্পর্কিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; কারণ খ্রিস্টানগণ এইরূপ বিকৃতভাবেই ব্যবহার করে থাকে)। -সৈয়দ আমীর আলী : স্পিরিট অব ইসলাম

কুরআন এসেছে আসমানী প্রত্যাদেশ বা বিধান, যেগুলো অযোগ্য হাতে ছিল তাকে নিশ্চিত অথবা সংশোধন অথবা পরিপূর্ণ করার জন্য।

وَمَاكَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَارَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞

এই কুরআন আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাহারো রচনা নয়। পক্ষান্তরে এর পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হয়েছে এটি তার সমর্থন এবং এটি বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা; ইহাতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটি জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে।— কুরআন ১০ : ৩৭

শুভ সংবাদ

وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ؕ

৩. এবং আমার পরে আহ্‌মদ নামে যে রাসূল আসবে আমি তাঁর সুসংবাদদাতা।— কুরআন ৬১ : ৬

কোন প্রকার সংকোচ বা দ্বিধা না করে বলতে পারি যে, কুরআনের এই অনুবাদ আমি আবদুল্লাহ্ ইউসুফ আলীর ইংরেজি কুরআন শরীফের অনুবাদ থেকে আহ্‌মদ

সম্পর্কিত তফসির হুবহু এখানে আমি নিয়েছি। তার পূর্বে বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্পকে যথাযোগ্য ধন্যবাদ ও প্রশংসা করা প্রয়োজন। কারণ, এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত কুরআন শরীফ হাজার হাজার কপি মুদ্রণ করছে।

তারাও ইংরেজি সংস্করণ হিসাবে ইউসুফ আলীর ইংরেজি কুরআনকেই গ্রহণ করেছে এবং তার কারণ হিসাবে বলেছে :

"অতীতে অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে কুরআনের অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তাদের ওই সকল উদ্যোগ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত এবং নিজস্ব চিন্তা ও মনোভাব দ্বারা প্রভাবান্বিত। সে কারণে ব্যক্তিগত চিন্তার প্রভাবমুক্ত নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত অনুবাদ প্রকাশ করার জন্য খাদিমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ ইবন আবদুল আজিজ এক বাদশাহী ফরমান জারি করেন। সেই সময় তিনি উপ প্রধান মন্ত্রী ......

মরহুম উস্তাদ আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী কৃত ইংরেজি অনুবাদ গ্রহণ করা হয়েছিল কারণ এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যেমন অতি উঁচুমান সম্পন্ন রুচিবান স্টাইল, বাছাইকৃত শব্দ ব্যবহার যা মূলের অধিকতর নিকটবর্তী এবং সেই সঙ্গে গবেষণমূলক টীকা রয়েছে।

আবদুল্লাহ্ ইউসুফ আলী কৃত অনুবাদে ছয় হাজারের অধিক গভীর ব্যাখ্যামূলক টীকা রয়েছে। আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমন সম্পর্কে ঈসা (আ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত তিনটি ব্যাখ্যামূলক টীকা এখানে দেয়া হলো।

টীকা ৫৪৩৮

গ্রিক শব্দ পেরিক্লিটস-এর প্রায় সঠিক বা যথাযথ অনুবাদ আহমদ বা মুহাম্মদ অর্থাৎ প্রশংসিত যিনি। বর্তমান ইংরেজি বাইবেলে যোহন অধ্যায়ে পেরাক্লিটস-এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ছে কমফরটর শব্দ। পেরাক্লিটস-এর ইংরেজি অর্থ 'এডভোকেট' 'একজনের সাহায্যে আর একজনকে ডাকা হয় সে দয়াল বন্ধু' তাকে ঠিক কমফরটর বা সান্ত্বনাদাতা বলা চলে না। আমাদের পণ্ডিতরা বলেন যে, পেরিক্লিটস -এর অশুদ্ধ উচ্চারণ পেরাক্লিটস এবং যিশুর মূল ভবিষ্যদ্বাণীতে আমাদের পয়গম্বর আহ্‌মদ নামই ছিল। যিনি সকল প্রাণীর জন্য করুণা (২১ : ১০৭) এবং সকল বিশ্বাসীর জন্য অতি দয়ালু ও করুণাময় (৯ : ১২৮)

৪. পরে সে যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট এলো তারা বলতে লাগল, এটা তো এক স্পষ্ট জাদু।

এমনিভাবে সূরা ৬১ আয়াত ৬ দ্বারা আলোচ্য বিষয়ের সমাপ্তি টানা হয়েছে। নানাবিধভাবে ইসলামের পয়গম্বর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল অতঃপর যখন তিনি আসলেন তখন তিনি অনেক স্পষ্ট চিহ্ন প্রদর্শন করলেন। তাঁর জীবন প্রথম হতে শেষ অবধি প্রকৃতপক্ষে এক বিশাল অলৌকিক ঘটনা। অসংখ্য প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন এবং জয়ী হয়েছেন। মানুষের নিকট হতে কোন কিছুই শিক্ষা লাভ না করেই তিনি সর্বোচ্চ জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। পাষাণ হৃদয়কে তিনি দ্রবীভূত করেছেন, কোমল হৃদয় এবং যার জন্য প্রয়োজন ছিল সাহায্য তাকে করেছেন এবং শক্তিশালী। উপলব্ধি করার আগ্রহ যার আছে সে অনুধাবন করতে পারে যে তাঁর সকল কর্মে ও কথায় আল্লাহ্‌র হাত রয়েছে', তথাপি সন্দেহবাদীরা বলে সবই নাকি যাদু, ভোজবাজি প্রহসন।

মিথ্যা ও জাদু! না, না, এই মহৎ প্রজ্বলিত হৃদয় চিন্তার এক বিশাল অগ্নিকুণ্ড সর্বক্ষণ টকবগ করে ফুটছে। এর মাঝে কোন জাদু নেই, ভোজবাজি নেই।

—টমাস কার্লাইল

তারা এই অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণীকে বলেছিল জাদু, ভোজবাজি, প্রহসন অথচ তাই পরবর্তীকালে মানব সভ্যতার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা কঠিন বাস্তবে পরিণত হয়েছে আর তা হচ্ছে ইসলাম!

অধ্যায় তিন

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামই পারাক্লেট (Paraclete)

প্রকৃত সত্যকেই যে অন্বেষণ করে তার নিকট হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকৃতই সেই পারাক্লেট যার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। পারাক্লেট বা কমফরটার বা সহায় অথবা সান্ত্বনাদাতা যেভাবে সাধু যোহনের গসপেলে বলা হোক না কেন তিনি তাই। পূর্বে বর্ণিত কায়রোর সেই কপটিক খ্রিস্টান মহিলার ন্যায় আরো লক্ষ লক্ষ খ্রিস্টান মহিলা ও পুরুষ আছেন। যারা এরূপ সহজ সরল বাণীর জন্য ক্ষুধার্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমরা কেবল আমাদের অক্ষমতার জন্য এবং যীশুর জন্য ক্রন্দন করতে পারি।

শস্য প্রচুর বটে, কিন্তু কার্যকারী লোক অল্প। মথি (৯ : ৩৭)

ঈসা (আ)-এর ভাষা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-এর মুখে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অপর নাম দিয়েছেন আহমদ। খ্রিস্টান তর্কবাগিশ বাইবেল নিয়ে যারা চিৎকার করে তারা এ কথাকে হাসি দিয়ে উড়িয়ে দিতে চায়। তবে খ্রিস্টান মিশনারীরা অস্বীকার করে না যে যীশু তার পরে কোন একজনের আগমনের ভবিষ্যত বাণী করেছেন। কিন্তু আহ্‌মদ শব্দটি তাদের মনোপূত নয়।

সাধারণত খ্রিস্টান জগতে ইংরেজি ভাষায় কমফোরটার বলে তাকে আখ্যায়িত করেছে। তারা বলতে চায় কমফোরটার আসবেন। এতে কিছু আসে যায় না। কমফোরটার অথবা তার পরিবর্তে সমমানের সমার্থবোধক যে-কোন নাম হতে পারে। বাইবেলের কিং জেমস সংস্করণের ইংরেজি অনুবাদ পরীক্ষা করে আমরা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব।

আমরা তাদের প্রশ্ন করতে পারি, যীশু অর্থাৎ ঈসা (আ) কি ইংরেজি ভাষায় কথা বলতেন? নিশ্চয়ই না। যে কোন খ্রিস্টানও আমার সঙ্গে একমত হবেন। একজন আরব খ্রিস্টানকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, তিনি কি আরবি ভাষায় কথা বলতেন? তিনিও

বলবেন, না। তিনি কি জুলু ভাষায় কথা বলতেন? তারাও বলবেন, না। আফ্রিকান ভাষায় বাইবেলে কমফোর্টারের পরিবর্তে ট্রুস্টার (Trooster) ব্যবহার করা হয়েছে। যীশু নিশ্চয়ই আফ্রিকানা ভাষায় কথা বলতেন না।

খ্রিস্টানরা বর্তমানে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে দাবি করে যে তারা সম্পূর্ণ বাইবেল শত শত ভাষায় অনুবাদ করেছে। নিউ টেস্টামেন্ট (বাংলায় নতুন নিয়ম) এবং যেখানে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে সেই বাইবেল দু'হাজারেরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এর অর্থ ইংরেজিতে যে শব্দকে অনুবাদ করে কমফোরটার করা হয়েছে তার দু'হাজার বিভিন্ন ভাষার প্রতিশব্দ আছে।

নিউমা : ঘোস্ট বা আত্মা

চার্চের ফাদারদের বড় রোগ হচ্ছে মানুষের নামেরও অনুবাদ করা। মানুষের নামের অনুবাদ করার কোন অধিকার তাদের নেই। যেমন এসাউ-কে করেছে জেসাস, মসিহ হয়েছে খ্রাইস্ট, সেফাস হয়েছে পিটার ইত্যাদি।

খ্রিস্ট ধর্মগ্রন্থে ঈসা (আ) মূল যে শব্দটি উচ্চারণ করেছিলেন তার সবচেয়ে নিকটবর্তী প্রতিশব্দ আমরা পাই গ্রিক শব্দ প্যারাক্লিটাস। সেটিকেও বাতিল করতে হয় কারণ প্রভু যীশু তো গ্রিক ভাষায় কথা বলেন নি। যা হোক সেজন্য আলোচনার জন্য বিষয়টিকে কঠিন করার প্রয়োজন নেই। আমরা গ্রীক পারাক্লিটাস ও তার সমান ইংরেজি শব্দ কমফরটার (Comforter)-কে আলোচনার জন্য গ্রহণ করতে পারি।

যে কোন জ্ঞানী খ্রিস্টান ব্যক্তিকে যদি প্রশ্ন করা যায়, যে কমফরটার কে ছিলেন। তিনি জবাবে বলবেন কমফরটর হচ্ছেন হলি ঘোস্ট (যোহন ১৪ : ২৬)। এই বাক্যটি বারো নম্বর পঙ্‌ক্তিমালার অংশ মাত্র। যথাসময়ে আমরা পূর্ণ পঙ্‌ক্তিমালার আলোচনা করবো। কিন্তু প্রথমে খ্রিস্টানদের মনকে 'হোলি ঘোস্ট' নামের অপব্যাখ্যা সম্পর্কে প্রস্তুত করিয়ে নিতে হবে। গ্রীক ভাষায় স্পিরিট শব্দের মূল ধাতু নিউমা। নতুন নিয়ম বাইবেলের পাণ্ডুলিপিতে ঘোস্টের জন্য কোন পৃথক শব্দ নেই। খ্রিস্টানরা গর্ব করে বলে তাদের নিকট ২৪,০০০ পাণ্ডুলিপি রয়েছে। সেগুলোর কোন দুটি এক প্রকার নয়।

গ্রিক হতে ইংরেজিতে বাইবেলে অনুবাদ করার সময় কিং জেমস সংস্করণের ও রোমান ক্যাথলিক সংস্করণের উভয়ের অনুবাদক সম্পাদক নিউমা শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ইংরেজি 'স্পিরিট' ও 'ঘোস্ট' দুটি শব্দের মধ্যে 'ঘোস্ট' শব্দকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।

সর্বাধুনিক প্রমিত সংস্করণের বাইবেলের সম্পাদকবৃন্দ দাবি করেন যে তারা পেছন দিকে গিয়ে সবচেয়ে পুরাতন পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করেছেন। তারা বলেন যে, সহযোগী পঞ্চাশ ফেকরার বত্রিশ জন সর্বোচ্চ সম্মানিত পণ্ডিতের সহায়তায় এই কাজ করা হয়েছে। তারা অনেক সাহসিকতার সঙ্গে অস্পষ্ট ঘোস্ট শব্দের পরিবর্তে স্পিরিট শব্দ ব্যবহার করেছেন। অতএব এখন থেকে সকল আধুনিক ইংরেজি বাইবেলে আপনি পাঠ করবেন, **'কমফরটর যিনি হোলি স্পিরিট'!** তথাপি তথাকথিত গোড়া যুদ্ধংদেহী অনেক খ্রিস্টান গোয়ার্তুমি করে সেই পুরাতন ভূতুড়ে শব্দ 'ঘোস্ট' আকঁড়ে আছে। তারা আকঁড়ে থাকুক। তারা আধুনিক সংস্করণ গ্রহণ করতে রাজি নয়। তার চেয়ে ভাল আমরা পুরাতন বাইবেল ব্যবহার করি। তাহলে স্পিরিট শব্দ ব্যবহার করলে যা দাঁড়ায় (বাংলা অনুবাদে অবশ্য আত্মা ব্যবহার হয়েছে)ঃ

> **কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা, যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠাবেন তিনি সকল বিষয়ে তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন, এবং আমি তোমাদেরকে যা যা বলেছি, সে সকল স্মরণ করিয়ে দেবেন।— যোহন ১৪ : ২৬**

পবিত্র আত্মা বা হোলি স্পিরিট বা হোলি ঘোস্ট এই বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে একই কমফরটরই ভিন্ন নাম বা নামের প্রক্ষেপণ। কথাটি ব্রাকেটের মধ্যে থাকা উচিত ছিল। অবশ্য প্রমিত সংস্করণের সম্পাদকগণ এরূপ অনেক প্রক্ষেপণ বিলোপ করেছেন। এবং সেজন্য তারা গর্বিত। কিন্তু তারা বেখাপ্পা কথাটা রেখে দিয়েছে। তার ফলে ঈসা (আ)-এর স্পস্ট ভবিষ্যদ্বাণীকে অস্বীকার করে যে শব্দ কমফরটর -সেটিকে রেখে দিয়েছে।

হোলি স্পিরিট বা পবিত্র আত্মাই পবিত্র পয়গম্বর

(১) একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, কোন বাইবেল বিশেষজ্ঞ আজ অবধি মূল গ্রিক বাইবেলের যোহন অধ্যায়ের পারাক্লেটস শব্দের সঙ্গে হোলি ঘোস্ট বা পবিত্র আত্মার সমন্বয় করেনি। এখন আমরা বলতে পারি কমফরটর অর্থ হোলি ঘোস্ট এবং হোলি ঘোস্ট অর্থ হোলি স্পিরিট বা পবিত্র আত্মা। তাহলে পবিত্র আত্মার অর্থ হোলি প্রফেট বা পবিত্র পয়গম্বর।

মুসলমান হিসেবে আমরা স্বীকার করি যে আল্লাহ্‌র সকল পয়গম্বরই পবিত্র বা পাপমুক্ত। কিন্তু যখনই মুসলমানদের মধ্যে হোলি প্রফেট বলা হয় তখনই আমরা ধরে নেই তিনি আল্লাহ্‌র রসূল মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এটা বিশ্বস্বীকৃত। বাইবেলে বর্ণিত যীশুর জীবন কাহিনীতে সেই অসঙ্গতিহীন বাক্য -'সেই সহায়, পবিত্র আত্মা-কে আমরা যদি সত্য বলে মেনেও নিই তাহলেও

এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ক্ষেত্রে সামান্যতম অর্থের তারতম্য না ঘটিয়ে খাপ খাবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

সেই যোহন যাকে বলা হয় যীশুর জীবন কাহিনীর রচয়িতা (যোহন লিখিত সুসমাচার) তিনি বাইবেলের অন্তর্গত আরো তিনটি পত্রের রচয়িতা। আশ্চর্যের বিষয় যে তিনি সেখানে পবিত্র ভাববাদীর (পয়গম্বরের) পরিবর্তে লিখেছেন 'পবিত্র আত্মা'।

প্রিয়তমেরা, তোমরা সব আত্মাকে বিশ্বাস করো না, বরং আত্মা সবার পরীক্ষা করে দেখ, তারা ঈশ্বর হতে কি না; কারণ অনেক ভণ্ড ভাববাদী জগতে বের হয়েছে। — ১ যোহন ৪ : ১

লক্ষণীয় বিষয় যে, আত্মা শব্দটি ভাববাদী বা পয়গম্বরের প্রতিশব্দ হিসেবে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। সত্য আত্মা তাহলে সত্য পয়গম্বর বা ভাববাদী এবং ভণ্ড-আত্মা হচ্ছে ভণ্ড ভাববাদী। কিন্তু তথাকথিত পুনর্জন্ম -খ্রিস্টানগণ একমাত্র আবেগের দৃষ্টিতেই সব কিছু দেখে থাকে। তাদের উচিত সি আই স্কফিল্ড-এর অনুমোদিত কিং জেমস সংস্করণ বাইবেল পাঠ করা। সেখানে সম্পাদনা পরিষদের টীকা ও ভাষ্য রয়েছে। সেটি তাদের পাঠ করা প্রয়োজন। সেখানে তারা দেখবে উপরোক্ত পঙ্‌ক্তিমালায় আত্মা শব্দটি মথি অধ্যায়ের ৭:১৫ বাক্যের স্পিরিট (Spirit) বা ভাববাদী অর্থ ভণ্ড পয়গম্বর। পবিত্র আত্মা অর্থাৎ পবিত্র ভাববাদী অর্থাৎ পবিত্র পয়গম্বর বা হোলি প্রেফেট। তার অর্থ আল্লাহ্‌র বাণী বাহক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

যথার্থ পরীক্ষা

সাধু যোহন কোন্‌টা সত্য আর কোন্‌টা মিথ্যা অনুধাবন করার জন্য আমাদেরকে শূন্যে ছেড়ে দেননি। তিনি সত্য পয়গম্বর (True prophet) চেনার জন্য আমাদেরকে একটা পরীক্ষা পদ্ধতি দিয়ে গেছেন। তিনি বলেন :

এতে তোমরা ঈশ্বরের আত্মাকে জানতে পার; যে কোন আত্মা যীশু খ্রিস্টকে মাংসে আগত বলে স্বীকার করে, সে ঈশ্বর হতে।—১ যোহন (৪:২)

যোহনের আপন ব্যাখ্যা অনুসারে উপরোক্ত পঙ্‌ক্তিমালার 'আত্মা' (Spirit) শব্দটি পয়গম্বরের বা ভাববাদীর পয়গম্বর প্রতিশব্দ অথবা একই অর্থবহ শব্দ। অতএব উপরোক্ত ঈশ্বরে আত্মা অর্থ ঈশ্বরের ভাববাদী অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পয়গম্বর এবং সকল আত্মা অর্থ সকল পয়গম্বর। আপনার জানতে ইচ্ছা করে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈসা সম্পর্কে কি বলেন । 'ঈসা' কমপক্ষে ২৫ বার কুরআন শরীফে উল্লিখিত হয়েছে। তাকে সম্মান করে বলা হয়েছে।

ঈসা ইবনে মরিয়ম (মেরির পুত্র ঈসা)

আন্নবী (পয়গম্বর)

আস সালেহীন (সঠিক)

কালিমাতুল্লাহ (আল্লাহর বাণীবাহক)

রূহুল্লাহ (স্রষ্টার আত্মা)

মসিহউল্লাহ (আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত মসীহ্)

إِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝

স্মরণ কর, যখন ফেরেশ্‌তারা বলল 'হে মরিয়ম! আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর পক্ষ হতে একটি কালেমার সুসংবাদ দিয়েছেন। তার নাম মসীহ মরিয়াম তনয় 'ঈসা, সে ইহলোক ও পরলোকে সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্যতম হবে।

— কুরআন ৩ : ৪৫

অন্যজন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

(২) যোহন ১৪ : ২৬-এ যে সহায়-এর কথা বলা হয়েছে তিনি কখনই হোলি ঘোস্ট বা পবিত্র আত্মা হতে পারেন, না কারণ যীশু বলেন :

আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করব, এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদেরকে দেবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন- যোহন ১৪ : ১৬

এখানে জোর দেওয়া হয়েছে 'আর এক'-এর উপর। অন্য একজন, ভিন্ন একজন কিন্তু একই প্রকৃতির, তথাপি প্রথম জন অপেক্ষা ভিন্ন, স্পষ্টরূপে ভিন্ন তাহলে প্রথম সহায় কে? খ্রিস্টান জগত সর্বসম্মতিক্রমে বলে থাকে যে তিনি বক্তা অর্থাৎ যীশু খ্রিস্ট প্রথম সহায়। তারপর একজন যিনি পরে আসবেন, তারও ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও মৃত্যু থাকবে।

কিন্তু এই প্রতিশ্রুত সহায় চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে না। কেউই চিরকাল জীবিত থাকে না। হযরত ঈসা (আ) মরণশীল ছিলেন। অতএব যে সহায় (পয়গম্বর) পরবর্তীকালে আসবেন তিনিও মরণশীল হবেন।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ

জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।— কুরআন– ৩ : ১৮৫

তাঁদের শিক্ষার মধ্যেই তাঁরা জীবিত

প্রকৃতপক্ষে আত্মার মৃত্যু নেই। দৈহিক মৃত্যুর পর আত্মা যখন শরীর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন আত্মাও মৃত্যুর স্বাদ লাভ করে। কিন্তু আমাদের সহায়কে চিরকাল থাকতে হবে, আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে। সকল সহায়কে অর্থাৎ সকল পয়গম্বর চিরকাল আমাদের সাথে রয়েছেন। মূসা (আ) তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে আজও আমাদের মধ্যে রয়েছেন। ঈসা (আ) তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে আজও আমাদের মধ্যে রয়েছেন, তেমনি মুহাম্মদ (সা) তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে আজও আমাদের মাঝে জীবিত রয়েছেন। এটা আমার কোন অযৌক্তিক বিষয়কে ন্যায্যতা প্রতিপাদন করার নতুন কোন প্রচেষ্টা নয়। আমি এ কথা বলছি দৃঢ় বিশ্বাস থেকে এবং ঈসা (আ) সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে।

নতুন নিয়ম বাইবেলের ১৬ অধ্যায় লূক অধ্যায়ে ঈসা (আ) ধনী ও গরীব সম্পর্কে একটা কাহিনী বলেছেন। মৃত্যুর পর তারা দেখল একজন বেহেশতে আরেকজন দোযখে। ধনী দোযখের ফুটন্ত আগুনের মধ্যে থেকে চিৎকার করে পিতা ইবরাহীমকে অনুরোধ করছে দরিদ্র ভিক্ষুকের তৃষ্ণা প্রশমনের জন্য তার নিকট পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু অনুরোধই যখন কার্যকর হল না তখন সে শেষ অনুরোধ হিসাবে পিতা ইবরাহীমকে বললো তিনি যেন দরিদ্র ভিক্ষুককে পৃথিবীতে ফেরত পাঠিয়ে দেন, যাতে তারা যদি আল্লাহ্‌র সাবধানবাণী গ্রাহ্য না করে তাহলে যে অবশ্যম্ভাবী ভয়াবহ পরিণতি সে সম্পর্কে তার ভাইদেরকে সাবধান করতে পারে।

কিন্তু তিনি বললেন, তারা যদি মোশির ও ভাববাদিগণের না শুনে, তবে মৃতগণের মধ্য হতে কেউ উঠলেও তারা মানবে না। — লূক ১৬ : ৩১

হযরত ঈসা (আ) উপরোক্ত কথাগুলো বলেছিলেন ইসরাইলী বা ইহুদীদের পয়গম্বর জেরেমিয়া, হোসিয়া, জাকারিয়া প্রমুখের কয়েকশত বছর পর এবং মূসা (আ)-এর ১৩শ বছর পর।

হযরত মূসা ও অন্যান্য পয়গম্বরদের বাণী হযরত ঈসা (আ)-এর সময়েই সেই সকল আচারনিষ্ঠ সম্প্রদায় শুনতে পেয়েছিল এবং আজও আমরা শুনতে পাই, কারণ তাদের শিক্ষার মাধ্যমে তাঁরা আমাদের মাঝে বসবাস করছেন এবং আজও তাঁরা জীবন্ত।

সেই সময়ের 'আপনি'

বলা হয়ে থাকে যে ঈসা (আ)-এর সরাসরি অনুসারীদেরকে সহায় পয়গম্বর সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। ছয়শ' বৎসরের পরবর্তী কালের মানুষকে নয়।

এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দেবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন। — যোহন ১৪ : ১৬

আশ্চর্যের বিষয়, খ্রিস্টানগণ পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে আরম্ভ করে এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়নকে যুক্তি দিয়ে দাঁড় করতে কোন প্রকার কষ্ট বোধ করে না এবং প্রায় হাজার বছর পর যখন পিটার ইহুদীদের প্রতি তার দ্বিতীয় ভাষণে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন :

মোশি ত বলেছিলেন, 'প্রভু ঈশ্বর তোমাদের জন্য তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হতে আমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করবেন, তিনি তোমাদেরকে যা যা বলবেন, সেই সমস্ত বিষয়ে তোমরা কথা বলবে। — ৩ : ২২

এই সকল 'ওহে', 'তুমি' 'তোমরা' শব্দগুলো রয়েছে দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ অধ্যায় পুস্তকে যখন মূসা (আ) তাঁর জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন। তেরশ বছর পর পিটারের সময় এবং ইহুদীদেরকে উদ্দেশ্য করে নয়। গসপেল (যীশুর জীবন কথা) লেখকগণ সেই সমঝোতামূলক শব্দগুলো তাদের প্রভুর মুখে দিয়েছে যার বাস্তবায়নের জন্য তারা দুই হাজার বছর ধরে প্রার্থনা করছে। একটি উদাহরণ যথেষ্ট :

আর তারা যখন তোমাদেরকে এক নগরে তাড়না করবে, তখন অন্য নগরে পলায়ন করো, কেননা আমি তোমাদেরকে সত্য বলছি, ইস্রায়েলের সকল নগরে তোমাদের কার্য শেষ হবে না, যে পর্যন্ত মনুষ্যপুত্র না আসেন।

— মথি ১০ : ২৩

মেঘমালা অভিবীক্ষণ

নির্যাতনের ভয়ে নিঃসঙ্গ অবস্থায় মসিহের প্রথম অনুসারিগণকে চিরকাল পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। তাঁরা এক নগর থেকে ইসরাইলের আরেক নগরে গিয়েছেন। তাঁরা হযরত ঈসা (আ)-এর দ্বিতীয় আগমনের অপেক্ষায় আকাশের প্রতিটি ঘন মেঘ অভিবীক্ষণ করেছে। তবুও এই মিশনারীরা অপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য হাজার বছরে কোন বৈসাদৃশ্য দেখেনি। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তা'আলা "পারাক্লেটসের" আগমনের জন্য তাদেরকে এক-চতুর্থাংশ সময়ও অপেক্ষমাণ রাখেননি; পারাক্লেটস অর্থাৎ কমফর্টার অথবা আহম্মদ যার আরেক নাম প্রশংসিত তাদের উচিত এই সর্বশেষ এবং

চূড়ান্ত আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মেনে নেওয়া এবং আল্লাহ্‌র নিকট শুকরিয়া আদায় করা।

সহায়-এর আগমন শর্তাধীন

(৩) সহায় নিশ্চয় পবিত্র আত্মা নন, কারণ সহায়ের প্রতিশ্রুত পয়গম্বর আগমন ছিল শর্তযুক্ত। অথচ ভবিষ্যদ্বাণীতে আমরা লক্ষ্য করি পবিত্র আত্মার আগমন শর্তযুক্ত নয়।

তথাপি আমি তোমাদেরকে সত্য বলছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে সেই সহায় তোমাদের নিকট আসবেন না; কিন্তু যদি যাই, তবে তোমাদের নিকট তাকে পাঠিয়ে দেব।

— যোহন ১৬ :৭

আমি যদি না যাই তিনি আসবেন না। কিন্তু যদি আমি যাই আমি তাকে পাঠিয়ে দেব। পবিত্র বাইবেলে মসিহের জন্মের পূর্বে এবং তাঁর অন্তর্ধানের পরে অসংখ্যবার পবিত্র আত্মার আসা-যাওয়ার উল্লেখ আছে। অনুগ্রহপূর্বক সেগুলো বাইবেলে দেখতে পারেন ।

খ্রিস্টের জন্মের পূর্বে

১. ....“আর সে তার মাতার গর্ভ হতেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হবে।

— লূক ১ : ১৫।

২. ...“আর ইলিশাবেৎ (এলিজাবেথ) পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হবেন।”

— লূক ১ : ৪১

৩. ...“আর তার পিতা সকরিয় (জাকারিয়া) পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হবেন।”

— লূক ১ : ৬৭

খ্রিস্টের জন্মের পরে

৪. ... “আর পবিত্র আত্মা তার উপরে ছিলেন।” — লূক ২ : ২৫

৫. “এর পবিত্র আত্মা দৈহিক আকারে কপোতের ন্যায় তার উপরে নেমে আসলেন।”

— লূক ৩ : ২২

মনে হয় লূক পবিত্র আত্মা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। খ্রিস্টের জন্মের পূর্বের ও পরের উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলোর জন্য লূককে প্রশংসা না করে পারা যায় না। আমরা খ্রিস্টানদেরকে প্রশ্ন করতে পারি কবুতরের নেমে আসার পর হযরত ঈসা (আ) কার

সাহায্যে অনেক অলৌকিক কাজ করেছিলেন যদি না সেগুলো পবিত্র আত্মার সহায়তায় হয়ে থাকে? প্রভু নিজেই আমাদেরকে কি বলেছেন দেখা যাক। যখন তার নিজের লোকেরা অর্থাৎ ইহুদীরা তাঁকে অভিযুক্ত করে বলেছিল তিনি বীলযেবাব (শয়তানের সর্দার) এর সহযোগিতায় তার অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেছিলেন, তখন ঈসা (আ) তাদেরকে প্রশ্ন করেছিলেন “কেমন করে শয়তান শয়তানকে তাড়াতে পারে? ইহুদীরা দোষারোপ করে যে এই পবিত্র আত্মা-আল্লাহর আত্মা যা তাকে সাহায্য করেছিল। সে ছিল শয়তান প্রকৃতির। এ তো চরম বেয়াদবি! তাই তিনি তাদেরকে চরম সাবধান করেছিলেন :

কিন্তু পবিত্র আত্মার নিন্দার ক্ষমা হবে না। — মথি ১২ : ৩১

প্রভু কথা বলার পূর্বে মথি নিজেই তিনটি পঙ্‌ক্তিতে পবিত্র আত্মা সম্পর্কে বলেন ঃ

“কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা ভূত ছাড়াই, তবে ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে এসে পড়েছে।” মথি ১২ : ২৮

তুলনা করা যায়, এই একই বক্তব্য আরেকজন গসপেল রচয়িতার ভাষায় :

কিন্তু যদি আমি ঈশ্বরের অঙ্গুলি দ্বারা ভূত ছাড়াই, তবে ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে এসে পড়েছে । — লূক ১১ : ২০

এই বক্তব্য অনুধাবন করার জন্য আপনাকে বাইবেল বিশেষজ্ঞ হতে হবে না।

ক. **ঈশ্বরের আঙ্গুল** খ. **ঈশ্বরের আত্মা** গ. **পবিত্র আত্মা**। এই সবগুলো কথাই একই অর্থ বহন করে। অর্থাৎ পবিত্র আত্মা ঈসা (আ)-কে সাহায্য করেছিল এবং এই পবিত্র আত্মা তাঁর শিষ্যদেরকে প্রচার কার্যে এবং রোগ নিরাময় কার্যে সাহায্য করেছিল। পবিত্র আত্মার কার্য সম্পর্কে আপনার মনে যদি কোন সন্দেহ থাকে তাহলে পাঠ করুন :

শূন্যগর্ভ প্রতিশ্রুতি

“পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করেছেন, তেমনি আমিও তোমাদেরকে (যীশুর শিষ্য) পাঠাই, একথা বলে তিনি তাদের উপরে ফুঁ দিলেন, আর তাদেরকে বললেন, পবিত্র আত্মা গ্রহণ কর।” — যোহন ২০ : ২১-২২

নিশ্চয়ই এটা কোন শূন্যগর্ভ প্রতিশ্রুতি ছিল না। শিষ্যরা নিশ্চয়ই পবিত্র আত্মার নিকট হতে উপহার লাভ করেছিল। তাই যদি হয় তাহলে পবিত্র আত্মা যাদের সঙ্গে ছিলেন তারা :

(১) জন দি বাপ্তিস্ত (২) এলিজাবেথ (৩) জাকারিয়া (৪) সায়মন (৫) যীশু এবং (৬) যীশুর শিষ্যগণ। তাহলে "আমি যদি না যাই সহায় তোমাদের মধ্যে আসবে না" -এই কথা অর্থহীন হয়। অতএব সহায় পবিত্র আত্মা নয়।

যোহন ১৬ :৭ পঙ্‌ক্তিমালাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। ফেরাউনের দেশে যখন আমি আরবি ভাষায় সেই কপটির খ্রিস্টান মহিলার নিকট উদ্ধৃতি দিচ্ছিলাম তখন আমার ভীষণ আনন্দ লাগছিল। আসলে বাইবেলের পঙ্‌ক্তিগুলো যখন অন্যান্য স্থানীয় ভাষায় পাঠ করা যায় অথবা ব্যাখ্যা করা যায় তখন প্রচণ্ড আনন্দ লাগে। আমি প্রায়ই এক ডজন বিভিন্ন স্থানীয় ভাষায় এটা করেছি, আপনাদেরও উচিত ইসলামের মঙ্গলের জন্য অনুরূপ দুই একটি পঙ্‌ক্তি স্থানীয় ভাষায় মুখস্থ করা।

'আফ্রিকান' এক চমৎকার ভাষা

আমি যত ভাষায় বাইবেলের এই সকল পঙ্‌ক্তি মুখস্থ করেছি তার মধ্যে আফ্রিকান ভাষায় মুখস্থ করে সবচেয়ে বেশি আনন্দ ও উপকার লাভ করেছি। এই ভাষাটি দক্ষিণ আফ্রিকার শাসকগোষ্ঠীর ভাষা। এটি বিশ্বের সবচেয়ে নবীণ ভাষা। এর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক ভাষাতেই কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। আফ্রিকান ভাষা নিজেই একটি শ্রেণী। ঘটনাক্রমে দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমান জনগণের অর্ধেকের মাতৃভাষা আফ্রিকান। এরা যুদ্ধবন্দী হিসেবে এখানে এসে খ্রিস্টান কর্তৃক ক্রীতদাস হয়েছিল। সেটি হয়েছিল পারিপার্শ্বিক ঘটনার চাপে। তাদের উপকারের জন্য সেই ভাষায় একটি পঙ্‌ক্তি এখানে দিলাম :

> **Maar ek sê julle die waarheid: dit is vir julle voordelig dat ek weggaan; want as ek Nie weggaan Nie, sal die Trooster[1] Nie na julle kom Nie; maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur.**

তথাপি আমি তোমাদেরকে সত্য বলছি। আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে সেই সহায় তোমাদের নিকট আসবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকট তাকে পাঠিয়ে দেব।

আফ্রিকানা ভাষায় এখানে চারবার নাই (Nie) শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। নাই শব্দটি হাঁ-বাচক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। বলা হচ্ছে সহায় (Trooster) -এর আগমন অবশ্যম্ভাবীভাবে যীশুর গমনের উপর নির্ভরশীল। আফ্রিকান ভাষার এই পঙ্‌ক্তিটি আমার অনেক দুয়ার খুলে দিয়েছে, আবার 'সহায় পবিত্র আত্মা' এই ধারণার দুয়ার বন্ধ করে দিয়েছে।

অনুপযুক্ত শিষ্য

এখন আমরা বাইবেলের ১৬ অধ্যায় যোহনের চারটি সবচেয়ে ব্যাপক অর্থবোধক পঙ্‌ক্তি নিয়ে আলোচনা করব যেখানে যীশুর উত্তরসূরি সম্পর্কিত ধাঁধার সমাধান রয়েছে। কারণ তিনি সত্যই বলেছেন :

> **তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সেসকল সহ্য করিতে পার না। — যোহন ১৬ : ১২**

উপরের **'আরও অনেক কথা আছে'** এই কথাটির সঙ্গে যোহন ১৬ : ১৩ পঙ্‌ক্তি তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাবেন সংযুক্ত করে পরে আলোচনা করা হবে। এখন **'তোমরা সে সকল সহ্য করিতে পার না'** এই অংশটুকু আলোচনা করছি।

এই অংশটুকু অর্থাৎ **'তোমরা এখন সেই সকল সহ্য করিতে পার না।'** নতুন নিয়ম গ্রন্থে বিভিন্ন পৃষ্ঠায় বারংবার এসেছে।

> **তিনি তাদেরকে বললেন, হে অবিশ্বাসীরা, কেন ভীরু হও? — মথি ৮:২৬**

> **আর তাকে বললেন, হে অল্পবিশ্বাসী, কেন সন্দেহ করলে? — মথি ১৪: ৩১**

> **তা বুঝে যীশু বললেন, হে অল্পবিশ্বাসীরা,....... কেন পরস্পর তর্ক করছ? — মথি ১৬ : ৮**

> **তাদেরকে বললেন, তোমাদের বিশ্বাস কোথায়? — লূক ৮ : ২৫**

এখানে মনে রাখতে হবে এইগুলি ইহুদীদের উপর তাদের ইতস্তত ভাবের জন্য। হযরত ঈসা (আ)-এর অভিযোগ নয় বরং এইগুলি তার নিজের আপন শিষ্যদের জন্য। শিষ্যদের নিকট বিষয়কে অত্যন্ত সহজ সরল করার জন্য তিনি শিশুর পর্যায়ে নেমে এসেছিলেন। তিনি নেমে এসেছিলেন শেষ পর্যায়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন।

তিনি বললেন, তোমরাও কি এখন পর্যন্ত অবোধ রয়েছ?

— মথি ১৫ : ১৬

এবং যখন তাকে ধৈর্যের শেষ সীমায় নিয়ে যাওয়া হলো তিনি তখন তার শিষ্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সুরে বললেন -

হে অবিশ্বাসী ও বিপদগামী বংশ, কতকাল আমি তোমাদের নিকটে থাকব ও তোমাদের প্রতি সহিষ্ণুতা করব? — লূক ৯ :৪১

তার আপন পরিজন তাকে উন্মাদ ভেবেছিলেন

হযরত ঈসা (আ) যদি ইহুদী না হয়ে জাপানী হতেন তাহলে হয়তো হাসতে হাসতে সম্মানের সঙ্গে হারিকিরি করে আত্মহত্যা করতেন। দুঃখের বিষয় আল্লাহ্‌র রাসূলদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে দুভার্গা তার আপন পরিবার-পরিজন তাকে অবিশ্বাস করেছিল। (যোহন ৭ : ৫)। প্রকৃতপক্ষে তারা এতদূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন যে তাঁকে উন্মদ বলে বন্দী করতেও চেয়েছিল।

এটা শুনে তার আত্মীয়রা তাঁকে ধরে নিতে বের হল। কেননা তারা বলল, সে হতজ্ঞান হয়েছে। — মার্ক ৩ : ২১

হযরত ঈসা (আ)-এর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুজনের মধ্যে কে বা কারা তার জ্ঞান নিয়ে চিন্তিত ছিল? শ্রদ্ধেয় ডুমেলো এম.এ. তার বাইবেল সম্পর্কে ভাষ্য এক খণ্ডের গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৭২৬) বলেন :

মনে হয় তারা তার মা, ভাই ....তার পরিবার বলেছিল, "সে নিজের মধ্যে নেই।" অর্থাৎ তার মাথার ঠিক নেই। ইহুদীদের আইনি ব্যাখ্যাদাতারা বলেছিল, **"তাকে শয়তানে ধরেছে"**। অবশ্য তার অর্থ এই নয় তার পরিবার ব্যাখ্যাদাতাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত ছিল। তাদের ধারণা ছিল যে **"তার মন অস্থির এবং তাকে বিশ্রামে রাখা প্রয়োজন।"**

যীশু-তাঁর স্বজাতি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত

সেটাই ছিল হযরত ঈসা (আ)-এর আত্মীয়-স্বজনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তাহলে তার স্বজাতি ইহুদীরা কি করল? তিনি যখন এত সুন্দর বাণী প্রচার করলেন, অলৌকিক কাণ্ড করে দেখালেন, তারপর তারা কি করল? তার শিষ্য কোমলভাবে বললেন :

তিনি নিজ অধিকারে এলেন আর যারা তাঁর নিজের, তারা তাঁকে গ্রহণ করল না। — যোহন ১ : ১১

প্রকৃতপক্ষে তার **"অপর জনেরা"** তাকে ব্যঙ্গ করেছে, গালি দিয়েছে নিদারুণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। এমন কি ক্রুশবিদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। খ্রিস্টানরা দুই হাজার বছরের অত্যাচার ও নির্যাতন সত্ত্বেও আবার বর্তমানে তাদের প্রতি অসাধারণ ভালবাসা তাদের নিজের বিবেককে দাসত্বে পরিণত করেছে। ইহুদীরা কখনই যীশুকে তাদের মুক্তিদাতা, তাদের রক্ষক, তাদের ঈশ্বর, কোনভাবেই তাকে গ্রহণ করতে পারে না। তাদের ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা বলে,

"যে কোন ইহুদী অপর ইহুদীকে ঈশ্বর বলে মানতে পারে না।"

একমাত্র ইসলামের মধ্যেই ইহুদী, খ্রিস্টান, মুসলমান সকলেই একত্রিত হতে পারে। সবাই বিশ্বাস করতে পারে সত্যিকার অর্থে তিনি যা ছিলেন তাই আল্লাহ্‌র অন্যতম প্রধান রাসূল এবং **না তিনি ঈশ্বর, না ঈশ্বর পুত্র** ।

শিষ্যরা তাকে পরিত্যাগ করেছে

তিনি যাদেরকে **"তার মা এবং ভাইয়েরা"** (মার্ক ৩ : ৩৪) বলতেন সেই বারজন বাছাই করা শিষ্য, যখন তিনি তাদের আহবান করলেন তখন তাদের কি প্রতিক্রিয়া হল? প্রফেসর মোমেরি বলেন ঃ

"তাঁর সর্বাধিক নিকটবর্তী শিষ্যগণ তাঁর সম্পর্কে এবং তাঁর কাজ সম্পর্কে সর্বদা ভুল বুঝেছে। তারা চাইত তিনি আকাশ থেকে আগুন নিয়ে আসবেন, তারা চাইত তিনি নিজেকে ইহুদীদের রাজা বলে ঘোষণা করবেন। তাঁর রাজত্বে একজন তাঁর ডান হাতে বসবে আরেকজন তাঁর বাঁ হাতে বসবে। তারা চাইত তিনি তাদেরকে পিতা দেখাবেন, ঈশ্বরকে দেখাবেন, তারা যেন শারীরিক চোখ দিয়ে ঈশ্বরকে দেখতে পায়, তারা কি না চাইত, তারা চাইত তিনি সব কিছু করে দিন, তারা সব কিছু করতে পারুক, যা কিছুসব, অথচ যা মহা পরিকল্পনায় অসম্ভব। এমনিভাবেই তারা শেষ অবধি তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করেছে এবং যখন শেষ সময় এলো তারা সবাই তাকে পরিত্যাগ করল এবং পালালো।" (স্পিরিট অব ইসলাম, পৃষ্ঠা ৩১)

সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক, আপন শিষ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে হযরত ঈসা (আ)-এর নিজের কোন পছন্দ ছিল না। তারা তাকে পরিত্যাগ করেছে, এমনভাবে এর আগে কোন পয়গম্বরকে তার শিষ্যরা পরিত্যাগ করেনি। এজন্য তাকে দোষ দেওয়া যায় না। তিনি কেঁদে ফেলেছেন, বলেছেন- **"আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু**

মাংস দুর্বল।' — (মথি ২৬ :৪১) সত্যি কথা বলতে, এটা কোন মাটি নয়, যা দিয়ে নতুন আদম তৈরি হবে। তিনি তার দায়িত্ব উত্তরাধিকারীর নিকট দিয়ে গেছেন যাকে তিনি বলেছেন সততার আত্মা। অর্থাৎ সততার পয়গম্বর, ন্যায় আচরণের পয়গম্বর।

আত্মা এবং পয়গম্বর একই শব্দের একই অর্থবহ প্রতিশব্দ

পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসবেন তখন পথ দেখিয়ে তোমাদেরকে সত্য নিয়ে যাবেন। — যোহন ১৬:১৩

ইতিমধ্যে বাইবেলের ভাষায় এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে 'আত্মা' শব্দটি একই লেখক কর্তৃক পয়গম্বরের পরিবর্তে প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। (দ্রষ্টব্য ১ যোহন ৪ : ১)। তাহলে সত্য আত্মা অর্থ সত্য 'পয়গম্বর, যে 'পয়গম্বর' সত্যের মূর্ত প্রকাশ। তিনি সারাজীবন এমন সম্মানের সাথে, এমন পরিশ্রমের সাথে জীবন যাপন করেছেন যে তার বর্বর দেশবাসী পর্যন্ত তাঁকে সম্মানিত উপাধি দিয়েছিল আস্ সিদ্দিক- বিশ্বস্ত, আল আমিন -সত্যবাদী। তিনি এমন ব্যক্তি ছিলেন যার কথার বরখেলাফ কোনদিনই হয়নি। তার জীবন, তার ব্যক্তিত্ব এবং তার শিক্ষা সবকিছু প্রমাণ করে যে তিনি সত্যের প্রতিমূর্তি, মূর্ত সত্য। —দি স্পিরিট অব ট্রুথ

অধ্যায় চার

সার্বিক পথনির্দেশ

অনেক এবং সকল

ইতিপূর্বে বাইবেলের দুটি বাক্যাংশ উল্লেখ করেছিলাম **"আমার এখনও তোমাদেরকে অনেক কিছু বলার আছে, এবং তিনি তোমাদেরকে সকল সত্যের পথ নির্দেশ করবেন।" — যোহন ১৬ : ১২ এবং ১৩**

খ্রিস্টানগণ আজও দাবি করে এবং মনে করে, ভবিষ্যদ্বাণীতে যে সততার আত্মার কথা বলা হয়েছে তিনি পবিত্র আত্মা। তাই যদি হয় তাহলে প্রশ্ন করতে হয় তাদের ভাষায় অনেক অর্থ একাধিক এবং সকল শব্দের অর্থ একাধিক দুইটি শব্দের অর্থই কি একাধিক? তাই যদি কেউ মনে করে তাহলে তার সঙ্গে কোন কথা বলে লাভ নেই। সাধারণত এই প্রসঙ্গে যদি কোন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীকে জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে সে হয়তো ইতস্ততার সঙ্গে বলবে- "হ্যাঁ"।

অনেক কিছুর জটিলতা দূর হওয়া সম্পর্কে হযরত ঈসা (আ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কারণ তার অনেক কাজ অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল। তদুপরি মানব জাতিকে সকল সত্যের প্রতি পথনির্দেশের জন্য তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। বর্তমান যুগে অনেক জাতি অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত। সেই সকল সমস্যার সমাধানের জন্য তারা জবাব খুঁজে বেড়াচ্ছে।

হযরত ঈসা (আ) যে সকল প্রশ্নের উত্তর তাঁর নানা কথার মধ্য দিয়ে যাননি কি, পবিত্র আত্মা কি সেই সকল প্রশ্নের কোন একটিও জবাব এই দুই হাজার বছরেও দিতে পেরেছেন? আমি অনেক জানতে চাই না, আমি শুধু জানতে চাই আমার প্রশ্নের এই একটি মাত্র কথা।

হলি ঘোস্টের কাছে কোন সমাধান নেই

বিশ্বাস করুন চল্লিশ বছর যাবত আমি এই প্রশ্ন করছি। কিন্তু একজন খ্রিস্টানকে পাইনি যিনি বলেছেন যে "হলি ঘোস্ট" প্রদত্ত এটাই নতুন সত্য। তবুও প্রতিশ্রুতি রয়েই গিয়েছে, "যে সহায় এসে তোমাদিগকে সর্বসত্যে পথনির্দেশ করবে।" এই ভবিষ্যৎ বাণীর সত্য আত্মা যদি "হলি ঘোস্ট" হয় তাহলে সকল খ্রিস্টান সকল ফিরকার খ্রিস্টান এবং সকল হবু খ্রিস্টান তাহলে হলি ঘোস্ট-এর উপহার দাবি করবে। রোমান ক্যাথলিকরা দাবি করে যে তারা হলি ঘোস্টের মধ্যে তথাকথিত বসবাসকারী, সে কারণে তারা সমগ্র সত্য লাভ করেছে। এই একই দাবি করেছে এ্যাঙ্গিলিকান, মেথোডিস্ট, জিহোবার, সাক্ষী, সেভেন্থ ডে এডভেন্টিসট, ব্যাপটিস্ট ইত্যাদি ইত্যাদি। তদুপরি আমেরিকার সাত কোটি (born again) খ্রিস্টান সবাই একই দাবি করে। তাহলে নিম্নোক্ত সমস্যাগুলোর কি সমাধান হলি ঘোস্ট-এর মাধ্যমে হয়েছে? যেমন, ১. মদ্য পান,২. ভাগ্য গণনা, ৩. মূর্তিপূজা, ৪.বর্ণবাদ, ৫. নারী জাতির সংখ্যাধিক্য।

মদ্যপান সমস্যা

দক্ষিণ আফ্রিকার মোট জনসংখ্যা তিন কোটি। তার মধ্যে চল্লিশ লক্ষ শ্বেতাঙ্গ, সেখানে তিনশত তিন লক্ষ মদ্যপানে আসক্ত রয়েছে। পার্শ্ববর্তী জাম্বিয়ায় কেনিথ কাউন্ডা এদেরকে মাতাল বলে আখ্যায়িত করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার অশ্বেতাঙ্গরা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা পাঁচগুণ মদ্যপানে আসক্ত। ভারতীয় ও আফ্রিকানদের মধ্যে কতজন মদ্যপানে আসক্ত তার কোন সঠিক হিসাব নেই।

জিমি সগটি (Jimmy Swaggart) তার 'এলকোহল' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রে এক কোটি দশ লক্ষ লোক মদ্যপান করে। এবং চার কোটি চল্লিশ লক্ষ লোক হেভি ড্রিংকার অর্থাৎ অত্যধিক মদ্যপান করে। তিনি একজন ভাল মুসলমানের মত বলেছেন, মদ্যপান কম আর বেশি একই কথা। এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এরা সবাই মাতাল। মদ্যপানের অবাধ ক্ষতিকারক ধারা বিশ্বের সর্বত্র স্বীকৃত। হলি ঘোস্ট কোন চার্চের মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে কোন কথা আজ পর্যন্ত বলেন নি। তারা পবিত্র বাইবেলের তিনটি বক্তব্যের ধোঁয়াটে যুক্তির ভিত্তিতে মদ্যপানকে দূষণীয়ভাবে না দেখার ভান করেন।

(ক) মৃতকল্প ব্যক্তিকে সুরা দাও, তিক্তপ্রাণ লোককে দ্রাক্ষারস দাও। সে পান করে দৈন্যদশা ভুলে যাক, আপন দুর্দশা আর মনে না করুক।

— প্রোভার্বস- ৩১ : ৬-৭

এটা কোন পরাধীন জাতিকে পদানত রাখার একটি উত্তম দর্শনই বটে।

তাঁর প্রথম অলৌকিক ঘটনা

(খ) ঈসা (আ) 'খুন-পাগল' ছিলেন না। আত্ম আস্বাদকনকারীরা বলে, বাইবেলে তার যে অলৌকিক ঘটনার কথা আছে সেখানে তিনি পানিকে মদে পরিণত করেছিলেন।

যীশু তাহাদেরকে বললেন, ঐ সকল জালায় পানি ভর। তারা সেগুলো কানায় কানায় পূর্ণ করল। পরে তিনি তাদেরকে বললেন, এখন তা হতে কিছু তুলে নিয়ে যাও। ...... ভোজাধ্যক্ষ যখন সে পানি, যা দ্রাক্ষারস হয়ে গিয়েছিল, আস্বাদন করলেন ...... তুমি উত্তম দ্রাক্ষারস এখন পর্যন্ত রেখেছ।

— যোহন ২ : ৭-১০

এই অলৌকিক ঘটনার পর থেকে খ্রিস্টান জগতে মদ পানির মত বইতে শুরু করেছে।

শান্ত উপদেশ

(গ) সেন্ট পল যিশু খ্রিস্টের স্বনিয়োজিত শিষ্য, তিনিই প্রকৃতপক্ষে খ্রিস্ট ধর্মের প্রবর্তক। তিনি তার অনুগ্রহভাজন ধর্মান্তরিত শিষ্য টিমোথিকে বলেছিলেন :

এখন অবধি কেবল পানি পান করো না, কিন্তু তোমার উদরের জন্য ও তোমার বারবার অসুখ হয় বলে কিঞ্চিত দ্রাক্ষারস ব্যবহার করো। - ১ টিমোথি ৫ : ২৩।

টিমোথির বাবা ছিলেন গ্রিক আর মা ছিলেন ইহুদী। খ্রিস্টানরা বাইবেলের এই সকল উদ্ধৃতিতে যেখানে উত্তেজক এবং নেশার পানীয় সম্পর্কে কথা রয়েছে সেগুলিকে ঈশ্বরের অভ্রান্ত বাক্য বলে গ্রহণ করেছে। তারা বিশ্বাস করে পবিত্র আত্মা এই সব বিপদজনক পরামর্শের জন্য রচয়িতাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। পাদ্রী "ডুমেলো" এই পঙ্ক্তি সম্পর্কে বিবেকের অস্বস্তিবোধের তাড়নায় বলেন,"স্বাস্থ্যগত কারণে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে স্বল্প মাত্রায় মদ্যপানের কথা-বলা হয়েছে।"

মদ্যপানে সম্পূর্ণ বিরতিই একমাত্র উত্তর

হাজার হাজার খ্রিস্টান পাদ্রী যখন প্রার্থনা সভা শেষে সান্ধ্যভোজপর্বে তথাকথিত এক চুমুক মদ পান করতে গিয়ে মদ্যপানে আসক্ত হয়ে পড়ে। সেখানে ইসলাম একমাত্র ধর্ম যেখানে নেশা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন "যে নেশার বস্তু অধিক মাত্রায় গ্রহণ নিষিদ্ধ তা স্বল্প মাত্রায়ও

নিষিদ্ধ।" ইসলামে কোন রকম ছোটখাট বা স্বল্প মাত্রার সুযোগ নেই। কুরআন শরীফে কঠোর ভাষায় মদ্যপান সহ জুয়া, ভাগ্য গণনা ও পুতুল পূজা সবগুলিকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।— কুরআন ৫ : ৯০

যখন এই আয়াত নাযিল হয় তখন মদীনা শহরের রাস্তাঘাটে মদের পিপা খালি করে সমস্ত মদ ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সেই পাত্রে আর কোনদিন মদ রাখা হয়নি। এই সহজ সরল নির্দেশের দ্বারা বিশ্বে একমাত্র মুসলমানরাই মদ্যপান হতে বিরত সর্ব বৃহৎ জাতি।

নিষিদ্ধকরণে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যর্থতা

প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে : মদ্যপান নিষিদ্ধকরণ আইন বাস্তবায়িত করতে যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের মত মেধাশক্তি সম্পন্ন জাতি ও আর্থিক সচ্ছলতা সম্পন্ন সরকার তার অসাধারণ শক্তিশালী প্রচার মাধ্যমে যন্ত্রসহ ব্যর্থ সেখানে এই সত্য আত্মা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একটি আয়াতের দ্বারা সফল হতে পেরেছিলেন?

আমেরিকান জাতিকে কে এই নিষিদ্ধকরণ আইন পাস করতে বাধ্য করেছিল? কোন আরব জাতি তোমাকে বলেছিল—তুমি যদি তোমার দেশে মদ্যপান নিষিদ্ধ না কর তাহলে তোমাকে তেল দেব না? বিশ শতকে যুক্তরাষ্ট্র যখন এই আইন পাস করে তখন আরবদের কোন তেল শক্তি ছিল না। আমেরিকান অভিভাবকদের অথবা এদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিভিন্ন সমীক্ষা ও অধ্যয়নের ভিত্তিতে এই জ্ঞান লাভ হয়েছিল যে কারণে তারা মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। যদিও তারা জানত অধিকাংশ জনসাধারণ খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী এবং তারাই তাদেরকে নির্বাচন করে কংগ্রেসে পাঠিয়েছে। একথা সত্য যা মস্তিষ্ক থেকে আসে তা মস্তিষ্কেই নাড়া দেয়। কিন্তু যা মানুষের হৃদয় ও আত্মা থেকে তা হৃদয় ও আত্মাকে নাড়া দেয়। কুরআন

শরীফে উপরোক্ত আয়াত যেখানে নিষিদ্ধকরণের কথা আছে তার পরিবর্তনের সেই শক্তিও আছে। এ প্রসঙ্গে থমাস কার্লাইলের বক্তব্য স্মরণযোগ্য :

"যদি কোন গ্রন্থ হৃদয় হতে নির্গত হয়, সে অপর হৃদয়কে স্পর্শ করবে। সকল শিল্পকলা প্রকৃতপক্ষে তারই স্বল্প মাত্রার প্রকাশ। যে কেউ স্বীকার করবে যে কুরআনের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য এর কৃত্রিমতা, এটি একটি বিশ্বস্ত গ্রন্থ।"

আধ্যাত্মিক উন্নতি শক্তির একটি উৎস

সকল সুন্দর চিন্তা, ভাষা ও প্রকাশ তা সে যতই শিল্পসম্মত হোক না কেন তার পশ্চাতে যদি উচ্চ আধ্যাত্মিক শান্তি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব না থাকে, তাহলে সেগুলো নিছক ঘন্টার ধ্বনি অথবা, মন্দিরায় করতাল হয়ে পড়ে। তেমনি ধরনের উচ্চ আধ্যাত্মিকতা আসতে পারে কেবলমাত্র **"উপবাস ও প্রার্থনার'** (মথি ১৭:২১) মাধ্যমে -যেমন ঈসা (আ) বলেছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে যা প্রচার করতেন জীবনে তা অনুশীলনও করতেন। তার ওফাতের পর আয়েশা সিদ্দিকা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল নবী করীম (সা)-এর জীবন আচরণ কেমন ছিল? তখন "তিনি বলেছিলেন তিনি ছিলেন কুরআনের মূর্ত প্রতীক।"

"এই সকল পুরুষ ও মহিলা, ভদ্র ও বুদ্ধিমান এবং গ্যালিলি সাগরের জেলেদের চেয়ে কম শিক্ষিত নয় তারা যদি তাদের শিক্ষকের মধ্যে বিন্দু পরিমাণ বিশ্বাসের ঘাটতি অথবা শঠতা অথবা সামান্যতম পার্থিব জগতের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করত তাহলে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর সমাজ উন্নয়নে এবং নৈতিকতার পুনর্জাগরণের সকল প্রচেষ্টা মুহূর্তে ধূলোয় লুটিয়ে পড়ত।" (স্পিরিট অফ ইসলাম- সৈয়দ আমীর আলী)

সমালোচকের নায়ক

যদি কেউ বলে উপরের কথাগুলো একজন বিশ্বাসী তার প্রিয়জন সম্পর্কে বলেছেন, তাহলে অন্য একজন খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী সহানুভূতিশীল সমালোচক, তার নায়ক পয়গম্বর সম্পর্কে কি বলেন দেখা যাক :

এক জন দরিদ্র, কঠোর পরিশ্রমী, অর্ধভুক্ত মানুষ, ইতর ব্যক্তি কি জন্য পরিশ্রম করে সে বিষয়ে উদাসীন। আমি বলব, একেবারে খারাপ মানুষ নন। কোন ধরনের ক্ষুধার চাইতে ভাল কিছু তার মধ্যে রয়েছে অথবা বলা যায় যে এই সব বন্য আরব জাতি তেইশ বছর সর্বদা তার সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করেছে । উদ্দীপ্ত হয়েছে, তাকে তারা তেমন শ্রদ্ধাও করত না!

"...... তাকে বলত পয়গম্বর। কেন তিনি তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন শূন্য হাতে? তাকে ঘিরে কোন রহস্যও ছিল না। বাহ্যত সাদামাটা পোশাক, নিজের জুতো নিজেই সেলাই করছেন, আবার যুদ্ধ করছেন, পরামর্শ করছেন; তাদেরকে আদেশও দিচ্ছেন। তারা দেখেছে তিনি কেমন মানুষ। তাকে যা ইচ্ছা সেই নামেই ডাকা যায়। এই মানুষটি এমন আনুগত্য পেয়েছিলেন যে তেমন আনুগত্য কোন সম্রাট পায়নি। তেইশ বছর প্রকতৃপক্ষে ছিল একটা কঠিন পরীক্ষার কাল। আমি তার মধ্যেই এমন কিছু দেখতে পাই যা যথার্থ নায়কের মধ্যে বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন।" —হিরো এন্ড হিরো ওয়ার্শিপ, টমাস কার্লাইল, পৃ : ৯৩

জাতি-বিদ্বেষ সমস্যা

তিনি (সত্যের আত্মা) তোমাদিগকে পরিপূর্ণ সততায় পথ নির্দেশ করিবেন।

যে কোন ধর্মের অনুসারিগণের পক্ষে 'ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানব জাতির ভ্রাতৃত্ব" সম্পর্কে সুললিত ও সুন্দর ভাষায় অনেক কিছু বলা সহজ। কিন্তু এই সুন্দর চিন্তা চেতনাকে বাস্তবায়িত করা কেমন করে সম্ভব? কেমন করে সম্ভব এমন এক পদ্ধতির উদ্ভাবন করা যার মাধ্যমে সকল মানুষ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবেন? প্রতিটি মুসলমান আত্মার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য পাঁচবার স্থানীয় মসজিদে জামাতে শরীক হন। সেখানে সাদাকালো ধনী দরিদ্র নানা জাতের নানা মানুষ একত্র মিলিত হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিদিন নামাজ আদায় করেন। সপ্তাহে একদিন শুক্রবার জামে মসজিদে আরও একটু বৃহত্তর এলাকার সকল মুসলমান মিলিত হয়ে জুমআর নামাজ আদায় করেন। আবার বছরে দুই ঈদে আরও বড় এলাকার সবাই মিলে, সম্ভব হলে, খোলা ময়দানে মিলিত হন। তারপর কমপক্ষে জীবনে একবার কাবা শরীফে, মক্কার কেন্দ্রীয় মসজিদে আন্তর্জাতিক এক মহাসমাবেশে মিলিত হন। তুর্কী, ইথিওপীয়, চৈনিক, ভারতীয়, আমেরিকান, আফ্রিকান সবাই দুই টুকরা সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করে একত্রিত হয়। যেখানে সবাই সমান। অন্য কোন ধর্মে বা বিশ্বাসে কি এমন সাম্যবাদী আনুষ্ঠানিকতা আছে?

আল্লাহ্র কিতাবে যে অভ্রান্ত অনুশাসন বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে আল্লাহ্র নিকট একটি গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড হলো একজন মানুষের প্রতি অপর একজন মানুষের আচার-আচরণ কেমন তার দ্বারা। এগুলি একমাত্র সত্যিকারের ভিত্তিভূমি যার উপর **"আল্লাহ্র রাজ্য"** প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে মুসলমানরা একেবারে নিষ্কলঙ্ক, তারা সকল প্রকার জাতিভেদের রোগ থেকে মুক্ত। কিন্তু দেখা গিয়েছে ধর্মীয়ভাবে মুসলমানরাই সর্বাপেক্ষা কম জাতি-বিদ্বেষী।

অধিক সংখ্যক নারী সমস্যা

মনে হয়, প্রকৃতি মানব জাতির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। দেখা যাচ্ছে সে মানুষের চালাকির প্রতিশোধ নিতে চায়। মানুষ তার সমস্যার বাস্তব ও স্বাস্থ্যসম্মত সমাধান শুনতে রাজি নয়। অথচ তাকে মঙ্গলজনক ভবিষ্যৎ চিন্তা উপকারার্থে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে **"যাও তোমরা সুরুয়া জ্বাল দাও।"**

একথা সর্বজনবিদিত যে পুরুষ ও মহিলার জন্মহার সর্বত্র প্রায় সমান, কিন্তু শিশু মৃত্যুর ক্ষেত্রে পুরুষ শিশুর মৃত্যুহার বেশি। আর ভাবাই যায় না। নারীরা কতো দুর্বল প্রজাতির? একটি কোন নির্দিষ্ট সময়ে দেখা যায় বিধবার সংখ্যা বিপত্নীকের সংখ্যার চাইতে অধিক। প্রত্যেক সভ্য জাতির নারীর সংখ্যা পুরুষের চাইতে অধিক। যুক্তরাজ্যে চল্লিশ (৪০) লক্ষ, জার্মানিতে পঞ্চাশ (৫০) লক্ষ, সোভিয়েট রাশিয়ায় সত্তর (৭০) লক্ষ্য ইত্যাদি। কিন্তু আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে যে সমাধান গ্রহণযোগ্য পৃথিবীর অন্য সকল দেশে সেটাই গ্রহণযোগ্য। এদেশের সংখ্যা তত্ত্ব পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক বিজ্ঞান সম্মত এবং সহজেই পরীক্ষণীয়।

আমেরিকা! ওগো আমেরিকা!

আমরা জেনেছি যুক্তরাষ্ট্রের ৭,৮০০,০০০ সংখ্যক মহিলা উদ্বৃত্ত। এর অর্থ আমেরিকার প্রত্যেক পুরুষ যদি বিবাহ করে তাহলে ৭৮০০,০০০ জন মহিলা অবিবাহিত থাকে। তারা স্বামী পাবে না। আমরা জানি অনেক পুরুষ মানুষ নানা কারণে বিয়ে করে না। তারা নানা অজুহাতে বিয়ে করতে পারে না। অন্যদিকে একজন মহিলা সে যা-ই হোক না কেন বিয়েতে পরাঙ্মুখ হবে না। সে নিজের আশ্রয় অথবা নিরাপত্তার কথা ভেবে অন্তত বিয়েতে আগ্রহী। কিন্তু আমেরিকায় এই অতিরিক্ত সংখ্যক নারী থাকার যে সমস্যা তার কারণ বহুবিধ। এখানকার শতকরা ৯৮ ভাগ জেলখানার বাসিন্দা পুরুষ। তারপর সেখানে দুই কোটি পঞ্চাশ লাখ সমকামী রয়েছে। তারা তাদেরকে সুভাষিতভাবে আখ্যায়িত করে বলে, "গে"। যে সুন্দর শব্দের অর্থ ছিল 'আনন্দ' সেটাকে বিকৃত করে এই অর্থ দেওয়া হয়েছে। আমেরিকা যা করে সব কিছুই বড় করেই করে। তারা ঈশ্বরকে বড় করে যেমন তুলে ধরে তেমনি শয়তানকে তুলে ধরতেও পিছপা হয় না। জিমি সোয়াগাট নামে বিশেষ পাদ্রী সাহেব তার গবেষণা গ্রন্থ হোমো সেকসুয়ালিটি (সমকামী) গ্রন্থে লিখেছেন, "আমেরিকার! ঈশ্বর একদিন তোমার বিচার করবেন, (অর্থাৎ ঈশ্বর তোমাকে ধ্বংস করবেন) তিনি যদি তোমার বিচার না করেন তবে তাঁকে সমকামী

দুশ্চরিত্রবানদের নিকট ক্ষমা চাইতে হবে; কারণ তিনি বিকৃত রুচি ও সমকামিতার জন্য তাদেরকে ধ্বংস করেছিলেন।"

উদাহরণ হিসাবে নিউইয়র্ক

নিউইয়র্ক শহরে দশ লাখের বেশি নারী রয়েছে। যদি সাহস করে সেখানকার সমস্ত পুরুষ সবাই বিয়ে করতে রাজি হয় তাহলে দেখা যাবে দশ লাখ নারী স্বামী পাচ্ছে না। কিন্তু সমস্যা আরও জটিল, কারণ এই শহরের পুরুষ জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সমকামী 'গে'।

ইহুদীরা সদাসর্বদা সকল বিতর্কে উচ্চকণ্ঠ। কিন্তু এক্ষেত্রে তারা ইঁদুরের মত চুপচাপ। কারণ তাদের ভয় তাদেরকে যদি পশ্চাৎমুখী পূর্বদেশী বলে অভিহিত করা হয়। অন্যদিকে গির্জা তাদের লক্ষ লক্ষ খ্রিস্টান (born again) যারা নিজেরা নাকি পবিত্র আত্মার আবাসস্থল, তারাও নিশ্চুপ। মরমন চার্চের প্রতিষ্ঠাতা যোসেফ স্মিথ ও ব্রিঘহাম ইয়ং ১৮৩০ সালে দাবি করলেন যে, তারা প্রত্যাদিষ্ট হয়েছেন । তারা এই অতিরিক্ত নারী সমস্যা সমাধানের জন বহুপত্নিক বিবাহের প্রচার ও অনুশীলন করলেন। বর্তমানে মরমনদের পয়গম্বর আমেরিকান সংস্কারের সঙ্গে একাত্মবোধ করার উদ্দেশ্যে তাদের সেই বহুবিবাহের চিন্তাধারাকে বাতিল করেছে। এখন পশ্চিমা দেশের/আমেরিকার/ইউরোপের হতভাগ্য অতিরিক্ত মহিলারা কি করবেন? রসাতলে যাওয়া ছাড়া তাদের আর কোন উপায় নেই।

একমাত্র সমাধান-নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত বহুবিবাহ

আল আমিন সত্যের পয়গম্বর, সত্য আত্মা আল্লাহ্‌র নির্দেশে এসব হতভাগ্য মহিলার সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন :

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً

....তবে বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন অথবা চার; আর যদি আশংকা কর যে সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে ...— কুরআন ৪ : ৩

পাশ্চাত্য সভ্যতা হাজার হাজার লেসবিয়ান ও সমকামীকে তাদের মাঝে সহ্য করতে পারে। পশ্চিমে একটা হাস্যকর কথার চল আছে যে সেখানে একজন পুরুষ এক ডজন রক্ষিতা রাখতে পারে এবং এক ডজন জারজ সন্তানের জন্মও দিতে পারে। এসব পাশবিক প্রকৃতির বদমায়েশ লোকদের গর্বের সঙ্গে যে শব্দটি পশু চিকিৎসালয়ে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেই 'স্টার্ড' বা অশ্বপালের প্রজনন প্রতিষ্ঠান বলে আখ্যায়িত করা হয়। তারা বলে "তাকে বুনো যব বপন করতে দাও কিন্তু তাকে দায়ী করো না।"

ইসলামে বলে "আনন্দের জন্য মানুষকে দায়িত্বশীল হতে হবে।" এক শ্রেণীর পুরুষ আছে যারা অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত এবং এমন প্রকৃতির নারীও আছে যারা অপরের সঙ্গে স্বামীর অংশীদর হতে প্রস্তুত। তাহলে তাদের পথে বাধা সৃষ্টি করা কেন? তোমরা বহুবিবাহকে বিদ্রূপ কর, অথচ তোমাদের পবিত্র বাইবেলে অনেক পয়গম্বরের বহুবিবাহের কথা বিধৃত আছে। তোমরা ভুলে যাও জ্ঞানী সলোমনের এক হাজার স্ত্রী ও উপপত্নী ছিল। এর উল্লেখ আছে তোমাদের বাইবেলে। এটিই বিশাল সমস্যার একটি স্বাস্থ্যসম্মত সমাধান। অথচ তোমরা নারীর সঙ্গে নারীর, পুরুষের সঙ্গে পুরুষের-লেসবিয়ানদের ও সমকামীদের বিকৃত জীবন যাপনকে মহা আনন্দের সঙ্গে সহ্য করতে পার। কিন্তু একটা স্বাস্থ্যসম্মত সমাধান গ্রহণ করতে সম্মত নও। বিকৃতি আর কাকে বলে? হযরত ঈসা (আ)-এর সময় ইহুদী পৌত্তলিকদের মধ্যে বহুবিবাহের প্রচলন ছিল। তিনি এর বিপক্ষে একটি কথাও বলেননি। তাঁর কোন দোষ নেই। ইহুদীরা তো তাকে কোন সমাধান দেওয়ার সুযোগই দেয়নি। তাই তো তিনি কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন, **"তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসবেন তখন পথ দেখিয়ে তোমাদেরকে সত্যে নিয়ে যাবেন।"**

— যোহন ১৬ : ১৩

সহায় একজন মানুষ

যে ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেখানে 'সে' কথাটি জোর দিয়ে বলা হয়েছে। একটু চিন্তা করলেই আপনি স্বীকার করবেন যে সহায় যিনি আসবেন তিনি হবেন একজন মানুষ, কোন প্রেতাত্মা নয়।

> **পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসবেন তখন পথ দেখিয়ে তোমাদেরকে সত্যে নিয়ে যাবেন। কারণ তিনি আপনা হতে কিছু বলবেন না, যা যা শোনেন তাই বলবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদেরকে জানাবেন।**

— যোহন ১৬ : ১৩

(howbeit when he, the Spirit of Truth, is come, He will guide you into all truth: for He shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will show you things to come. (John 16:13).

উপরে ইংরেজি পঙ্‌ক্তিতে **he (তিনি)** শব্দটি কতবার উল্লেখিত হয়েছে? সাতবার। একটি পঙ্‌ক্তিতে সাতবার পুরুষবাচক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে। ৬৬টি অধ্যায়ের প্রোটেস্টান্ট বাইবেলে, ৭৩টি অধ্যায়ের ক্যাথলিক বাইবেলে কোথাও একত্রে এক পঙ্‌ক্তিতে সাতবার পুরুষবাচক সর্বনাম অথবা স্ত্রীবাচক সর্বনাম উলেখ হয়নি। স্বীকার করতেই হয় যে, এতগুলি পুরুষবাচক সর্বনাম একটি মাত্র পঙ্‌ক্তিতে (পবিত্র বা অপবিত্র ঘোস্ট বা) প্রেতাত্মার ক্ষেত্রে বেমানান।

অব্যাহত বিভ্রান্তিকর প্রক্ষেপণ

একবার ভারতবর্ষে খ্রিস্টান মিশনারীদের সঙ্গে মুসলমানদের একটা বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে বাইবেলের এই এক পঙ্‌ক্তিতে সাতবার পুরুষ সর্বনাম ব্যবহারের উল্লেখ করা হয়েছিল, তারপর উর্দু বাইবেলে সেই সর্বনামটি বদলিয়ে স্ত্রীবাচক সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে মুসলমানরা আর দাবি করতে না পারে যে বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী যার সম্পর্কে করা হয়েছে তিনি একজন পুরুষ এবং তিনি হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। খ্রিস্টানদের এই ধোঁকাবাজি উর্দু বাইবেলে আমি নিজের চোখে দেখেছি। মিশনারীদের এই চালাকি করার অভ্যাস অত্যন্ত সাধারণ। বিশেষ করে স্থানীয় ভাষার ক্ষেত্রে এই চালাকি তাদের সর্বত্র। সম্প্রতি আফ্রিকান বাইবেলেও সেই একই চালাকী দেখেছি। যে পঙ্‌ক্তিতে ছিল Trooster অর্থাৎ comforter সেটাকে voorspraak অর্থাৎ মধ্যস্থতাকারী বানানো হয়েছে। তেমনি আরেকটি কথা Die Heilige Gees অর্থাৎ হোলি ঘোস্ট এই ধরনের অর্থ পরিবর্তনের সাহস বিভিন্ন ইংরেজি সংস্করণে তারা করতে সাহস পায়নি। অথচ খ্রিস্টান মিশনারীরা ভিন্ন ভাষার ক্ষেত্রে এই ধরনের শব্দার্থ পরিবর্তন করে সৃষ্টিকর্তার কথাকেই বদলে দেয়।

নয়টি পুরুষ সর্বনাম

আরেক জায়গায় এক লেখক তার নিজের অজ্ঞাতসারে সম্ভবত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে নয়, বার বার 'তার' (His) শব্দটি ব্যবহার করেছেন।"তাঁর বিনম্র ব্যবহার, আচরণে তাঁর মিতব্যয়িতা, তাঁর জীবনে প্রচণ্ড শুদ্ধতা, তাঁর সঠিক বিশুদ্ধতা, দরিদ্র ও দুর্বলের প্রতি তাঁর সাহায্যদানের সর্বক্ষণ প্রস্তুতি,তাঁর আত্মসম্মান বোধ, তাঁর অবিচল আনুগত্য, তাঁর কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠা তাঁকে তাঁর আপন জনের মধ্যে সর্ব উচ্চ ঈর্ষণীয় উপাধি "আল-আমিন-বিশ্বস্ত" প্রদান করেছিল।"

আল-আমিন, বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য, সত্যের আত্মা (আস-সাদিক)-এই ধরনের আলঙ্কারিক অর্থবোধক প্রকাশের মাধ্যমে সত্য কথা বলার অর্থ দাঁড়ায় সত্যের মূর্ত প্রকাশ যেমন হযরত ঈসা (আ) নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন, "আমি পথ, সততা এবং আমি জীবন।" (যোহন ১৪ : ৬) তার অর্থ এই সকল মহৎ গুণ আমার মাঝে বিদ্যমান। আমাকে অনুসরণ কর। 'কিন্তু, সত্যের আত্মা যখন আসবেন তখন পথ দেখিয়ে তোমাদেরকে নিয়ে যাবেন।" (যোহন ১৬ : ১৩) "তখন তোমরা তাকে অনুসরণ কর।" কিন্তু পক্ষপাতদুষ্ট পূর্ব সংস্কার সম্পন্নরা সহজে বিচলিত হয় না। সেজন্য আমাদেরকে কঠোরতর পরিশ্রম করতে হবে। বিশ্বাস করুন, আল্লাহ আমাদের যে তীক্ষ্ণধার সত্য দিয়েছেন তাই দিয়েই, খ্রিস্টানরা যে শ্রম নিয়োগ করছে তার তুলনায় অতি অল্প পরিশ্রমই আমরা বিশ্বে পরিবর্তন আনতে পারি।

প্রত্যাদেশের উৎস

পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা,যখন আসবেন তখন পথ দেখিয়ে তোমাদেরকে সত্যে নিয়ে যাবেন। কারণ তিনি আপনা হতে কিছু বলবেন না, কিন্তু যা যা শোনেন তাই বলবেন। — যোহন ১৬ : ১৩

বাইবেলের যে সকল উদ্ধৃতি ব্যবহার করছি সেইগুলি সবই কিং জেমস সংস্করণ থেকে। অধিকতর স্পষ্ট করার জন্য উপরের উদ্ধৃতি অন্য তিনটি ইংরেজি সংস্করণ থেকে উল্লেখ করলাম।

1. For he will not speak on his own Authority. But will tell only what he hears. (The New English Bible)

2. He will not speak On his Own; He will Speak Only What He Hears . (New International Version)

3. For he will not be presenting his Own ideas. but he will be passing on to you what he has heard. (The Living Bible)

এই সত্য আত্মা, এই সততার পয়গম্বর, আল-আমিন নিজ হতেই কোন আধ্যাত্মিক সত্য উচ্চারণ করবেন না বরং তিনি তাঁর পূর্ববর্তী পয়গম্বর সহায় হযরত ঈসা (আ) যে ভিত্তিতে বাণী উচ্চার করেছিলেন সেইভাবে তিনি তাঁর কথা বলবেন।

কারণ আমি আপনা হতে বলি নি, কিভাবে কি বলব, তা আমার পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনিই, আমাকে আজ্ঞা করেছেন। ..... পিতা আমাকে যেমন কহিয়াছেন তেমনি বলি।— যোহন ১২ : ৪৯-৫০

অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট যে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করেছেন সেখানেও বলেন :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝ عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۝

এবং সে মনগড়া কথাও বলে না; এটা তো ওহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় তাকে শিক্ষাদান করে শক্তিশালী।— কুরআন ৫৩ : ৩-৫

আল্লাহ্ তা'আলা এমনিভাবে তাঁর সকল প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত মূসা (আ) অথবা হযরত ঈসা (আ) সকলের সাথেই। এটি অবাস্তব চিন্তা যে, সত্য আত্মা হচ্ছে হোলি ঘোস্ট কারণ আমাদের বলা হচ্ছে **"তিনি নিজ থেকে কিছু বলবেন না, তিনি যা শোনেন তাই বলেন।"** তাহলে নিশ্চয় কথাগুলো নিজের থেকে বলেননি।

ঈশ্বর এক ত্রিত্ব (Trinity)

খ্রিস্টান জগতে এটা সর্বজনস্বীকৃত, সবল গোড়া খ্রিস্টান পবিত্র ত্রিত্বে বিশ্বাস করে অর্থাৎ তারা বিশ্বাস করে যে, পিতা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর, কিন্তু তিন ঈশ্বর নয়। বরং এক ঈশ্বর। রেভারেন্ড ডোমিলোর মত একজন পণ্ডিত খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্ববিদ এই অবিভাজ্যতা সম্পর্কে কি বলেন, দেখা যাক। যোহন ১৪ : ২৩ এর **"আমরা আসব "** সম্পর্কে তিনি বলেন -

"যেখানে পুত্র রয়েছে সেখানে পিতার প্রয়োজন, সঙ্গে আত্মারও প্রয়োজন। কারণ তিনি এক। এর মাধ্যমে একই ঐশ্বরিক সত্তার প্রকাশ ঘটেছে এবং তার বিভিন্ন আকৃতির অস্তিত্ব থাকছে। এর দ্বারা বর্ণিত হচ্ছে যে পবিত্র ত্রয়ীর সত্তা অচ্ছেদ্য এবং একে অপরের অন্তর্গত।"

অনুগ্রহ করে আপনারা ঘাবড়াবেন না। উপরোক্ত শাব্দিকতা সত্য সত্যই আপনাদের বুঝতে হবে না। সংক্ষেপে, খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে যে, 'তিন' (ক্ষমা করবেন, খ্রিস্টানরা বলে 'এক') সব তিনই সদা জাগত সদা উপস্থিত । তার ফলে বিষয়টি আমাদের নিকট অবাস্তব এবং হাস্যকর মনে হয়। জেরুজালেমের উপকণ্ঠে ক্যালভেরি পাহাড়ে যীশুখ্রিস্ট ক্রুশারোপিত হয়ে যন্ত্রণাদগ্ধ হয়েছিলেন। পবিত্র আত্মা পিতা অবিচ্ছেদ্য হবার কারণে পুত্রের সঙ্গে নিশ্চয়ই যন্ত্রণাদগ্ধ হয়েছিল। এবং পুত্রের যখন মৃত্যু হয় তারও মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল। তাই হয়েছে, আজ যখন পাশ্চাত্য জগতে আমরা শুনতে পাই ঈশ্বর মৃত তখন আমরা অবাক হই না। হাসবার কথা নয়, খ্রিস্টান ভাইদেরকে এই আত্মিক আবর্জনা থেকে উদ্ধার করা আজ আমাদের পবিত্র দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অধ্যায় পাঁচ

ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন

পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসবেন তখন পথ দেখিয়ে তোমাদেরকে সমস্ত সত্য নিয়ে যাবেন— যোহন (১৬ : ১৩)

ক্ষণকালের জন্য শরণার্থী

খ্রিস্টানরা ভবিষ্যদ্ববাণীর বাস্তবায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। হযরত মুহাম্মদ (সা) তাদের পুরাতন ও নতুন নিয়ম বাইবেলের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত করেছিলেন। তাদের নিকট ভবিষ্যৎ ঘটনার বর্ণনা প্রকৃত পয়গম্বরের কাজ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

ইসলামের পয়গম্বর অনেক ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করেছেন যেগুলি কুরআন শরীফে বিধৃত আছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হল।

اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ؕ

১। যিনি তোমার জন্য কুরআনকে করেছেন বিধান তিনি তোমাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবেন প্রত্যাবর্তন স্থানে। — কুরআন ২৮ : ৮৫

এখানে প্রত্যাবর্তন স্থানে বলতে মক্কা শরীফকে বোঝানো হয়েছে। যখন হয়তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় গমন করেন সেই সময়কে হিজরত বলা হয়। তখন সময়টি ছিল ভীষণ খারাপ। তার অধিকাংশ অনুসারী মদীনায় চলে গিয়েছে। এবার তাঁর যাবার পালা। হযরত আবু বকর (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে যুহফা নামক স্থানে যখন পৌঁছলেন তখন আল্লাহ্র তরফ থেকে

এই সান্ত্বনা দেওয়া হলো যে তিনি আবার তার জন্মস্থান মক্কা শরীফে প্রত্যাবর্তন করবেন এবং তাই তিনি করেছিলেন।

তিনি শরণার্থী হিসেবে গিয়েছিলেন এবং আল্লাহ তাঁকে বিজয়ীরূপে ফিরিয়ে আনলেন। এখানে উপরের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়েছিল।

"And he (Moses) said, The Lord came from Sinai. and rose from Seir unto therm; he shined forth from mount Paran (that is in Arabia), and he (Muhammed) came with ten thousand Saints* from his right hand went a fiery law for them" - (Deuteronomy 33:2)

তিনি (মূসা) কহিলেন, সদাপ্রভু সীনয় হতে আসলেন, সেয়ীর হতে তাদের প্রতি উদিত হলেন, পারন পর্বত (আরব দেশে) হতে আপন তেজ প্রকাশ করলেন, অযুত অযুত পবিত্রের (সাহাবা) নিকট হতে এলেন তাদের জন্য তাঁর দক্ষিণ হস্তে অগ্নিময় ব্যবস্থা ছিল। দ্বিতীয় বিবরণ — ৩৩ : ২

বৃহৎ শক্তির সংঘাত

غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۝ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۝ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۭ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ۭ وَيَوْمَىِٕذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

২। রোমকগণ পরাজিত হয়েছে নিকটবর্তী স্থলে, কিন্তু তারা তাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে কয়েক বছরের মধ্যে। পূর্বের ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহ্রই। আর সে দিন মু'মিনগণ হর্ষোৎফুল্ল হবে।

— কুরআন ৩০ : ২-৪

৬১৫/১৬ খ্রিস্টাব্দে রাসূলুল্লাহ্র নিকট উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী প্রত্যাদেশ হিসাবে নাযিল হয়েছিল। রোমের খ্রিস্টান সাম্রাজ্য পারস্যের জেরুজালেম হারিয়েছিল। এবং তারা ধূলায় অবনমিত হয়েছিল। সেকালের বৃহৎ শক্তি

*হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের সময় দশ হাজার সাহাবা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।

ধ্বংসযজ্ঞে মক্কার মুশরিকরা পৌত্তলিক পারসিক কর্তৃক রোমানদের পরাজয়ে বিশেষ আনন্দ অনুভব করেছিল।

পৌত্তলিক আরবরা স্বাভাবিকভাবেই পৌত্তলিক ইরানীদের সহমর্মী ছিল এবং তাদের ধ্বংসাত্মক কাজে তারা আনন্দ অনুভব করেছিল- ভেবেছিল রোমের খ্রিস্টান শক্তির পরাজয় অর্থ রাসূলের বাণীর পরাজয়। অর্থাৎ ঈসা (আ)-এর প্রকৃত উত্তরসূরীর বাণীর পরাজয়। .... যখন সমগ্র বিশ্ব মনে করেছিল পারস্য কর্তৃক রোম সাম্রাজ্য পরাজিত হয়েছে তখন তার নিকট পরিদৃষ্ট হয়েছিল যে পারস্যের এই বিজয় স্বল্প ক্ষণস্থায়ী। এবং অল্প কয়েক বছরের মধ্যে রোমকরা আবার জয়ী হবে এবং পারস্যকে চরম আঘাত হানবে। - আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী

মাত্র দশ বছরের মাথায় এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়েছিল।

কুরআন শরীফের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী আহবান

৩। রাসূলুল্লাহ (সা) দাবি করেছিলেন যে পবিত্র কুরআন আল্লাহর নিকট হতে নাযিল হয়েছে এবং তার নিকট এই পবিত্র কুরআন এসেছে। এর ঐশ্বরিক রচনার প্রমাণ রয়েছে এর সৌন্দর্যে, এর প্রকৃতিতে এবং এই পবিত্র কুরআন যে পরিবেশে প্রচারিত হয়েছে তার মধ্যে। তিনি তার দাবির সত্যপরায়ণতা প্রমাণের জন্য আমাদের সম্মুখে অনেক সূরা উপস্থাপন করেছেন। অবিশ্বাসীরা কী অনুরূপ গ্রন্থ তৈরি করতে পারে? এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের আহবান আজও বর্তমান রয়েছে। এই মহা গ্রন্থে যে-কোন অধ্যায়ের সফল প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা সমমানের অথবা উৎকৃষ্টতর রচনা নির্মাণে মানব জাতির অক্ষমতা সম্পর্কে এক চিরকালীন ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে।

আপনি যদি বলেন, "আমি আরবি জানি না"-একথা অর্থহীন কারণ বর্তমানে লক্ষ লক্ষ আরব খ্রিস্টান রয়েছে তারা গর্ব করে বলে একমাত্র মিসরেই কমপক্ষে দশ থেকে পনর মিলিয়ন কপটিক খ্রিস্টান রয়েছে। তারা কেউ ফেল্লাহীন নয়। (আরব দেশীয় কৃষক মজুর) এখানে আল্লাহ্র নিজের ভাষায়, পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের বিপক্ষে, যে আহবান জানিয়েছে, তা দেওয়া গেল :

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

ক) এই কুরআন আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারো নয়।— কুরআন ১০ : ৩৭

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ
بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ۝

খ) বল, যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ আনয়ন করতে পারবে না। — কুরআন ১৭ : ৮৮

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ
دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

গ) তারা কি বলে, "সে এটি রচনা করেছে?" বল, 'তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরাই আনয়ন কর। এবং আল্লাহ ব্যতীত অপর যাকে পার আহবান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও ।— কুরআন ১০ : ৩৮

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۠
وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ فَاِنْ لَّمْ
تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ
اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ۝

ঘ) আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহবান কর। যদি তোমরা আনয়ন না কর এবং কখনই করতে পারবে না, তবে সেই আগুনকে ভয় কর মানুষ এবং পাথর হবে যার ইন্ধন, কাফেরদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে। — কুরআন ২ : ২৩-২৪

উপরোক্ত দাবি আজ হতে ১৪শ বছর পূর্বে করা হয়েছে ; কিন্তু মানব জাতি আজ অবধি তার চেয়ে উৎকৃষ্ট অথবা অনুরূপ বা সমমানের কোন কিছু তৈরি করতে পারেনি। কুরআন শরীফের ঐশ্বরিক উৎস সম্পর্কে এটাই চিরস্থায়ী প্রমাণ।

আরব খ্রিস্টানদের প্রচেষ্টা

মধ্যপ্রাচ্যের আরব খ্রিস্টানগণ এক ষোলসালা প্রকল্প হাতে নিয়ে নতুন নিয়ম আরবি বাইবেলের কিছু নির্বাচিত অংশ তৈরি করেছে, সেখানে আরবি কুরআন শরীফের হুবহু শব্দ ও বাক্যাংশ ধার করে তারা সেটি করেছে। এটি তাদের এক নির্লজ্জ চোরামির এক নিচতম প্রচেষ্টা। এই নতুন আরবি বাইবেলের প্রতিটি অধ্যায়ের প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম' (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে) বসানো হয়েছে। সেটাকে তো পরাস্ত করতে পারলে না?

কুরআন ও হাদীসের আরও অনেক ভবিষ্যদ্বাণী ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান রয়েছে। সেইগুলি আরও বর্ণনার সাহায্যে অর্থ পরিষ্কার করা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রটি আজও অবহেলিত রয়েছে। সম্ভবত বহু গ্রন্থ এই বিষয়ে রচনা করা সম্ভব। আমি বিশ্বাস করি মুসলিম পণ্ডিতগণ এই দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। কালামে পাক থেকে আর একটি মাত্র ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টির সমাপ্তি টানছি।

ইসলাম চিরঞ্জীব

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ
عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝

ঙ) তিনি তার রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়ত ও সত্য দীনসহ সকল দীনের উপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য যদিও মুশরিকগণ তা অপছন্দ করে।— কুরআন ৬১ : ৯

কয়েক দশকের মধ্যে উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণিত হয়েছিল। ইসলাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। সেকালের দুইটি বৃহৎ শক্তি পারস্য ও রোম মুসলমানদের নিকট পরাভূত হল এবং কয়েক শতাব্দী জুড়ে ইসলাম আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত সগৌরবে মাথা উঁচু করে রইল।

দুর্ভাগ্য, আজ মুসলমানরা কর্মতৎপরতাহীন অবস্থার মধ্যে পতিত হয়ে রয়েছে। কিন্তু ভয়ের কিছু নেই। বিশ্ব ইসলাম আবার জেগে উঠছে। আশা আছে। এমনকি পশ্চিমের অমুসলিম ভবিষ্যৎ দ্রষ্টারা বলছেন যে এর ভাগ্য আকাশচুম্বী।

"আফ্রিকার মহাদেশ সকল ধর্মের জন্য এক খোলা মাঠ। কিন্তু আফ্রিকাবাসীরা সেই ধর্ম গ্রহণ করবে যা তাদের জন্য উপযুক্ত। যে ধর্মে সকলের কথা বলার অধিকার রয়েছে, সেই ধর্ম ইসলাম যা তাদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম।" (H.G. Wells)

" আগামী একশত বছরের মধ্যে যদি কোন ধর্মের পক্ষে ইংল্যাণ্ড জয়ের সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই ধর্ম ইসলাম।"—জর্জ বার্নাড 'শ

মুসলমানদের কোন প্রকার সত্যিকারের প্রচেষ্টা ছাড়াই বর্তমান বিশ্বে ইসলাম ধর্ম সর্বাপেক্ষা দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। এ কথা পশ্চিমারাই বলে থাকেন। আশা করি এই সুসংবাদ লাভের পর আমরা যেন ঘুমিয়ে না পড়ি। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য হতে বাধ্য। আমরা সেখানে পৌঁছবই। তবে সেই জন্য আমাদের মুসলমানদের সামান্য প্রচেষ্টা প্রয়োজন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সবই পরিবর্তিত হতে পারে। তার ইচ্ছায় জাতি ধর্ম সবই বদলে যেতে পারে। কিন্তু তিনি আমাদেরকে তার ধর্ম (দীন)-কে সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। সেই জন্য কিছু করার সুযোগ দিয়েছেন । এই যুদ্ধের উপযুক্ত সৈনিক হতে হলে যোহন ১৬:৭ একাধিক ভাষায় মুখস্থ করে নিন, দেখবেন আল্লাহ্ আপনাকে জ্ঞানদান করবেন। প্রভুত্ব করাই আমাদের ভাগ্য। সম ইজমকে অতিক্রম করুন। অবিশ্বাসীরা ইসলামের বাণী শুনতে যতই ঘৃণা বা অনিচ্ছা প্রকাশ করুক না কেন আপনি আপনার কাজ করতে থাকুন।'

ঈসা (আ)-কে মহিমান্বিত করা

তিনি আমাকে মহিমান্বিত করবেন; কেননা যা আমার, তাই নিয়েই তোমাদেরকে জানাবেন। — যোহন ১৬ : ১৩

যাকে আমি পিতার নিকট হতে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব, সত্যের সেই আত্মা, যিনি পিতার নিকট হতে বড় হয়ে আসেন। যখন সেই সহায় আসবেন -তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন।"— যোহন (১৫ : ২৬)

এই প্রতিশ্রুতি সহায় অথবা এমনকি আত্মা যার মধ্যে সত্যের মূর্ত প্রকাশ ঘটেছে তিনি যখন আসবেন তখন তিনি মসীহর সততা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন এবং তার শত্রুদের প্রদত্ত চরিত্র হননকারী মিথ্যাকে খণ্ডন করবেন।

এই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল আমিন, সত্যের পয়গম্বর অনতিবিলম্বে সক্ষম হয়েছিলেন ঐ কাজগুলি করতে। তিনি সম্ভব করেছেন যে জন্য আজ কোটি কোটি মুসলমান বিশ্বাস করে যে যীশু খ্রিস্ট আল্লাহ্‌র একজন প্রধান রাসূল। তারা বিশ্বাস করে তিনি মসীহ, তারা বিশ্বাস করে যে তার জন্ম অলৌকিকভাবে হয়েছিল। অথচ বর্তমানের অনেক আধুনিক খ্রিস্টান ও এমনকি পাদ্রীরাও সেটা বিশ্বাস করতে চায় না। তাছাড়া মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে তিনি অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছিলেন, এমনকি আল্লাহর ইচ্ছায় মৃতকে জীবিত করেছেন। অন্ধকে দৃষ্টিদান করেছেন এবং কুষ্ঠ রোগাক্রান্তকে রোগমুক্ত করেছেন। কী অসাধারণ শক্তিশালী সাক্ষ্য। কুমারী মেরীকে তার গর্ভে যীশু খ্রিস্ট জন্মগ্রহণ করাবেন বলে যে বার্তা জিব্রাইল (আ) তাকে জ্ঞাপন করেছিলেন তার কাহিনী আরও হৃদয় মন্থনকারী ভাষায় শোনা যেতে পারে।

অলৌকিক গর্ভ ধারণ

"বর্ণনা কর এই কিতাবে উল্লেখিত মরিয়মের কথা, যখন সে তার পরিবারবর্গ হতে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল।

অতঃপর তাদের হতে নিজকে আড়াল করবার জন্য সে পর্দা করল। অতঃপর আমি তার নিকট আমার রূহকে পাঠালাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্ম প্রকাশ করল।

মরিয়ম বলল, তুমি যদি আল্লাহকে ভয় কর তবে আমি তোমা হতে দয়াময়ের শরণ নিচ্ছি।'

সে বলল, 'আমি তো কেবল তোমার প্রতিপালক -প্রেরিত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করবার জন্য।' মরিয়ম বলল, 'কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণী নই?'

সে বলল, 'এরূপ হবে।' তোমার প্রতিপালক বলেছেন, এটি আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমি তাকে এজন্য সৃষ্টি করব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার নিকট হতে এক অনুগ্রহ; এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।'

إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا

(তৎপর সে গর্ভে তাকে ধারণ করল) অতঃপর তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল।— কুরআন ১৯ : ১৬

বর্তমান বিশ্বে এক বিলিয়ন মুসলমান রাসূলের নির্দেশে ঈসা (আ)-এর অলৌকিক জন্ম বিশ্বাস করেন। ঈসা (আ) তার মা মেরী এবং সমস্ত খ্রিস্টান জগত এই জন্য আল-আমিন (আ) প্রতিকী তথা সত্যের আত্মাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিতে পারে না।

ঈসা (আ)-এর প্রতি ইহুদীদের প্রতিক্রিয়া

হা ইয়ারূশালেম, ইয়ারূশালেম, তুমি ভাববাদীগণকে বধ করে থাক, ও তোমার নিকটে যারা প্রেরিত হয় তাদেরকে পাথর মেরে থাক, কুক্কুটি যেমন আপন শাবকদেরকে পক্ষের নিকট একত্র করে তদ্রূপ আমিও কতবার তোমার সন্তানদেরকে একত্র করতে ইচ্ছা করেছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হলে না।

— মথি ২৩ : ৩৭

এই মহান পয়গম্বর আল্লাহ্‌র রাসূল ইহুদীদের পিছনে যেমন মুরগী তার ছানার পিছনে ছুটে বেড়ায় তেমনি ছুটেছিলেন কিন্তু তারা শকুনের মত তাকে ছিন্ন ছিন্ন করতে চেয়েছিল। ক্রমাগত নিষ্ঠুর আচরণ ও অত্যাচার করেও সন্তুষ্ট না হয়ে তারা তার জীবনের উপর আক্রমণ করেছিল। তারা তার মাকে পাপী বলে দোষারোপ করেছিল।

وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ۝

এবং তারা লা'নতগ্রস্ত হয়েছিল তাদের কুফরীর জন্য এবং মরিয়মের বিরুদ্ধে গুরুতর অপবাদের জন্য।— কুরআন ৪ : ১৫৬

মারাত্মক মিথ্যা অভিযোগটি কী ছিল? প্রকৃত কলঙ্কের অপবাদের কাছাকাছি প্রায়। সে ক্ষেত্রে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যীশুকে যিনি মহিমান্বিত করেছেন, তিনি উচ্চারণ করলেন :

يٰٓاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ۝

হে হারূন-ভগ্নি! তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিল না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী।— কুরআন– ১৯ : ২৮

তালমুদ গ্রন্থধারীরা কি বলে

ইহুদীরা এখানে অভিযোগ করেছে যে যীশুর জন্ম অবৈধ। তারা মেরী সম্পর্কে ব্যভিচারের বদনাম আরোপ করেছে। মেরীর সতীত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। কিন্তু কুরআন শরীফের সেই জঘন্য বদনাম সামান্যতমভাবে উচ্চারিত হয়নি। কুরআন শরীফের বক্তব্যের সঙ্গে প্রসিদ্ধ খ্রিস্টান পাদ্রী ডুমেলোর বর্ণনা তুলনা করা যেতে পারে। খ্রিস্টানদের শত্রু সম্পর্কে অপবাদ দিতে গিয়ে তারা কি ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছে "ইহুদী তালমুদ বিশেষজ্ঞরা বলে, 'ব্যভিচারিণীর (পবিত্র মেরী) পুত্র মিশর থেকে জাদু নিয়ে এসেছিল। নিজের মাংস কেটে যীশু জাদু দেখাত, ধোঁকা দিত এবং ইসরাইলীদেরকে পৌত্তলিকতার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। অপরপক্ষে বিষয়টি লক্ষণীয় যে মাহমেটই এই সকল ইহুদীদের দেয়া অপবাদকে অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে খণ্ডন করেছেন। (ডুমেলোর বাইবেল ভাষ্য)

ইভানজালিস্টরাও ইহুদীগণের সঙ্গে একমত

ম্যাকডোয়েল তালমুদ ধর্মতত্ত্ব সেমিনারের একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র তিনি ৫৩ টি দেশের ৫৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৫০ লাখ ছাত্রকে পড়িয়েছেন। ইতিপূর্বে যে সকল বাইবেল বিশেষজ্ঞের তাদের চেয়ে ইহুদীদের তালমুদ গ্রন্থের তার প্রভু গবেষণা জন্ম সম্পর্কে অনেক বেশি গবেষণা করেছে। তার গ্রন্থ "যে সাক্ষ্য বিচারকের রায় চায়" সেখানে তিনি যীশু যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন সেটাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। সেখানে তিনি ব্যাপকভাবে তালমুদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যেমন : যীশুকে বেন-পানদেরা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর সিমন কে আজাই যীশু সম্পর্কে বলেন, আমি জেরুযালেমের একটি বংশ লতিকা দেখছি সেখানে বলা হয়েছে যে তিনি জারজ সন্তান ছিলেন।"

"মিশনাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে তার সম্পর্কে যা বলা হল তাতে কোন সন্দেহ নেই।"

পাদ্রীরা জিহ্বা কামড় দেয়

যীশুর উপাসক, পবিত্র আত্মায় ভরপুর, পুনরায় জন্মবাদী খ্রিস্টান এবং একজন মহান ইভানজালিস্ট ম্যাগডোয়েল যখন তার প্রভু ও ঈশ্বর যীশুর শত্রুদের দেওয়া অপবাদ উল্লেখ করতে গিয়ে জিহ্বায় কামড় দেয়। তার বই খ্রিস্টান জগতে বেস্ট সেলার। সেখানে ঈসা (আ)-এর জন্ম সম্পর্কে যে কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তার আর উল্লেখ করলাম না। এরাই যদি যীশুর বন্ধু হয় তাহলে আর শত্রু থাকায় দোষ কি?

যোহন অধ্যায়ে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তার সপক্ষের বন্ধু সহায়, সাহায্যকারী, সান্ত্বনা দানকারী হচ্ছেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।" লক্ষণীয় যে ইহুদীদের অপবাদ মুখ্যামেড ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন।"

অধ্যায় ছয়

অতিভক্তি

এখন সত্য আত্মা, মসীহ্ সম্পর্কিত ইহুদী এবং খ্রিস্টানদের বিতর্কে অতিভক্ত খ্রিস্টান ও ইহুদীদের ভূতদের সম্মুখে সহজভাবে সমাধান উপস্থাপন করেন, তা দেখা যাক। ইহুদীরা যীশুকে অর্থাৎ মেরীর পুত্রকে অবৈধ বা জারজ হিসাবে বর্ণনা করেছেন কারণ যীশু বলতে পারেননি তার পিতা কে ছিলেন। অপর দিকে খ্রিস্টানরা একই কারণে তাকে ঈশ্বর বানিয়ে ফেলেছে এবং ঈশ্বরকে তার জন্মদাতা বানিয়েছে। কুরআন শরীফের একটি আয়াত এগুলোকে ভ্রান্ত বলে আসল সত্য প্রকাশ করেছে :

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰىهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۫ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

হে কিতাবীগণ! দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না ও আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলো না।

মরিয়ম-তনয় ঈসা মসীহ আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁর বাণী,যা তিনি মরিয়মের নিকট প্রেরণ করেছিলেন ও তাঁর আদেশ।

সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে ঈমান আন এবং বলো না 'তিন!' নিবৃত্ত হও, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে।

আল্লাহ্ তো একমাত্র ইলাহ্; তাঁর সন্তান হবে-তিনি এর অনেক উর্ধ্বে। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্রই; কর্ম-বিধানে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। কুরআন ৪ : ১৭১।

উপরের আয়াতের তফসীর

যেমন কোন নির্বোধ অতি অনুগত কর্মচারী বা চাকর অত্যধিক আনুগত্যের উৎসাহ প্রদর্শন করতে গিয়ে বিপদগামী হয় তেমনি ধর্মের ক্ষেত্রেও এইরূপ ঘটে থাকে যার ফলে ধর্মের প্রকৃত সত্যকে মানুষ বিকৃত করে ফেলে।

যীশুখ্রিস্টকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য ইহুদীদের এই প্রকার অত্যধিক আপন ধর্ম আনুগত্য, জাতি বৈষম্য অতি আনুষ্ঠানিকতা-এইগুলিকে কুরআন শরীফে বিভিন্ন জায়গায় প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এখানে খ্রিস্টানদের মনোভাবকে নিন্দা করা হয়েছে। কারণ খ্রিস্টান মনোভাব যীশুকে ঈশ্বর সমান বানিয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মেরীকে ভক্তি করতে গিয়ো তারা পৌত্তলিক পর্যায়ে পৌঁছেছে, ঈশ্বরকে বলেছে যে তার এক শারীরিক পুত্র ছিল আবার ত্রিত্বে তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে যা কিনা কোন যুক্তিতেই খাপ খায় না। অন্যদিকে খ্রিস্টানদের কোন কোন ফেরকা যেমন আথানসিয়ান ফেরকা বা শাখা এমনও বলে যে কেউ যদি ত্রিত্বে বিশ্বাস করে তাহলে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। কুরআন শরীফের উপরোক্ত আয়াতে যীশু সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে তার অর্থ

(১) তিনি মেরী নামক এক মহিলার পুত্র ছিলেন অতএব তিনি মানুষ ছিলেন,

(২) কিন্তু তিনি প্রেরিত পুরুষ ছিলেন, আল্লাহ্র কাজের দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন, অতএব তাকে অবশ্যই যথাযথ সম্মান করতে হবে।

(৩) আল্লাহ বলেন 'হও' (কুন) আর হয়ে যায়। তেমনিভাবে আল্লাহর এই শব্দ মেরীকে দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি সৃষ্ট হয়েছিলেন।

(৪) আল্লাহ্র নিকট হতে তার আত্মা এসেছিলেন কিন্তু তিনি আল্লাহ নন। তার জীবন ও কর্ম অন্যান্য প্রেরিত পুরুষদের অপেক্ষা সীমিত ছিল তথাপি তাকে সমানভাবে আল্লাহর রাসূল হিসেবে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। এই ত্রিত্ব তত্ত্ব আল্লাহ্র সমান পর্যায়ের, আল্লাহর পুত্র গণ্য করা এইগুলি হচ্ছে অশালীন ভাষায় ধর্মকে আক্রমণ করা ও ঈশ্বর নিন্দা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আল্লাহ্ সব কিছু থেকে সকল প্রয়োজন হতে মুক্ত তার কার্য সম্পাদনের জন্য কোন সন্তানের প্রয়োজন নেই। (আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী)

কোন কিছুই নিজ থেকে নয়

আপনি যখন বলেন যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যের আত্মা উপরোক্ত আয়াত লিখেছিলেন এবং তাকে অতিরিক্ত ক্ষমতাবান বলে বলেন যে তিনি মহাগ্রন্থ কুরআনের অবশিষ্ট ছয় হাজারের অধিক আয়াত রচনা করেছেন তখন সেটাও অতিরিক্ত হয়ে যায়। বারবার এই মহাগ্রন্থে বলা হয়েছে,

اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝

ইহা তো ওহী যাহা তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।— কুরআন ৫৩ : ৪

ঈসা (আ) বা যীশু ঠিক তেমনিভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন "কারণ তিনি আপন হতে কিছু বলবেন না, কিন্তু যা শুনেন, তাই বলবেন।"

— যোহন ১৬ : ১৩

খ্রিস্টান ট্রাইলেমা

অপর সহায় যা কিছু বললেন বা সম্মান প্রদর্শন করলেন তাতে খ্রিস্টানরা প্রশমিত হল না। কারণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিকৃত রুচির পূর্ব-ধারণাকে উৎসাহিত করেননি। তাদের নিকট প্রশংসা করার অর্থ যীশুকে অস্বীকার করা, তাকে ঈশ্বর বানানো। তাদের সমস্যা হল যীশু কি মানুষ হিসেবে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলেন নাকি ঈশ্বর হিসেবে মারা গিয়েছিলেন এ এক মহা সমস্যা। এখন সেই জন্য তারা ট্রাইলেমা আবিষ্কার করেছে। ডাইলামার বদলে ট্রাইলেমা যার অর্থ বিশ্বের কোন অভিধানে পাওয়া যায় না। কেম্পাস ক্রুসেড ফর খ্রিস্ট ইন্টারন্যাশনাল-এর ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি জনাব যোহশ মেকডোয়েল তার গ্রন্থ এভিডেন্স দেট ডিম্যান্ড ভারডিক্ট গ্রন্থে সাত অধ্যায়ে সত্য সত্য তার নতুন ধাঁ ধাঁ অথবা কঠিন প্রশ্ন - "ট্রাইলেমা লর্ড লায়ার অব লুনাটিক?" ব্যবহার করেছেন। এখন ভেবে দেখুন এই তিন ইংরেজি 'এল' অক্ষরের অর্থ কি? তিনি চাচ্ছেন যে তার পাঠকরা এই প্রশ্নের উত্তর দিক যে যীশু খ্রিস্ট তোমার প্রভু (ঈশ্বর, অথবা তিনি একজন মিথ্যাবাদী অথবা উন্মাদ ছিলেন)।

(১) স্বীকার না করে উপায় নেই যে, এ এক অভাবনীয় উদ্ভাবনী শক্তি। কোন মুসলমানের এমন সাহস হবে না যে তারা যীশুখ্রিস্টকে মিথ্যাবাদী বা উন্মাদ বলবে। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? এ তো দোদুল্যমানতার অধিক। প্রকৃতপক্ষে সর্বোচ্চ পর্যায়ের "ব্লাসাম ফেমি" অর্থাৎ অশালীন ভাষায় ঈশ্বর নিন্দা। কিন্তু তারা পূর্ব ধারণার বশবর্তী হয়ে আজো অন্ধ। প্রসিদ্ধ দার্শনিক রোজার বেকন যথার্থ বলেছেন "মানুষ সহজেই নিজের ঘরে আগুন দিতে পারে; কিন্তু পূর্ব ধারণা ত্যাগ করতে পারে না"।

শিশুর জ্ঞান

কোন মানুষকে যদি বলা হয় যে তিনি ঈশ্বরের অবৈধ সন্তান অথবা তার পিতা ঈশ্বর এর দ্বারা তাকে সম্মান প্রদর্শন কল্পা হয় না। বরং অপমান করা হয়। ফরাসী দেশের একজন সাধারণ চাষীও এই পার্থক্য অনুধাবন করতে পারে, অথচ মহামহা পণ্ডিত খ্রিস্টান পাদ্রী আজকের জগতে গর্বভরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তারা বুঝতে পারেন না।

শোনা যায় ফ্রান্সের রাজা পঞ্চদশ লুই লম্পট প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কোন মহিলা এই দুশ্চরিত্রের হাত থেকে নিরাপদ ছিল না। তার মৃত্যুর পর যখন তার পুত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট তখন একদিন এক গুজব শোনা গেল যে নবীন রাজার মত দেখতে হুবহু এক চেহারার এক লোক প্যারিসে ঘুরে বেড়াচ্ছে । নতুন রাজার ঔৎসুক্য জাগলো যে লোকটিকে দেখা দরকার- যে নাকি দেখতে অবিকল তার মত। গরীব কৃষকের ভিতরের খবর জানার জন্য তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, "আমার বাবার রাজত্বকালে তোমার মা-কি কোনদিন প্যারিস এসেছিল?" সে বলল "না আমার মা তো আসেনি, বাবা এসেছিল।" এ জবাবটা ছিল রাজার জন্য মৃত্যুঘন্টার সামিল। কিন্তু তিনি তো এটাই চেয়েছিলেন।

চরম পর্যায়ে না যাওয়াই উত্তম

যীশু ও তার মা'র প্রতি ঘৃণাবোধ থেকে ইহুদীদের যে অশালীনতা তা যেমন মন্দ তেমনি যীশুর প্রতি খ্রিস্টানদের অতিভক্তিও মন্দ। হযরত মুহাম্মদ (সা) এই প্রকৃতির সীমালঙ্ঘনকে নিন্দা করেছেন এবং তিনি যীশু তথা ঈসা (আ)-কে তার যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি তাকে একজন মহান পয়গম্বর ও মসীহ বলে সম্মান করেছেন। তাকে ভালবাসা সম্মান কর, তাকে অনুসরণ কর কিন্তু তাকে পূজা করো না। কারণ, পূজা একমাত্র ঈশ্বরের প্রাপ্য-আল্লাহর প্রাপ্য- যিনি আরশে সমাসীন।

এটাই প্রকৃত সম্মান

তিনি আমাকে মহিমান্বিত করলেন।— যোহন ১৬ : ১৪

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ঐতিহাসিকভাবে, নৈতিকভাবে এবং পয়গম্বরের দিক থেকেও আল্লাহ্‌র সর্বশেষ ও চূড়ান্ত প্রেরিত পুরুষ-রাসূল। তিনিই সত্য আত্মা, তিনি একমাত্র পথ প্রদর্শক যিনি মানব জাতিকে সর্বসত্যে পথ প্রদর্শন করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি যীশুখ্রিস্টের প্রকৃত উত্তরাধিকারী।

আল্লাহর ওয়াস্তে আপনারা নীরবে বসে না থেকে কিছু কাজ করুন। যে কোন প্রকার প্রশ্ন অথবা মন্তব্য অথবা সমালোচনা সানন্দে গ্রহণীয়।

আহমেদ দীদাত

(খাদেমুল ইসলাম)

পরিশেষ

প্রিয় পাঠক, অনেকে বলতে পারেন যে, কিছু সংখ্যক খ্রিস্টধর্ম প্রচারক পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য ও যুক্তির বিপক্ষে খ্রিস্টান বাইবেলে প্রেরিতদের কার্য অধ্যায়ে 'পেন্টাকোস্টাল' -এর কথা দাঁড় করতে পারে। 'পেন্টাকোস্ট' ছিল ইহুদীদের ফসল তোলার পঞ্চদশ দিবসের অনুষ্ঠিত একটি দিবস। ঐ দিন দূর-দূরান্ত হতে ইহুদীরা যেরুজালেমে এসে ভোজ উৎসবে যোগদান করত। পিটার এগারজন সহ এক জায়গায় উপবিষ্ট ছিলেন। তখন অকস্মাৎ শুনতে পেলেন তাদের মাথার উপরে এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় আকাশে গর্জন করছে। তখন সমস্ত লোকেরা বজ্রাহতের ন্যায় হতভম্ভ হয়ে এক অজানা ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করল, কেউ কারো কথা বুঝতে পারছিল না। কেউ কেউ উল্লসিত হল, কেউ বিদ্রূপ করতে লাগল, বলল-তারা সব মাতাল। তখন তাদের মনে পড়ল বাবেল (আদিপুস্তক ১১:৯) শহরের অর্থহীন কথা।

খ্রিস্টান মিশনারীরা বলে থাকে-যোহন অধ্যায়ের ১৪,১৫,১৬ পঙ্‌ক্তিতে যে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে এখানেই তার বাস্তবায়ন। এ ঘটনাই নাকি সেই ভবিষ্যৎ বাণীর বাস্তবায়ন। এই সমগ্র নাটক যতই অবিশ্বাস্য হোক না কেন, প্রভু যাকে নিযুক্ত করেছিলেন সেই পিটার, যাকে নাকি তিনি বলেছিলেন "আমার মেশশাবকগণকে চরাও .....আমার মেশগণকে পালন কর।"— যোহন ২১ : ১৫-১৬; তিনি তার শিষ্যদের সমর্থন করে বললেন- এরা কেউ মাতাল নয়। এত সকালে কেউ মাতাল হয় না।

কিন্তু এটা তাই যা ভাববাদী জোওয়েল বলেছিলেন।

— প্রেরিতদের কার্য ২ : ১৬

উপরের ঐ ঘটনাকে বলা হয় পেন্টেকোস্টা। এটি ছিল জোওয়েল নামে এক পয়গম্বরের ভবিষ্যৎদ্বাণী। পেন্টোকোস্ট ঈসা (আ)-এর কোন ভবিষ্যদ্বাণী নয়। খ্রিস্টান জগৎ বিশ্বাস করে যে, পিটার অনুপ্রাণিত হয়ে এই বিষয়টি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। দুটোই সম্ভব পবিত্র আত্মার সুরসুরি। পেন্টেকোস্টাল দিবসে যীশুর প্রেরিতরা যে বিড়বিড় করে ভেড়ভেড় করে কি বলেছিল তার কোন অর্থ কোথাও পাওয়া যায় না। তবুও সেই সহায় মানব জাতির সৎ পথ প্রদর্শন, এতেই প্রমাণিত হয় সহায় ও পবিত্র আত্মা এক নন।

বাইবেলে হযরত মুহাম্মদ (সা)

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বাইবেলের ভাষ্য

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ط

বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি এই কুরআন আল্লাহ্‌র নিকট হতে অবতীর্ণ হয়ে থাকে আর তোমরা এতে অবিশ্বাস কর অথচ বনী ইসরাইলের একজন এর অনুরূপ কিতাব সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং এতে বিশ্বাস স্থাপন করল, আর তোমরা ঔদ্ধত্ব প্রকাশ কর, তাহলে তোমাদের কি পরিণাম হবে?"— কুরআন ৪৬ : ১০

সম্মানিত সভাপতি, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আজকের সন্ধ্যায় আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে **'হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বাইবেলের ভাষ্য।** আপনাদের অনেকের নিকট আশ্চর্য মনে হচ্ছে কারণ বক্তা একজন মুসলমান এবং তিনি বাইবেল ও ইহুদী ধর্মগ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যাখ্যা করছেন।

চল্লিশ বছর আগের কথা, তখন আমি অল্পবয়স্ক এক যুবক হিসেবে ডারবান শহরের রয়াল থিয়েটার মঞ্চে অনুষ্ঠিত রেভারেণ্ড হিটেন নামের এক খ্রিস্টান ধর্মযাজকের ধারাবাহিক বক্তৃতা শুনছিলাম।

পোপ না, কিসিঞ্জার?

সেই রেভারেন্ড ভদ্রলোক বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি ব্যাখ্যা করছিলেন। তিনি এমন কথাও বলেছিলেন যে, খ্রিস্টান বাইবেলে নাকি সোভিয়েট রাশিয়ার উত্থান

সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, এমনকি তাদের পরিণতির দিনগুলো সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। বলতে বলতে এক পর্যায়ে তিনি বলতে লাগলেন যে, বাইবেলে নাকি পোপ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে বাকি রাখেনি। শ্রোতৃমণ্ডলীকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি দারুণ উৎসাহের সঙ্গে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, প্রত্যাদেশ অধ্যায় (নিউ টেস্টামেন্টের সর্বশেষ অধ্যায়) যে 'পশু—৬৬৬—এর উল্লেখ রয়েছে তিনি হচ্ছেন পোপ অথচ যিনি পৃথিবীতে খ্রিস্টের ভিকার বা প্রতিভূ। খ্রিস্টান রোমান ক্যাথলিক ও খ্রিস্টান প্রোটেস্ট্যান্টদের ঝগড়ার মধ্যে আমাদের মুসলমানদের প্রবেশ করা শোভা পায় না। তবু প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে, এ সম্পর্কে প্রোটেস্ট্যান্টদের সর্বশেষ ব্যাখ্যা হচ্ছে খ্রিস্টান বাইবেলের 'পশু—৬৬৬ তিনি হচ্ছেন হেনরী কিসিঞ্জার। খ্রিস্টান পণ্ডিতেরা তাদের কোন বিষয় প্রমাণ করার জন্য অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে পারে।

রেভারেণ্ড হিটেনের বক্তৃতা আমাকে প্রশ্ন করতে উদ্বুদ্ধ করছিল যে, বাইবেলে যখন এত ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে— এমনকি 'পোপ', 'ইসরাইল'ও বাদ যায়নি তখন মানবকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ হিতৈষী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে অবশ্যই কিছু ভবিষ্যদ্বাণী থাকবে।

যুবক বয়সেই এই প্রশ্নের জবাব অন্বেষণে ব্রতী হলাম। একের পর এক খ্রিস্টান ধর্মযাকদের সাথে সাক্ষাৎ করতাম, তাদের বক্তৃতা শুনতাম এবং বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত যা কিছু হাতের কাছে পেতাম তাই পাঠ করতাম।

আজ রাতে আপনাদেরকে এমনি এক পাদ্রীর সঙ্গে যে কথোপকথন হয়েছিল তা বর্ণনা করবো। এই পাদ্রী ছিলেন ওলন্দাজ সংস্কারবাদী চার্চের সদস্য।

শুভ ত্রয়োদশ

একবার ট্রান্সভাল 'শহরে ঈদ- ই মিলাদুন্নবী উপলক্ষে সেখানে বক্তৃতা দেবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আমি জানতাম সে অঞ্চলের অধিবাসীরা অধিকাংশই আফ্রিকানা ভাষায় কথা বলে, এমনকি আমার জ্ঞাতি ভাইয়েরাও সে ভাষায় কথা বলে। তাই ভাবলাম আমিও যদি ওই ভাষায় ভাঙা ভাঙা কথা বলতে পারি তাহলে আমার কাজ অনেকটা সহজ হবে। আমি টেলিফোন নির্দেশিকা দেখে আফ্রিকানাভাষী বেশ কয়েকটি গির্জার পাদ্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে বললাম যে, আমি তাদের সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু তারা সকলেই একে একে আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়ে আমার অনুরোধ রক্ষায় তাদের অক্ষমতার কথা তুলে ধরল। ত্রয়োদশ আমার শুভ সংখ্যা। তের বারের বার টেলিফোন করতেই স্বস্তি ও আনন্দ

বোধ করলাম। শনিবার দিন বিকেল বেলা যেদিন ট্রান্সভালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার কথা তখন ফন ভীরদেন নামে এক পাদ্রী তার বাসগৃহে আমাকে সাক্ষাতকার দিতে সম্মত হলেন।

বন্ধুত্বপূর্ণ সাদর সম্ভাষণ করে তিনি তাঁর বাসগৃহের বারান্দায় আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, আমার যদি কোন আপত্তি না থাকে তাহলে তিনি তাঁর শ্বশুর সাহেবকে আমাদের আলাপচারিতায় অংশগ্রহণের জন্য বলবেন। তাঁর শ্বশুর সত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধ। ফ্রি স্টেটে বাস করেন। আমি সম্মত হলাম, তারপর আমরা তিনজন পাদ্রী গ্রন্থাগারে আসন গ্রহণ করলাম।

কেন নেই?

আমি প্রশ্ন উত্থাপন করলাম, "বাইবেল গ্রন্থে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কি আছে? বিনা দ্বিধায় তিনি উত্তর দিলেন," কিছুই নেই।" আমি বললাম,"কিছুই নেই কেন? আপনার নিজের ব্যাখ্যা অনুসারে আমরা জানতে পারি যে, বাইবেলে অনেক বিষয় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে; যেমন সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাদের পরিণতির দিন সম্পর্কে বলা হয়েছে, এমনকি রোমান ক্যাথলিক পোপ সম্পর্কেও বলা হয়েছে।" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, কিন্তু মুহাম্মদ সম্পর্কে তো কিছু নেই।" আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন নেই? এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, এই মানুষটি অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ এক বিশ্বাসী জনগোষ্ঠীতে পরিণত করেছেন। যে জনগোষ্ঠী বিশ্বাস করে:

১. যীশুর জন্ম অলৌকিক,

২.যীশু একজন মসীয়া ছিলেন।

৩. তিনি ঈশ্বরের নির্দেশে মৃতকে জীবন দান করতে পারতেন, জন্মান্ধকে দৃষ্টি দান করতে পারতেন এবং কুষ্ঠ রোগীর রোগ নিরাময় করতে পারতেন।

নিশ্চয়ই এই গ্রন্থে অর্থাৎ বাইবেল গ্রন্থে এমন একজন মহৎ ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বর্ণিত আছে, কারণ তিনি যীশু এবং তার মাতা মেরি সম্পর্কে অনেক ভাল কথা বলেছেন।"

ফ্রি স্টেট থেকে আগত বৃদ্ধ প্রতিউত্তরে বললেন, "বৎস, আমি বিগত পঞ্চাশ বছর যাবত বাইবেল পাঠ করছি, যদি তার সম্পর্কে সত্যিই কিছু থাকত, আমি অবশ্যই জানতাম।"

নাম দিয়ে কারো পরিচয় নেই!

আমি জানতে চাইলাম, "আপনার কথামত ওল্ড টেস্টামেন্টে যীশুর আগমন সম্পর্কে শত শত ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে।" তিনি যোগ করলেন, "শত শত নয়, হাজার হাজার।" আমি বললাম, "যীশুর আগমন সম্পর্কে ওল্ড টেস্টামেন্টে সহস্রবার না একবার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে সে বিষয়ে কোন বিতর্ক করতে যাচ্ছি না। কারণ বিশ্বের সকল মুসলমান বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যতিরেকেই তাকে স্বীকার করে নিয়েছে। আমরা মুসলমানরা কেবলমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কথাতেই তাঁকে যীশু হিসাবে মেনে নিয়েছি। বর্তমান বিশ্বে কমপক্ষে একশ কোটি মুসলমান রয়েছে যারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারী এবং যারা যীশু খ্রিস্টকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে এবং মনে করে তিনি আল্লাহ্‌র একজন রসূল এবং সেজন্য তাঁকে বাইবেলের দোহাই দিয়ে কোন খ্রিস্টানকে উদ্যোগী হতে হয় না। সে নিজেই মুসলমান হিসাবে এটা মেনে নিয়েছে। আপনি বলছেন, যীশুর আগমন সম্পর্কে হাজার হাজার ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, আপনি হাজার নয়, মাত্র একটি ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করুন যেখানে যীশুর নাম ধরে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। 'মসীয়া'র অনুবাদ করে হয়েছে 'যীশু', এটি কোন নাম নয়, এটি হচ্ছে একটি পদবী। এমন কোন ভবিষ্যদ্বাণী আছে যেখানে বলা হয়েছে, মসীয়ার নাম হবে যীশু আর তার মায়ের নাম হবে মেরী, তার পিতার নাম হবে যোশেফ দি কার্পেন্টার, তার জন্ম হবে রাজা হেরোডের রাজত্বকালে ইত্যাদি ইত্যাদি? না এমন কোন বিস্তারিত তথ্য বাইবেলে নেই। তাহলে আপনি কি করে বলছেন যে, যীশু সম্পর্কে হাজার হাজার ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে?"

ভবিষ্যদ্বাণী কি?

পাদ্রী আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, "দেখ, ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে শব্দচিত্র, ভবিষ্যতে কোন কিছু ঘটতে যাচ্ছে এমন বিষয়ের একটি শব্দচিত্র। যখন সেই ঘটনা ঘটে যায়, তখন আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি বা দেখতে পাই যে অতীতে যে কথা বলা হয়েছিল তাই সংঘটিত হয়েছে।"

আমি বললাম, "অর্থাৎ আপনারা অনুমান করেন অথবা সিদ্ধান্তে উপনীত হন, যাকে বলা যায় দুই আর দুইকে এক সঙ্গে রাখেন।" তিনি বললেন, "হ্যাঁ." আমি বললাম, "তাই যদি হয় তাহলে আপনারা যীশুর ক্ষেত্রে যে হাজার হাজার ভবিষ্যদ্বাণীকে তুলে এনেছেন বা প্রয়োগ করেছেন সেগুলিকে মুহাম্মদ (সা.)-এর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে পারেন। তাহলে কি দাঁড়ায়?" পাদ্রী আমার কথায় রাজী হলেন। এটি একটি যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব। এ সমস্যাকে এইভাবে বিচার করে দেখা যেতে পারে।

আমি তাঁকে বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণ আঠার অধ্যায়ের আঠার নম্বর পঙ্‌ক্তি দেখার জন্য বললাম, তিনি তাই করলেন। আমি স্মৃতি থেকে সেই অংশটি আফ্রিকানা ভাষায় মুখস্থ তাকে পাঠ করে শুনালাম কারণ, আমার উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার শাসকগোষ্ঠির ভাষা অনুশীলন করেন নেওয়া।

পঙ্‌ক্তিটি ছিল এরূপ **'আমি তাদের জন্য তাদের ভাইদের মধ্য হতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করব, ও তাঁর মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি তাঁকে যা আজ্ঞা করব, তা তিনি তাদেরকে বলবেন।**

মূসা (আ)-এর ন্যায় নবী

আফ্রিকানা ভাষায় বাইবেলের এই পঙ্‌ক্তি স্মৃতি থেকে পাঠ করে আমার অশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। পাদ্রী আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, আমি নাকি ভালই উচ্চারণ করছি। আমি বললাম, "এই পঙ্‌ক্তি বা বাক্যে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে সেটি কাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে?

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে তিনি বললেন, "যীশু"।

আমি বললাম, "যীশু কেন-তাঁর নাম তো কোথাও এখানে উল্লেখ করা হয়নি?"

পাদ্রী উত্তর দিলেন, "ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে ভবিষ্যতে কোন কিছু ঘটতে যাচ্ছে তার শব্দচিত্র সে কারণে আমরা লক্ষ্য করি যে বাক্যের শব্দগুলি তাঁর সম্পর্কে যথেষ্ট ব্যাখ্যা করছে। তুমি দেখেছ এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুচ্ছ হচ্ছে 'সুস জাই ইস' (তোমার সদৃশ)-মূসার সদৃশ এবং যীশু হচ্ছেন মূসার সদৃশ"।

আমি প্রশ্ন করলাম, "কি প্রকারে যীশু মূসার সদৃশ?"

উত্তর হলো, প্রথমত মূসা ছিলেন ইহুদী এবং যীশুও ছিলেন ইহুদী ; দ্বিতীয়ত মূসা একজন নবী ছিলেন, ঈসাও নবী ছিলেন-অতএব যীশু মূসার সদৃশ"-যা ঈশ্বর পূর্বেই মূসাকে বলে দিয়েছেন-"সুস জাই ইস"।

"আপনি মূসা ও যীশুর মধ্যে আর কোন সাযুজ্য বা সাদৃশ্যের কথা মনে করতে পারেন কি?' তাঁকে প্রশ্ন করলাম। পাদ্রী মহোদয় আর কোন সাদৃশ্য স্মরণ করতে পারলেন না। তখন আমি বললাম, 'বাইবেলের ডিউটারোনমি বা দ্বিতীয় বিবরণ অধ্যায়ে ১৮:১৮ এই দুটি মানদণ্ড ব্যতীত আর কোন মানদণ্ড যদি না থাকে তাহলে এই মানদণ্ড দ্বারা মূসার পরবর্তীকালে আগত অন্যান্য নবীকেও মূসার অনুরূপ বলা যেতে পারে। তাদের মধ্যে রয়েছেন সোলায়মান, ইসাইয়াহ এজেইকেল, ডানিয়াল,

হোসিয়া, জোয়েল, মালাচি, বাপতিস্ত জন প্রভৃতি, কারণ তারা সকলেই ছিলেন ইহুদী এবং সকলেই ছিলেন নবী। তাহলে আমরা এ মানদণ্ড এই সকল নবীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবো না, কেবল যীশুর ক্ষেত্রে কেন প্রয়োগ করবো? এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন?

পাদ্রী আমার প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারলেন না। নিরুত্তর থাকলেন। আমি বলতে লাগলাম, 'দেখুন, আমার বিবেচনায় যীশু সব দিক হতে মুসার বিসদৃশ। আমি যদি ভুল বলি, দয়া করে আমাকে সংশোধন করে দেবেন।'

তিনটি বৈসাদৃশ্য

এই কথা বলে আমি আরম্ভ করলাম: সর্বপ্রথম যীশু কোন প্রকারেই মূসার সদৃশ নন কারণ আপনারাই বলেন যীশুই ঈশ্বর অথচ মূসা ঈশ্বর নন, এই কথা কি সত্য নয়?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। আমি বললাম, "তাহলে যীশু মূসার সদৃশ নন।!

দ্বিতীয়ত, আপনার বক্তব্য অনুসারে যীশু বিশ্বের পাপ মোচনের জন্য দেহ ত্যাগ করেছিলেন কিন্তু মূসাকে বিশ্ববাসীর পাপ স্খলনের জন্য মৃত্যু বরণ করতে হয়নি। সত্য নয় কি?

পাদ্রী পুনরায় বলরেন, "হ্যাঁ। আমি বললাম, "তাহলে যীশু মূসার সদৃশ নন।"

তৃতীয়ত, আপনার বক্তব্য অনুসারে যীশুকে তিন দিনের জন্য নরক বাস করতে হয়েছিল, কিন্তু মূসাকে নরকে যেতে হয়নি। সত্য নয় কি?'

তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ-হ্যাঁ"।

আমি পরিশেষে বললাম, "তাহলে এ কথা সত্য যে যীশু মূসার সদৃশ নন!"

আমি আমার বক্তব্যের রেশ ধরে বলতে লাগলাম, "যাহোক, পাদ্রী সাহেব এসব কঠিন সত্য নয়, বাস্তব সত্য নয়, যাকে আমরা বলি ধরা ছোঁয়া যায় এমন সত্য নয়, এগুলো কেবল বিশ্বাসের বিষয়; এখানে যে কেউ হোঁচট খেয়ে ধরাশায়ী হতে পারে। তার চেয়ে সহজ কিছু আলোচনা করা যেতে পারে যা কিনা একটি ছোট শিশুও বুঝতে পারে। আমরা কি সেভাবেই অগ্রসর হতে পারি?" পাদ্রী আমার এ প্রস্তাবে খুশি হলেন।

পিতা এবং মাতা

(১) "হযরত মূসার একজন পিতা ছিলেন এবং একজন মাতা ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এরও একজন পিতা ছিলেন এবং মাতা ছিলেন। কিন্তু যীশুর কেবলমাত্র

একজন মাতা ছিলেন। তার কোন মানব পিতা ছিল না। এ কথা কি সত্য?" পাদ্রী বললেন, "হ্যাঁ। আমি বললাম, "তাহলে যীশু হযরত মূসার সদৃশ নন, বরং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মূসার সদৃশ।"

অলৌকিক জন্ম

(২) হযরত মূসা এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উভয়ের জন্ম স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়মে ঘটেছে। অর্থাৎ পুরুষ এবং স্ত্রীর স্বাভাবিক মিলনের ফলে তাঁদের জন্ম। কিন্তু যীশু সৃষ্ট হয়েছিলেন বিশেষ অলৌকিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। আপনার যদি স্মরণ থাকে তাহলে সেন্ট মেথুর গসপেলে দেখতে পারেন। সেখানে বলা হয়েছে, "তাহাদের (কারপেন্টার জোসেফ এবং মেরি) সহবাসের পূর্বে জানা গেল, তাঁহার গর্ভ হইয়াছে।" তারপর যখন পবিত্র পুত্রের জন্মের সুসংবাদ মেরিকে দেওয়া হল সেন্ট লিউক আমাদেরকে বলেন, "তখন মরিয়ম দূতকে বললেন, এটা কিরূপে হবে? আমি ত পুরুষকে জানি না। দূত উত্তর করিয়া তাঁকে বললেন, পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসবেন, এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপর ছায়া করবে....." (লুক ১ : ৩৫)। পবিত্র কোরআন শরীফে যীশুর অলৌকিক জন্মকে স্বীকার করছে। সেখানে মেরির যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন "এটা কিরূপে হবে? আমি ত পুরুষকে জানি না।"-এর উত্তরে আরও অধিক শ্রদ্ধা সহকারে এবং সুন্দরভাবে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও' এবং তা হয়ে যায়" কুরআন, ৩ : ৪৭)। কোন মানুষ অথবা প্রাণীর মধ্যে স্রষ্টাকে বীজ বপন করতে হয় না। তিনি কেবল ইচ্ছা করলেই সেটি হয়ে যায়। মুসলমানগণ যীশুর জন্মকে এভাবে বিশ্বাস করে। যখন আমি কুরআন এবং বাইবেলে যীশুর জন্ম বৃত্তান্ত তুলনা করি এবং বলি, "আপনি যখন আপনার কন্যার নিকট এই দুটি বর্ণনা অর্থাৎ কুরআনের বর্ণনা এবং বাইবেলের বর্ণনা বলবেন তখন কোনটি বলতে আপনি অধিকতর সুবিধাজনক মনে করবেন?" ভদ্রলোক মাথা নিচু করে বললেন, "কুরআনের বর্ণনা।" সংক্ষেপে আমি পাদ্রীকে বললাম, "একথা কি সত্য যে হযরত মূসা এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্বাভাবিক জন্মের বিপরীত যীশুর জন্ম অলৌকিকভাবে হয়েছিল?" পাদ্রী বললেন, "হ্যাঁ"। তখন আমি বললাম, "অতএব, যীশু হযরত মূসার সদৃশ নন। বরং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মূসার সদৃশ।"

বিবাহ বন্ধন

(৩) "হযরত মূসা (আ) এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবাহ করেছিলেন এবং তাদের সন্তান হয়েছিল। কিন্তু যীশু সারা জীবন অবিবাহিত ছিলেন। এ কথা কি সত্য?

পাদ্রী বললেন, "হ্যাঁ।

আমি বললাম, "অতএব, যীশু হযরত মুসার সদৃশ নন। বরং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত মূসার সদৃশ।"

যীশু তার গোত্র কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন

(৪) "হযরত মূসা (আ) এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জীবনকালেই স্বজাতি কর্তৃক নবী হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইহুদীরা মূসা (আ)-কে সীমাহীন যন্ত্রণা এবং কষ্ট দিয়েছিল এবং তারা গৃহহারা হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছিল। তথাপি তারা মূসা (আ)-কে তাদের নবী হিসেবে স্বীকার করেছিল। আরবরাও অনুরূপভাবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, তাদের হাতে তিনি নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন। দীর্ঘ তের বছর মক্কায় দীন প্রচার করার পর তাঁকে তাঁর জন্মভূমি মক্কা নগর ত্যাগ করে যেতে হয়েছিল। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে সমগ্র আরব জাতি তাঁকে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু বাইবেলে কি বলে 'তিনি নিজ অধিকারে এলেন, আর যারা তার নিজের, তাঁরা তাঁকে গ্রহণ করল না' (জন ১:১১)। এমন কি হাজার বছর পর বর্তমান কালেও তাঁর স্বজাতি ইহুদীরা সামগ্রিকভাবে তাঁকে প্রত্যাখ্যান কাছে। একথা কি সত্য নয়?"

পাদ্রী বললেন, "হ্যাঁ। তখন আমি পুনরায় বললাম, "অতএব যীশু হযরত মূসার সদৃশ নন, বরং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মূসার সদৃশ।"

'ভিন্ন জগৎ'-রাজত্ব

(৫) "হযরত মূসা এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উভয়েই ছিলেন নবী আবার তাঁরা রাষ্ট্র পরিচালানও করেছেন। নবী বলতে আমি তাকেই বুঝি যিনি তার জাতিকে পথনির্দেশের জন্য স্রষ্টার নিকট হতে বাণী লাভ করেন এবং তিনি সেই বাণী কোন প্রকার সংযোজন, পরিমার্জন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন ব্যতিরেকে যথাযথভাবে তাঁর জাতির নিকট প্রকাশ করেন। একজন রাষ্ট্র পরিচালক তাকেই বলি যিনি তার জাতির ভাগ্য নিয়ন্তা হন, তাদের জীবন-মৃত্যু তার উপর নির্ভর করে। এখানে তিনি কি বস্ত্র পরিধান করেন অথবা মস্তকে কি মুকুট পরিধান করেন অথবা আদৌ কোন রাজমুকুট পরিধান করেন কি করেন না সেটি কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। অথবা তাকে রাজা বলে সম্বোধন করা হয়েছে কি হয়নি সেটা কোন বড় কথা নয়। কিন্তু বড় কথা হচ্ছে যিনি কোন ব্যক্তিকে চরম শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করবার অধিকার রাখেন তিনিই শাসক বা মূসার সেই ক্ষমতা ও অধিকার ছিল। আপনি কি বাইবেলের সেই ঘটনার কথা স্মরণ করতে পারেন যেখানে বলা হয়েছে, সাবাত দিনে কোন ইসরাইলী যদি কাঠ কুড়াতে যায় তাকে মূসা প্রস্তর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন? (গণনাপুস্তক ১৫ : ৩৬) বাইবেলে আরো অনেক অপরাধের কথা উল্লেখ আছে যে ক্ষেত্রে মূসা অনেক ইহুদীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছিলেন। তার সম্প্রদায়ের জনগণের জীবন ও মৃত্যুর উপর হযরত মুহাম্মদেরও সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ষমতা এবং অধিকার ছিল। বাইবেলে এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে কোন কোন ব্যক্তিকে কেবল নবুয়ত' দান করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা তাদের নির্দেশ কার্যকর করতে সক্ষম ছিলেন না। এমন অনেক আল্লাহ্‌র নবী তাঁদের উপদেশ কঠোরভাবে উপেক্ষিত হতে দেখেছেন। এমন নবী ছিলেন লুত, ডানিয়েল, এজরা, ব্যাপ্টিস্ট জন। তাঁরা কেবল বাণী পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন, কিন্তু আইন প্রয়োগ করতে সক্ষম হননি। হযরত ঈসা (আ) দুর্ভাগ্যকক্রমে এদের শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। যীশুর জীবন কাহিনী সম্বলিত বাইবেলে এই বক্তব্যর স্পষ্ট সমর্থন পাওয়া যায়: যখন যীশুকে টেনে হিচড়ে রোমান শাসনকর্তা পনটিয়াস পাইলেটের সম্মুখে আনয়ন করা হলো এবং তার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হলো। তখন যীশু তার বিরুদ্ধে আনীত মিথ্যা অভিযোগ খণ্ডনের জন্য যুক্তিসঙ্গত বক্তব্য পেশ করেছিলেন : যীশু উত্তর করলেন, 'আমার রাজ্য এ জগতের নয়; **যদি আমার রাজ্য এ জগতের হত, তবে আমার অনুচরেরা প্রাণপণ** করত, যেন আমি ইহুদীদের হস্তে সমর্পিত না হই; কিন্তু আমার রাজ্য ত এখানকার নয়। (যোহন ১৮ : ৩৬) এই বক্তব্য শুনে পাইলেট সম্মত হয়েছিলেন যে যদিও যীশুও মানসিক দিক হতে সম্পূর্ণ নয়। তিনি তাকে তার শাসনের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক মনে করেননি। যীশু তো কেবল আধ্যাত্মিক জগতের অধিকার দাবী করেছেন; অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় তিনি নিজেকে কেবল নবী হিসেবে দাবী করেছিলেন, এ কথা কি সত্য?"

পাদ্রী বললেন, "হ্যাঁ।"

আমি তখন বললাম, **"অতএব, যীশু হযরত মূসা (আ)-এর সদৃশ নন, কিন্তু হযরত মুহাম্মদ মূসা (আ)-এর সদৃশ।"**

নতুন কোন বিধি বিধান নয়

(৬) হযরত মূসা (আ) ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জনগণের জন্য নতুন আইন ও নতুন বিধান এনেছিলেন। মূসা (আ) কেবল তাঁর ইসরাইলী জনগোষ্ঠীর জন্য দশটি নির্দেশ এনেছিলেন, শুধু তাই নয় বরং তাদের সঠিক পথে চলার জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আনুষ্ঠানিক বিধি বিধান এনেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক জনগোষ্ঠীর মাঝে আবির্ভূত হলেন যারা অসভ্যতা ও অজ্ঞতায় সম্পূর্ণ নিমজ্জিত। তারা তাদের বিমাতাকে বিবাহ করতো, কন্যাকে জীবন্ত সমাধিস্থ করতো, মদ্যপান, জুয়া খেলা, ব্যভিচার, পুতুল পূজা ছিল তাদের নিত্য সহচর। ইসলামপূর্ব যুগের আরব সম্পর্কে গীবন তার 'রোমান সম্রাজ্যের অবক্ষয় ও পতন' গ্রন্থে আরবদেরকে নরপশু বলে আখ্যায়িত করেছেন, বলেছেন যে তাদের কোন বোধ শক্তি ছিল না, তাদেরকে অপরাপর জন্তু জানোয়ার হতে প্রায় পার্থক্য করা যেতো না। সে যুগে বলতে গেলে এমন কিছুই ছিল না যা দিয়ে মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। তারা মানবরূপী পশু ছিল।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এইরূপ চরম শোচনীয় দুর্দশাগ্রস্ত বর্বরতা থেকে উত্থিত করে আরব জাতিকে, কার্লাইলের ভাষায় 'জ্ঞান ও আলোর দিশারী' করেছিলেন। 'আরব জাতির নিকট তা হয়েছিল অন্ধকার হতে আলোক পদার্পণ। এর দ্বারা সর্বপ্রথম আরব জাতি প্রাণ লাভ করল। এক দরিদ্র মেষ পালক জাতি সকলের অগোচরে সৃষ্টির প্রথম হতে মরু প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। যাকে কেউই চিনত না সে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করল। একটি ক্ষুদ্র জাতি বিশ্বের মহত্তম হল। মাত্র এক শতাব্দিকাল পরে আরব জাতি একদিকে গ্রানাডা ও অপর দিকে দিল্লী পৌঁছালো। শৌর্যে বীর্যে পরাক্রমে সাহসে দীপ্তিতে এবং জ্ঞানের গরিমার আলোক সহসা ঝলসে উঠল, বিশ্বের এক বিশাল ভূখন্ড জুড়ে আরব সভ্যতা জ্বলজ্বল করে জ্বলতে লাগল...." সত্যই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জাতিকে এমন আইন শৃঙ্খলার মধ্যে আনয়ন করলেন, যা কখনোই তাদের মধ্যে ছিল না।

'যীশুর ক্ষেত্রে কি হয়েছিল? যখন ইহুদীদের সন্দেহ হলো যে তিনি একজন প্রতারক, তাদের ধর্মকে বিকৃত করবেন, তিনি কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়ে তাদেরকে বোঝাতে সচেষ্ট হলেন যে তিনি কোন নতুন ধর্ম নিয়ে আসেননি-নতুন কোন বিধি বিধান নয়। তার কথায় "মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদিগ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি; আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে।" অর্থাৎ

তিনি কোন নতুন আইন ও বিধি বিধান নিয়ে আসেন নি; তিনি কেবল পুরাতন বিধি বিধানকে বাস্তবায়িত করতে এসেছেন। তিনি একথাই ইহুদীদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন- যদি না তিনি হালকাভাবে তাঁকে আল্লাহ্‌র মানুষ হিসেবে গ্রহণ করতে ইহুদীদেরকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করতেন এবং ছলনা করে যে কোন উপায়ে একটি নতুন ধর্মকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতেন। না, আল্লাহ্‌র এই রসূল কখনোই এমন জঘন্য পন্থা অবলম্বন করে আল্লাহ্‌র ধর্মকে বিকৃত করতে পারেন না। তিনি নিজে আল্লাহ্‌র বিধানকে পরিপূর্ণ করেছিলেন। হযরত মূসা (আ)-এর নির্দেশগুলি পালন করতেন, সাবাতকে শ্রদ্ধা করতেন। কখনোই কোন ইহুদী তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেনি, 'তুমি কেন রোজা রাখ না' অথবা 'রুটি টুকরো করার পূর্বে কেন তুমি হাত ধৌত করনি'? যে অভিযোগ প্রায়শই তার শিষ্যদের প্রতি করা হতো কিন্তু কখনোই যীশুর বিরুদ্ধে করা হয়নি। কারণ একজন খাঁটি ইহুদী হিসেবে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী রসূলের নির্দেশকে যথাযথভাবে মান্য করতেন। সংক্ষেপে বলতে হয় যে, যীশু কোন নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেননি; হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ন্যায় নতুন কোন আইন বা বিধি বিধান প্রদানও করেন নি। একথা কি সত্য?" পাদ্রী বললেন, "হ্যাঁ"।

আমি বললাম, 'অতএব যীশু হযরত মূসা (আ)-এর সদৃশ নন; বরং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত মূসা (আ)-এর সদৃশ।"

তাদের তিরোধান কিরূপ হয়েছিল

(৭) "মূসা এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উভয়েরই স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল কিন্তু খ্রিস্ট ধর্ম মতে যীশু নৃশংসভাবে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করেন, এ কথা কি সত্য?" পাদ্রী স্বীকার করলেন। আমি বললাম, "তাহলে যীশু হযরত মূসা (আ)-এর সদৃশ নন; বরং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত মূসা (আ)-এর সদৃশ।"

বেহেশতি আবাস

(৮) হযরত মূসা (আ) এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উভয়ই এই পৃথিবীতে মাটির নিচে সমাধিস্থ হয়ে আছেন, কিন্তু আপনার মতে যীশু বেহেশতে বিশ্রাম করছেন। এ কথা কি সত্য?" পাদ্রী আমার সঙ্গে একমত হলেন। আমি বললাম, "তাহলে যীশু হযরত মূসা (আ)-এর সদৃশ নন; বরং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত মূসা (আ)-এর সদৃশ।"

ইসমাইল প্রথম সন্তান

পাদ্রী সাহবে অসহায় ভাবে যেহেতু প্রতিটি ক্ষেত্রে আমার সঙ্গে একমত হচ্ছিলেন তাই আমি বললাম, "পাদ্রী সাহেব এতক্ষণ পর্যন্ত আমি কেবল সমগ্র ভবিষ্যদ্বাণীর একটি ক্ষেত্র প্রমাণ করার চেষ্টা করছি-সেটি ছিল তোমার সদৃশ-'তোমার মত'-'মূসার মত'- এই বাক্যটি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীর বাক্যটিতে আরো কিছু কথা রয়েছে, সেগুলো সহ পাঠ করলে দাঁড়ায় : "আমি তাদের জন্য তাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করব, ও তাঁর মুখে আমার বাক্য দেব; আর আমি তাঁকে যা আজ্ঞা করব, তা তিনি তাদেরকে বলবেন।" এখানে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে তাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হতে কথার উপর। এ স্থলে মূসা এবং তার জনগণ, অর্থাৎ ইহুদীদেরকে একটি জাতিসত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, ফলে আরবগণ তাদের ভ্রাতা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে বাইবেলে আবরাহামকে ঈশ্বরের বন্ধু বলা হয়েছে। আবরাহামের দুই স্ত্রী ছিল। সারাহ ও হাজারা। হাজারার গর্ভে আবরাহামের যে পুত্র জন্ম গ্রহণ করেছিল তিনি তার নামকরণ করেছিলেন ইসমাইল "হাগার আবরাহামের নিমিত্তে পুত্র প্রসব করল; আর আবরাহাম হাগারের গর্ভজাত আপনার সেই পুত্রের নাম ইশ্মায়েল রাখলেন। (আদি পুস্তক ১৬ : ১৫) "পরে আবরাহাম আপন পুত্র ইশ্মায়েলকে..... (আদি পুস্তক ১৭ : ২৩) "ইশ্মায়েলের লিঙ্গাগ্রের ত্বকছেদন কালে তাঁর বয়স তের বৎসর (আদি পুস্তক ১৭ : ২৫)। তের বৎসর বয়সকাল পর্যন্ত ইশ্মায়েলই ছিল আবরাহামের একমাত্র পুত্র, একমাত্র বংশধর; অতঃপর আল্লাহ্ এবং আবরাহামের মধ্যে চুক্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহ্তায়ালা আব্রাহামকে সারাহর মাধ্যমে আর একটি পুত্রসন্তান দান করেন যার নাম রাখা হয়েছিল, আইজাক। যিনি ইশ্মায়েল অপেক্ষা অনেক ছোট ছিলেন।

আরব এবং ইহুদী

যদি ইশ্মায়েল (ইসমাইল) ও আইজাক (ইসরাইল) এক পিতা আব্রাহামের সন্তান হন তাহলে তারা দুজন ভাই। আর একজনের বংশধর অপরজনের বংশধরের ভাই। আইজাকের বংশধরই ইহুদী এবং ইশ্মায়েলের বংশধর আরব-অতএব একে অপরের ভাই। বাইবেলেও সেকথাই বলে, "সে তার সকল ভ্রাতার সম্মুখে বসতি করবে" (আদি পুস্তক ১৬ : ১২)। "এবং তিনি তাঁর সকল ভ্রাতার সম্মুখে বসতিস্থান (সমাধিস্থ) পেলেন (আদি পুস্তক ৫ : ১৮)। আইজাকের বংশধররা ইশ্মায়েলের বংশধরদের ভ্রাতা। সে হিসেবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসরাঈলদের ভাইদের একজন কারণ তিনি আব্রাহামের পুত্র ইশ্মায়েলের বংশধর। ভবিষ্যৎবাণীও ঠিক সে কথাই বলছে-তাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হতে সেখানে স্পষ্টই উল্লেখ করা হয়েছে যে আগামীতে যে পয়গম্বর আসবেন তিনি হযরত মূসা (আ)-এর সদৃশ, আইজাকের বংশোদ্ভূত নন অথবা তাদের মধ্য হতে নয়, বরং তাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হতে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতএব তাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হতে এসেছেন।

তাঁর মুখে আমার বাক্য দেব

ভবিষ্যদ্বাণী আরো বলছে যে, **'তাঁর মুখে আমার বাক্য দেব'**। এ কথার অর্থ কি, বিশেষ করে যখন বলা হচ্ছে : তাঁর মুখে আমার বাক্য দিব? দেখুন যখন আমি প্রথমে আপনাকে বাইবেল খুলে দ্বিতীয় বিবরণ, ১৮ অধ্যায় ১৮ পঙ্ক্তি দেখতে বলেছিলাম, তখন যদি প্রথমে আপনাকে পাঠ করতে বলতাম এবং আপনি যদি পাঠ করতেন: তাহলে আমি কি আপনার মুখে আমার বাক্য দিতাম?' পাদ্রী সাহেব বললেন, "না"। আমি আবার বললাম, 'যদি আপনাকে আরবির মত কোন বাষা শেখাতাম, যে ভাষা সম্পর্কে আপনার কোনরূপ ধারণাই নেই; তারপর বলতাম আমার সঙ্গে আমি যা বলি তা বলুন, যেমন :

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

বল, 'তিনিই আল্লাহ, একক ও অদ্বিতীয়।

اَللّٰهُ الصَّمَدُ

আল্লাহ কাহারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ

তিনি কাকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

তাহলে আমি কি আপনার মুখে এমন বাক্য দিব না যা আপনি কোন দিন শোনেন নি? এবং সেই বাক্য আপনি উচ্চারণ করছেন, তাহলে কি সেই বাক্য আপনার মুখে দেয়া হল না।

পাদ্রী সাহেব আমার সঙ্গে একমত হলেন। আমি বললাম, এমনিভাবেই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

ইতিহাস থেকে আমরা জানি যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বয়স তখন চল্লিশ বৎসর, রমজান মাসের ২৭ তারিখের রাত, হেরা পাহাড়ের গুহার মধ্যে জিবরাঈল (আ) তাকে তাঁর মাতৃভাষায় নির্দেশ করলেন-'ইকরা' অর্থাৎ পাঠ করুন বা বলুন! হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভয়ে দিশাহারা অবস্থায় উত্তর করলেন, ' মা আনা বেকারে এন' অর্থাৎ আমি শিক্ষিত নই! ফিরিশতা দ্বিতীয় বার তাঁকে একই নির্দেশ দিয়ে একই উত্তর পেলেন। তৃতীয়বার ফেরেশতা তাকে একই নির্দেশ দিয়ে বললেন "পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে।" তখন তিনি অনুধাবন কররেন যে তাকে কি করতে হবে। অতঃপর তিনি সেই বাক্য উচ্চারণ করলেন যা তার মুখে দেয়া হলো......

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ

(পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।)

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

(সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক হতে)

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ

পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহা মহিমান্বিত),

الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন)

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ

(শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না) কুরআন ৯৬ : ১-৫

এই পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম তাঁর নিকট প্রকাশ করা হলো। এ আয়াতগুলো পবিত্র কুরআন ৯৬ অধ্যায়ের বা সূরার প্রথমে রয়েছে।

বিশ্বাসী সাক্ষী

ফেরেশতা চলে যাবার পর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দৌড়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন। ভীত-সন্ত্রস্ত ও ঘর্মাক্ত কলেবরে প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজাকে বললেন "শরীর ঢেকে" দিতে। তিনি শুয়ে পড়লেন। বিবি খাদিজা পাশে বসে তাঁকে দেখতে লাগলেন। সুস্থির হয়ে তিনি বিবি খাদিজাকে বললেন, কি হয়েছে, তিনি কি দেখেছেন ও কি শুনেছেন। বিবি খাদিজা তাঁকে আশ্বস্ত করে বললে তাঁর উপর তাঁর পূর্ণ আস্থা আছে এবং আল্লাহ্ এমন কিছু ঘটাবেন না যা তাঁর জন্য ক্ষতিকর। কোন প্রতারক এরূপ স্বীকারোক্তি করতে পারে না। কোন প্রতারক কি বলবে যে আল্লাহর

তরফ হতে যখন কোন ফেরেশতা কোন বাণী নিয়ে তার নিকট উপস্থিত হয় তখন সে ভীত-সন্ত্রস্ত ঘর্মাক্ত কলেবরে গৃহে প্রত্যাবর্তনে করে? তাঁর স্বীকারোক্তি এবং প্রতিক্রিয়া দেখে যে কোন সমালোচক অনুধাবন করতে পারেন যে, তাঁর স্বীকারোক্তি ও প্রতিক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে একজন প্রকৃত সৎ, স্পষ্টবাদী এবং আল-আমিন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

পরবর্তী তেইশ বছর কাল ধরে তাঁর মুখে বাক্য দেয়া হয়েছিল এবং তিনি তা উচ্চারণ করেছিলেন। সেই শব্দাবলি তাঁর হৃদয়ে ও মনে অমোচনীয়ভাবে চিরকালের জন্য অংকিত হয়ে গিয়েছিল। পবিত্র গ্রন্থের কলেবর যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে সেগুলো তাঁর সাহাবাগণ বৃক্ষপত্রে, ছালে বা হাড়ের উপর লিখে রাখতেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই এসব বাক্য বর্তমানে কুরআনুল করীম আমরা যে অবস্থায় পাচ্ছি সে অবস্থায় সংকলিত করা হয়েছিল।

অতএব প্রকৃতই আল্লাহ তাঁর বাণীকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর মুখে বাক্য আকারে দিয়েছিল।

আলোচ্য ভবিষ্যদ্বাণীতে ঠিক সেভাবেই বলা হয়েছে; **তাঁহার মুখে আমার বাক্য দেব**। (দ্বিতীয় বিবরণ –১৮ : ১৮)

নিরক্ষর পয়গম্বর

বাইবেলের অপর আর একটি ভবিষ্যদ্বাণীর যথাযথ বাস্তবায়ন দেখতে পাই, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হেরা পর্বত গুহায় যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন এবং প্রত্যাদেশের ফলে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার মধ্যে। যিশাইয় ২৯ অধ্যায় ১১২ পঙ্ক্তিতে বলা হয়েছে... যে লেখাপড়া জানে না, তাকে যদি সে পুস্তক দিয়া বলে, অনুগ্রহ করিয়া ইহা পাঠ কর, তবে সে উত্তর করিবে আমি লেখাপড়া জানি না (পুস্তক, আল কিতাব আর কুরআন-পাঠ, আবৃত্তি) নিরক্ষর পয়গম্বর আন্নবী আল উম্মি অনুগ্রহ করিয়া ইহা পাঠ কর, হিব্রু গ্রন্থে কথাটি নেই; ক্যাথলিকদের ডোয় পাঠে এবং রিভাইজড স্ট্যান্ডার্ড ভারশনে আছে 'এবং তিনি বলিলেন, আমি নিরক্ষর' আরবী মাআনা বেকারিও-এর সঠিক অনুবাদ। এই বাক্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুবার জিবরাঈল ফেরেশতার নিকট উচ্চারণ করেছিলেন যখন ফেরেশতা তাঁকে পাঠ করতে নির্দেশ করেছিলেন।

কিং জেমস সংস্করণ অথবা যে কোন অনুমোদিত সংস্করণে দেখতে পাই কি লেখা আছে,.. যে লেখাপড়া জানে না, তাহাকে যদি সে পুস্তক দিয়া বলে, অনুগ্রহ করিয়া এটা পাঠ কর, তবে সে উত্তর করিবে আমি লেখাপড়া জানি না। (যিশাইয় ১৯ : ১২) প্রসঙ্গত বলা যায় ষষ্ঠ শতকে যখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত ছিলেন এবং ইসলাম প্রচার করছিলেন তখন বাইবেলের কোন আরবি অনুবাদ ছিল না। তাছাড়া তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর ও অক্ষরজ্ঞানহীন। কোন মানুষ তাঁকে একটি অক্ষরও শেখায়নি। তাঁর স্রষ্টাই ছিলেন তাঁর শিক্ষক-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝ عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۝

সে মনগড়া কথাও বলে না; ইহা তো ওহী, যাহা তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়, তাহাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী। — কুরআন ৫৩ : ৩-৫

কোন প্রকার মানবিক জ্ঞান ব্যতিরেকেই তিনি সকল জ্ঞানবানের মাথা নত করে দিয়েছেন।

মহা সাবধানবাণী

আমি পাদ্রী সাহেবকে বললাম, 'দেখুন পাদ্রী সাহেব, বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী কেমন চমৎকার ভাবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর ক্ষেত্রে খাপে খাপে মিলে গিয়েছে। সেজন্য ভবিষ্যদ্বাণীকে সম্প্রসারিত করতেও হয়নি।'

পাদ্রী বললেন, 'তোমার সকল ব্যাখ্যাই শুনতে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ আমাদের খ্রিস্টানদের নিকট যীশু বাস্তব ঈশ্বর। তিনি আমাদের পাপমোচনের জন্য এসেছিলেন।

আমি বললাম, কিছু আসে যায় না? কিন্তু ঈশ্বর সম্ভবত তা মনে করেননি। তিনি তাই সে বিষয়েও কথা রেখেছেন। তিনি জানতেন আপনাদের মত লোক আসবেন যারা তাঁর বাণীকে গভীরভাবে অনুধাবন করবেন না। তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সাথে সমস্ত কিছু গ্রহণ করবেন। তাই তিনি দ্বিতীয় বিবরণে ১৮:১৮-তে মহা সতর্কবাণী করেছেন: আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলবেন, তাতে যে কেউ

কর্ণপাত না করবে, তার কাছে আমি প্রতিশোধ লইব।' ক্যাথলিক বাইবেলে শেষ বাক্যটি হচ্ছে I will be the revenger- আমি হব প্রতিশোধ গ্রহণকারী' আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করব- এই কথাগুলো কি আপনার অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে না? মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ ভীতি প্রদর্শন করছেন, প্রতিশোধ গ্রহণের আর সে ভীতি হচ্ছে সামান্য পথের মাস্তান যখন ভীতি প্রদর্শন করে তখন ভয়ে আমরা কম্পমান হই, আর যখন খোদ স্রষ্টা সতর্ক করছেন তখন আপনি ভীত হচ্ছেন না?'

দ্বিতীয় বিবরণের একই অধ্যায়ে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়নে আরো যে কথা বলা হয়েছে তা লক্ষণীয় "আমার নামে তিনি আমার যে সব বাক্য বলবেন" মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কার নামে বলবেন? আমি কুরআন পাকের সূরা নাস খুলে দেখালাম, প্রতিটি সূরার প্রথমে রয়েছেন। بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ দয়াময় পরম পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে, অতঃপর সূরা ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩ দেখালাম, প্রতিটি সূরার প্রথমে বলা হচ্ছে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে। প্রতিটি মুসলমান সকল বিধিসম্মত কাজ এ আয়াত দিয়ে আরম্ভ করে। কিন্তু একজন খ্রিস্টান আরম্ভ করে,পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নামে। ডিউটেরোনমি অধ্যায়-১৫তে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীতে যীশুকে নয়, বরং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেই যে বোঝানো হয়েছে সে বিষয়ে আমি ১৫টি প্রমাণ উপস্থাপন করেছি।

ব্যাপ্টিস্ট কর্তৃক যীশুকে অস্বীকার

নতুন নিয়ম-এর (খ্রিস্টান বাইবেল) কালে আমরা লক্ষ্য করি যে ইহুদীরা এখনও "মুসার সদৃশ" শীর্ষক ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়নের আশা করছে। যখন যীশু নিজেকে ইহুদীদের মসিহা বলে দাবী করলেন এবং ইহুদীরা ইলিয়াসকে অন্বেষণ করতে আরম্ভ করল। ইহুদীদের নিকট দুটি সমান্তরাল ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, যে মেসিহাব আগমনের পূর্বে ইলিয়াসকে অবশ্যই দ্বিতীয়বার আসতে হবে। যীশুও এই ইহুদী বিশ্বাসকে সমর্থন করেছেন: সত্য বটে এলিয় আসিবেন, এবং সকলই পুনঃস্থাপন করিবেন; কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ইলিয় আসিয়া গিয়াছেন, এবং লোকেরা তাহাকে চিনে নাই... তখন শিষ্যেরা বুঝিলেন যে, তিনি তাহাদিগকে যোহন বাপ্তাইজকের বিষয় বলিয়াছেন। (মথি ১৭: ১১-১৩)

নতুন নিয়ম অনুসারে ইহুদীরা ভবিষ্যতে আগমন করবেন এমন মসিহের কথা শুনতে রাজী না। তাদের অনুসন্ধান কাজে তারা তাদের প্রকৃত মসিহকে পেতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। যোহন লিখিত সুসমাচারে এর সমর্থন রয়েছে 'আর যোহনের সাক্ষ্য এই-, যখন ইহুদীগণ কয়েকজন যাজক ও লেবীয়কে দিয়ে জেরুজালেম হইতে তাঁহার কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, আপনি কে? তখন তিনি স্বীকার করিলেন, অস্বীকার করিলেন না; তিনি স্বীকার করিলেন যে, আমি সেই খ্রিস্ট নই। তাঁহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি? আপনি কি এলিয়? তিনি বলিলেন, আমি নই। আপনি কি সেই ভাববাদী? তিনি উত্তর করিলেন, না। (এ স্থলে যোহন দি বাপ্তিস্ত যীশুকে অস্বীকার করছেন! যীশু বলছেন যে যোহনই ইলিয়স এবং যোহন অস্বীকার করছেন যে যীশু তাকে যা বলছেন তিনি তা।) দু'জনের একজন, আল্লাহ না করুন, নিশ্চিতভাবে সত্য বলছেন না। যীশুর নিজ সাক্ষ্য অনুযায়ী ইসরাইলী পয়গম্বরদের মধ্যে জন দি বাপ্তিস্ত মহত্তম পয়গম্বর: আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, স্ত্রী-লোকের গর্ভজাত সকলের মধ্যে যোহন বাপ্তাইজক হইতে মহান কেহই উৎপন্ন হয় নাই. (মথি ১১ : ১১)

মুসলমানের নিকট যোহন বাপ্তাইজক হচ্ছেন হযরত ইয়াহইয়া (আ)। তাকে আমরা প্রকৃত নবী বলে মান্য করি। আমাদের নিকট যীশু হচ্ছেন ঈসা (আ)। তাঁকেও আমরা পয়গম্বরদের মধ্যে অন্যতম মহৎ পয়গম্বর বলে সম্মান করি। তাদের মধ্যে একজনের উপর মিথ্যার দোষারোপ আমরা কেমন করে আনতে পারি? যোহন ও যীশুর এই সমস্যা খ্রিস্টান ও ইহুদীরাই সমাধান করুক। কারণ তাদের এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থে অসংখ্য বৈপরিত্য রয়েছে যেগুলিকে তারা ঘষামাজা করছে আর বলছে এগুলি যীশুর অন্ধকার বাণী'। আমাদের প্রশ্ন একট বিষয়ে, যখন যোহন বাপ্তিস্তকে প্রশ্ন করা হলো আপনি কি সেই ভাববাদী? তিনি উত্তর করিলেন, না। (যোহন ১:২১)

তিনটি প্রশ্ন

অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যোহন বাপ্তিস্তকে তিনটি স্পষ্ট ও পৃথক প্রশ্ন করা হলে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'না'।

পুনরায় পরীক্ষা করা যাক: ১. আপনি কি যীশু, ২ আপনি কি ইলিয়াস? ৩. আপনি কি সেই পয়গম্বর?

কিন্তু খ্রিস্টান জগতের মহা পণ্ডিতবর্গ কেবল দুটি প্রশ্ন বিবেচনার মধ্যে আনয়ন করেন।

অধিকতর স্পষ্ট করার জন্য যে ইহুদীদের মনে নিশ্চয়ই তিনটি পৃথক ও স্পষ্ট ভবিষ্যৎবাণী ছিল যে কারণে তারা যোহন বাপ্তিস্তকে তিনটি প্রশ্ন করেছিল; আর তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি যদি সেই খ্রিস্টও নহেন, এলিয়ও নহেন, সেই ভাববাদীও নহেন, তবে বাপ্তাইজ করিতেছেন কেন?

১. সেই খ্রিস্ট নহেন, ২. এলিয়ও নহেন, ৩. সেই ভাববাদীও নহেন।

ইহুদীরা তিনটি পৃথক ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়নের অপেক্ষা করছিল : এক যীশুর আগমন; দুই. ইলিয়াসের আগমন, এবং তিন সেই পয়গম্বরের আগমন।

সেই পয়গম্বর

আমরা যদি কোন বাইবেল খুলে দেখি যে বাইবেলে ব্যবহৃত শব্দাবলি বা বিষয়সমূহের বর্ণনাক্রমিক সূচি রয়েছে তাহলে আমরা পার্শ্বদেশের টীকায় জন ১:২৫-এ "পয়গম্বর", অথবা "সেই পয়গম্বর" কথাটি দেখতে পাব বা ডিউটারোনমি ১৮:১৫ ও ১৮-এর ভবিষ্যদ্বাণী নির্দেশ করে। আর আমরা "সেই পয়গম্বর"-"মূসার সদৃশ সেই পয়গম্বর"-"তোমার সদৃশ" ইত্যাদি ভবিষ্যদ্বাণী যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশিত, যীশুকে নির্দেশিত নয় সে বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করেছি।

আমরা যারা মুসলমান তারা কখনোই অস্বীকার করি না যে যীশু একজন "মসিহ" ছিলেন, মসিহ শব্দের অর্থ করা হছে "যীশু"। (১৬)

মসিহ-এর আগমন সম্পর্কে খ্রিস্টানদের দাবীমতে ওল্ড টেস্টামেন্টে সহস্রবার না একবার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা নিয়ে আমরা বিবাদ করছি না। আমরা যা বলতে চাই তা হলো- ডিউটেরোনোমি ১৮:১৮ তে যীশু সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি বরং তাতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বিশদভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। আমার কথা শুনে পাদ্রী বললেন আলোচনা খুবই চিত্তাকর্ষক। একদিন এসে এ, বিষয়ে সম্মিলিত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করলে তিনি খুব খুশি হতেন- ভদ্রতার সাথে এই বলে পাদ্রী সাহেব আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। কিন্তু দেড় দশক ধরে আমি সে সুযোগের অপেক্ষায়-ই থেকেছি। সুযোগ মেলেনি। আমার

বিশ্বাস আমাকে এরূপ আমন্ত্রণ জানানোর সময় পাদ্রী আন্তরিক ছিলেন, কিন্তু পূর্বসংস্কার এতই দুর্মর যে বিশ্বাসের অবস্থান হতে কেউ নড়তে চায় না।

এ্যাসিড টেস্ট বা অগ্নি পরীক্ষা

যীশুর মেষ শাবকদেরকে বলি, তোমরা কেন যারা নবী দাবি করবে তাদের ক্ষেত্রে সেই পরীক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগ কর না যা তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে প্রয়োগ করতে নির্দেশ করেছিলেন? তিনি বলেছিলেন : তোমরা তাহাদের ফল দ্বারাই তাহাদিগকে চিনতে পারিবে। লোকে কি কাঁটাগাছ হইতে দ্রাক্ষাফল, কিম্বা শিয়াল কাঁটা হইতে ডুমুরফল সংগ্রহ করে? সেই প্রকারে প্রত্যেক ভাল গাছে ভাল ফল ধরে, কিন্তু মন্দ গাছে মন্দ ফল ধরে... উহাদের ফল দ্বারাই উহাদিগকে চিনিতে পারিবে।"

(মথি ৭ : ১৬-২৯)

তোমার এই পরীক্ষা পদ্ধতি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদত্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখতে ভীত কেন? আল্লাহর প্রেরিত শেষ গ্রন্থ পবিত্র কুরআনে তোমরা দেখতে পাবে- মূসা এবং যীশুর প্রকৃত শিক্ষার পূর্ণতা প্রাপ্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে বিশ্বের বহুল প্রত্যাশিত প্রকৃত শান্তি ও সুখ। "আধুনিক জগতের শাসক যদি হতেন মুহাম্মদ তবে তিনি সকল সমস্যার সমাধান আনতে সক্ষম হতেন, পারতেন আনতে শান্তি ও সুখ"। (জর্জ বার্নার্ড শ)

মহত্তম মানব

১৫ জুলাই ১৯৭৪ সাপ্তাহিক টাইম ম্যাগাজিনে "কে ইতিহাসে মহত্তম নেতা ছিলেন" এ বিষয়ে বিশ্বের খ্যাতনামা বিভিন্ন ঐতিহাসিক, লেখক, ব্যবসায়ী, সামরিক ব্যক্তিত্বের মতামত সংকলিত হয়েছিল। কেউ বলেছিলেন হিটলার, কেউ বলেছিলেন গান্ধি, বুদ্ধ, লিনকন ইত্যাদি। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের একজন মনোবিজ্ঞানী মি. মাজারমান বিষয়টি বিবেচনার জন্য একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করে বলেছিলেন যে "নেতাকে তিনটি বিষয়ে পূর্ণতা অর্জন করতে হবে :

১. তার জনগণের মঙ্গলের ব্যবস্থা করতে হবে,

২. এমন এক সামাজিক সংগঠনের ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে জনগণ তুলনামূলকভাবে নিরাপদ এবং

৩. তাদেরকে তিনি এক গুচ্ছ বিশ্বাস প্রদান করবেন।

"পাস্তুর ও সালক প্রথম বিষয়ের নেতা, হিটলার ও আলেকজান্ডার দ্বিতীয় বিষয়ের নেতা এবং গান্ধি ও কনফুসিয়াস তৃতীয় বিষয়ের নেতা। সম্ভবত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মহত্তম নেতা কারণ তিনি সকল তিনটি বিষয়ে সফলতা লাভ করেছিলেন। কিছুটা কম হলেও মূসা (আ) তদ্রূপ সফলতা লাভ করেছিলেন।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক, আমার বিশ্বাস তিনি ইহুদী, যে মানদণ্ড স্থির করেছিলেন সেই মানদণ্ড অনুসারে মানব জাতির মহান নেতাদের মধ্যে যীশু বা বুদ্ধ কারো স্থান হয়নি; তবে আশ্চর্যের বিষয় যে মূসা ও মুহাম্মদকে একই দলভুক্ত করে মুহাম্মদ যে মূসার সদৃশ এই বক্তব্যকে আরো শক্তিশালী করেছেন। ডিউট ১৮:১৮ তোমার সদৃশ "মূসার সদৃশ"।

পরিসংহারে বাইবেলের একজন সম্মানিত ব্যাখ্যাকার পাদ্রীর মন্তব্য ও তার শিক্ষকের মন্তব্য দিয়ে পরিসমাপ্তি টানছি :

"প্রকৃত পয়গম্বরের মাপকাঠি হইতেছে তাহার নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা।" (প্রফেসর ডুমেলো) "তাহার পরিচয় ফলে।" (যীশু খ্রিস্ট)

টীকা

১. কোরআন শরিফে সূরা আহকাফ আয়াত ১০-এ যে বনী ইসরাইলের একজন উল্লেখ করা হয়েছে তিনি মূসা (আ)

২. খ্রিস্টান বাইবেল ব্যাখ্যাকারকগণ ইংরেজি বর্ণমালার মান অগ্রসরমান সংখ্যা দ্বারা নিরূপণ করে যোগফল ৬৬৬ লাভ করেন। যেমন এ=৬, বি=১২, সি=১৮ ইত্যাদি। এমনিভাবে ইংরেজি প্রতিটি বর্ণের একটি মান নির্ণয় করা যায়। অতঃপর কিসিনজার নামের সবগুলি বর্ণের যোগফল সম্ভবত দাঁড়ায় ৬৬৬। পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

৩. দক্ষিণ আফ্রিকার একটি প্রদেশের নাম ট্রান্সভাল।

৪. সলমন সংগীত ৫:১৬-তে মুহাম্মদ নামের উল্লেখ রয়েছে। হিব্রু ভাষায় উল্লেখ হয়েছে মহাম্মাদিম বলে। ইম বহুবচনে, সম্মানের ক্ষেত্রে যুক্ত হয়ে থাকে। ইম ব্যতিরেকে হবে মহাম্মুদ, যার অর্থ সামগ্রিকভাবে প্রিয় সত্যায়িত বাইবেলের অনুবাদ দ্রষ্টব্য অর্থাৎ সম্মানিত অর্থাৎ মুহাম্মদ।

আরব ও ইসরাঈল : সংঘাত না সমঝোতা

অনুবাদ

ফজলে রাব্বী

সূচি

অধ্যায় এক

আরব ও ইসরাইল

يٰبَنِيٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

হে বনী ইস্‌রাঈল! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যা দিয়ে আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছিলাম এবং বিশ্বে সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

— কুরআন ২ : ৪৭

১৯৮২ সালের কোন এক সময় ডাক্তার ই লোটেম ও এই পুস্তকের লেখকের মধ্যে যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার উপর ভিত্তি করে এই পুস্তকটির নামকরণ করা হয়েছে। বিতর্কের বিষয়বস্তু ইহুদীরাই নির্ধারণ করেছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে “বিচার মানি কিন্তু তালগাছটি আমার” এ বিষয়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে।

একটি দৃশ্যে একজন মুসলমান মহিলা তার ছোট্ট দাউদকে ইসরাইলি সৈন্যের হাত থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করছে। আরেকটি দৃশ্যে দেখানো হয়েছে একজন ইহুদীর পৌত্র নাৎসি জার্মানির হাত থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। তার জীবনের লক্ষ্য যেন লেখা রয়েছে তার হেলমেটে– হত্যার জন্য জন্ম। পার্থক্য এটুকু যে তার বাহুতে স্বস্তিকা চিহ্ন নেই। ভাগ্যের কী পরিহাস, একদিন যে ছিল অত্যাচারিত সে আজ হয়েছে অত্যাচারী।

একবার বিদেশ যাত্রাকালে, আমার যা চিরকালের অভ্যাস কিছু একটা পড়ার জন্য অস্থির। হাতের কাছে ইংরেজি খবরের কাগজ ম্যাগাজিন যা পাচ্ছিলাম তাই

একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম। টাইম, নিউজ উইক প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা দেখছিলাম। হঠাৎ একটি পত্রিকার দিকে চোখ পড়ল, সেখানে লেখা "জর্দান সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জানা আবশ্যক"। আমাদের চাচাতো ভাই ইহুদীদের ধূর্তামীর প্রশংসা না করে পারা যায় না। তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিক্ষার আছে। তারা মানব জাতির জন্য আল্লাহ্‌র গিনিপিগ। বাইবেল ও কুরআন থেকে তাদের ইতিহাস জানা যায়। তাদের গর্ব ঔদ্ধত্য, একগুয়েমি পরিহার করুন। কারণ এর ফলে তারা বারংবার স্বাধীনতা হারিয়েছে। তাদের ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং তাদের সুপরিকল্পনা বিষয়ে তাদের অনুসরণ করুন, অথবা তাদেরকে ছাড়িয়ে যেতে চেষ্টা করুন। কারণ এই গুণাবলির দ্বারাই তারা ফিলিস্তিনের নিয়ন্ত্রণ দ্বিতীয়বার লাভ করেছে।

সেই বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য দুর্ধর্ষ ইহুদী জাতি এবং ইহুদীবাদী খ্রিস্টানদেরকে বুঝ দেওয়া। এমনকি ফিলিস্তিনীদেরকে বোঝানো যে জর্দানই প্রকৃতপক্ষে ফিলিস্তীন। ইহুদীরা ফিলিস্তিন দেশের উপর যে জবরদস্তি চালিয়েছে তা থেকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি অন্য দিকে সরানোর চেষ্টা। গাজা এবং পশ্চিম তীরের মানুষগুলির উপর ইহুদীদের লোভ ও লালসা চরিতার্থ করার জন্য যে ভয়াবহ নির্যাতন চলছে সেই বিষয় থেকে দৃষ্টি অপসারিত করে বিশ্ব যেন জর্দান বিষয় নিয়ে বিতর্কে মত্ত হয়। উদ্দেশ্য জঘন্য প্রকৃতির, কিন্তু পরিকল্পনা সুদূরপ্রসারী।

ধারণাটি আমার মস্তিষ্কে স্থির হয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকদিনের মধ্যে সুযোগ এসে গেল। আল্লাহ সকল সুযোগের স্রষ্টা।

পুরস্কার প্রাপ্ত ছবি

আমি ইহুদী অত্যাচারের ছবি স্থানীয় একটি সংবাদপত্রে পেলাম। আমার দৃষ্টি ইহুদী নিষ্ঠুরতার ফলে যে মজলুম তাকে ঘিরেই আমার মানসলোকে আবর্তিত হচ্ছিল। আমি চিৎকার করে বললাম, ইয়া আল্লাহ, এই মানুষগুলো আর কতদিন এমন নির্যাতন সহ্য করবে?

সাধারণত আমার চোখে অশ্রু আসে না। কিন্তু এই ছবির বাস্তবতা আমার বিবেককে ভীষণভাবে নাড়া দিল। আমার বোধশক্তি ভোঁতা হয়ে গেল। আমি ভেঙ্গে পড়ে কাঁদতে লাগলাম। আমি জানতাম কারো অন্তরে বিন্দুমাত্র মায়া মহব্বত যদি থাকে সেও আমার মতো অনুভব করবে। তখন আমার ইচ্ছা হল প্রকৃত ফটোগ্রাফ

সংগ্রহ করা দরকার, কারণ সংবাদপত্রের মুদ্রিত ছবি ততটা স্পষ্ট নয়। আমি সেই সংবাদপত্রের বার্তা সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করে ফটোটি সংগ্রহ করলাম। এটা ছিল সাদা কালো ছবি। পরবর্তীকালে এর রঙ্গীন ছবিটিও সংগ্রহ করেছিলাম। এতে আমার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল, অতঃপর দিন ও রাত্রির মতো একটার পর একটা কাজ চলতে লাগল।

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ্‌ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে থাকেন।

— কুরআন ২৯ : ৬৯

রচনা প্রতিযোগিতা

প্রথম সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা সেই ছবিটি ইহুদীবাদ প্রভাবিত খ্রিস্টান মিডিয়ায় প্রকাশ করা। অসহায় ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে কি নৃশংস অত্যাচার ও নিপীড়ন তাদের জারজ সন্তানরা চালাচ্ছে তা প্রকাশ করা। ফিলিস্তিনীদের অপরাধ যে তাদের জাতি ও সংস্কৃতি ভিন্ন। এবং তারা সহজে বিচ্ছিন্ন ও নিশ্চিহ্ন হবে না। কিন্তু ইহুদীরা মনে প্রাণে সেটাই চায়।

হিটলারের হলোকাস্ট থেকে রক্ষা পেয়ে যে সকল ইহুদী বর্তমানে ইসরাইলের বাসিন্দা হয়েছে তাদের বংশধরদের ফিলিস্তিনীদের প্রতি যে নিষ্ঠুর নীতি ও আচরণ তাকে যথেষ্ট প্রচার করার জন্য একটি রচনা প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা করা হল এবং রাখা হল নগদ পুরস্কারের ব্যবস্থা।

প্রতিযোগীদের বলা হল যে, "ভীতির চেহারা" নামে একটি ছবির বিকল্প নামকরণ করতে হবে ও ঐ ছবি সম্পর্কে তার নিজের মনোভাব নিজের ভাষায় লিখতে হবে। ছবিটির ছোট শিশুটির চোখে যে ভয়, মায়ের মুখে যে অসহায় আর্তি, ফিলিস্তিনী তরুণ মেয়েটির চোখে-মুখে যে ভীতি-এ সব কিছু মিলিয়ে এক ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে। যে কেউ এ ছবি দেখলে বুঝতে পারবে। পরবর্তীকালে এই ছবিটির একটি রঙিন কপি পেয়েছিলাম। এ রঙিন ছবিটি দেখে অস্ট্রিও-জার্মান ইহুদী

লিওপোল্ড ওই ছবির দিকে আঙ্গুল তুলে চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলেন। তার সেই চিৎকার ছিল যেন ইহুদীদের হৃদয় ও আত্মার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা। তিনি আপন জাতিকে ভর্ৎসনা করেছিলেন।

সেই ছবি ও তার বর্ণনা যদি কাউকে বিচলিত না করে তবে বুঝতে হবে তার হৃদয় বলে কিছু নেই।

ইহুদীর প্রতিক্রিয়া

আমাদের বিজ্ঞাপন প্রচারের খবর ইতোমধ্যে ইহুদীদের কানে পৌঁছে গেছে। তাদের যারা এজেন্ট ও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল তাদের মাধ্যমে যথাস্থানে খবর পৌঁছে গেল। অনেকগুলি পত্রিকার বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হল। যেসব পত্রিকায় এই বিজ্ঞাপন বের হয়েছিল তার বিরুদ্ধে দারুণ হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। আমাদেরকে ইহুদী বিরোধী, সেমেটিক বিরোধী আখ্যায়িত করা হল। ইহুদীদের সঙ্গে কোন বিষযে মতবিরোধ হলে আমাদের চাচাতো ভাই ইহুদীরা তাকে সেমাইট বিরোধী বলে অতি সহজেই আখ্যায়িত করে। আর এ কথা বললে খ্রিস্টান জগতে জাদুর মত কাজ করে। তারা সবাই তখন এদের বিরুদ্ধে এক পায়ে খাড়া হয়ে যায়। খ্রিস্টানদের মনে তখন একই সঙ্গে মনে পড়ে হিটলারের কথা, হলোকাস্টের কথা, মনে পড়ে ইহুদীদের দ্বারা লক্ষ লক্ষ নিরীহ নারী পুরুষ শিশু হত্যার কথা।

প্রতি বছর ইস্টারের সময় সারা বিশ্বের খ্রিস্টানরা মাতম করত 'ইহুদী মার' বলে, যীশু হত্যাকারী ওরা, আমাদের ঈশ্বরকে হত্যা করেছে। হাজার বছরের হত্যা ও লুণ্ঠন এখন খ্রিস্টানদের বিবেককে ব্যথিত করছে। সেমাইট 'বিরোধী' কথাটি উচ্চারণ করলেই ইহুদীদের প্রতিটি অপরাধ জাদুর মত ঢেকে ফেলে। ইহুদীদের প্রতিটি অপকর্মের প্রতি পশ্চিমা জগত চোখ বন্ধ করে থাকে কারণ তাদের ভয় যে তাদেরকেও সেমাইট বিরোধী বলে আখ্যায়িত করা হবে। ইসরাইলরা মনে করে তাদের পালক পিতা ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট রাম্বো রিগান কোন পাপ করতে পারে না বলে তারা চিরকাল নিষ্কলুষ। ইহুদী লবির হাত থেকে আমেরিকার প্রশাসন কোনদিন মুক্ত হতে পারবে কিনা সন্দেহ।

অধ্যায় দুই

ফিলিস্তীনের উপর বিতর্ক

১৯৮২ সালে যখন ইহুদীরা হঠাৎ লেবানন আক্রমণ করে বসল তখন একদিন আমি ডারবানের নাটাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাসন-এর ফোন পেলাম। তিনি জানালেন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রিটোরিয়া দূতাবাসের একজন ইহুদী কর্মকর্তার বক্তৃতার আয়োজন করেছে। তিনি ফিলিস্তিন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন।

একজন খাঁটি ব্রিটিশ হিসাবে তিনি মনে করেছেন যেখানে নানা জাতির ছাত্র রয়েছে (হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদী), সেখানে এইরূপ বিতর্কিত বিষয় নিয়ে একতরফা বক্তৃতা ন্যায়সঙ্গত হবে না। মুসলমানদের মনোভাব উপস্থাপন করার জন্য কেউ আমার নাম প্রস্তাব করেছে। তিনি জানতে চাইলেন এই সমস্যা নিয়ে ইহুদীর সঙ্গে বিতর্ক করতে আমি রাজি কি না। আমি সম্মত হলাম, কারণ বিগত ত্রিশ বছর যাবত ফিলিস্তিন নিয়ে ইহুদীদের সঙ্গে অসংখ্যবার তর্ক আলোচনা ও বাক্যালাপ করার অভিজ্ঞতা আমার রয়েছে।

বিতর্কের শিরোনাম

অধ্যাপক মহাশয় আমার নিকট জানতে চাইলেন বিতর্কের বিষয় হিসাবে কি শিরোনাম দেওয়া যেতে পারে। আমি সুপারিশ করলাম 'ইসরাইলের নানা প্রসঙ্গ'। অধ্যাপক মহাশয় সহজভাবে প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন এবং বললেন যে শিরোনামটি ভালই মনে হচ্ছে, তবে অনুষ্ঠানের সংগঠক ইহুদীদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করবেন।

কয়েকদিন পর আবার তিনি ফোন করে জানালেন ইহুদী ছাত্ররা আমার প্রস্তাবিত শিরোনাম খুব একটা পছন্দ করছে না। তারা এর পরিবর্তে শিরোনাম ঠিক করেছে 'আরব ও ইসরাইল–সংঘর্ষ অথবা সমঝোতা'। এতে আমি সম্মত হলাম। তারা বলল আমাকে প্রথমে বলতে হবে। আমি এতেও রাজি হলাম।

উভয়দিকে আমাদের পরাজয়

এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে, শিরোনামের মধ্যে একটা চালাকি রয়েছে। আমাদের ইহুদী ভাইরা বিতর্কের শুরুটাই আমাদের বেঁধে ফেলেছে। সংঘর্ষ অথবা সমঝোতা, আপনি কোন পক্ষ অবলম্বন করবেন? যদি সংঘর্ষের পক্ষে বিতর্কে নামি তবে সমস্ত শ্রোতাই আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মনে করে তারা শান্তিপ্রিয় ও ন্যায়ের পক্ষে। তারা চাইবে যে উভয় পক্ষের বক্তব্য যথাযথভাবে শ্রবণ করবে ও ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌছবে। মুসলমানরা সংঘর্ষের পক্ষ নিলে বলবে তারা যুদ্ধবাদী। অন্যদিকে এই ফাঁদে পা না দেওয়ার জন্য যদি সমঝোতার পক্ষ অবলম্বন করি তাহলে ইহুদীরা বলবে, "আমাদের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করছ কেন?" আমরা যে পক্ষই অবলম্বন করি না কেন আমাদের হারতে হবে। এটা অনেকটা 'বিচার মানি কিন্তু তালগাছটা আমার'।

এ রকমই ইহুদীদের প্রতিভা। আল্লাহ তাদেরকে অনেকের চাইতে অনেক বেশি বুদ্ধি দিয়েছেন। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা আমানত। আল্লাহ্ সকলকেই কোন কোন বিষয়ে অন্যদের থেকে কিছু বেশি দিয়ে থাকেন, এটা তার অসীম দয়া। এটা তিনি দান করেন পরীক্ষার জন্য।

উদ্দেশ্যহীন নয়

পবিত্র কুরআন থেকে আমরা জানতে পারি যখন মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তাঁর হাবীব ইবরাহিম (আ)-কে প্রথম সন্তান ইসমাইলের জন্মের সুসংবাদ দিলেন ঃ

فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ○

অতঃপর আমি তাকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

— কুরআন ৩৭ : ১০১

তারপর যখন দ্বিতীয় সন্তান ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ দিলেন তখন একটু ভিন্নভাবে দিলেন ঃ

قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ○

উহারা বলল, 'ভয় করো না, আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী পুত্রের শুভসংবাদ দিচ্ছি।'

— কুরআন ১৫ : ৫৩

বড় ছেলে ইসমাইলের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও তার বংশধর আরবদের স্বভাব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে তারা "হালিম" অর্থাৎ বিনয়ী, অনুগত, আল্লাহর রাস্তায় চলতে সদা প্রস্তুত। অপরপক্ষে ইসহাকের বংশধর ইহুদী জাতি। ইসহাক সম্বন্ধে বলা হয়েছে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, দায়িত্ব সম্পন্ন ও বুদ্ধিমান।

নতুন কিছু নয়

"সংঘর্ষ অথবা সমঝোতা" প্রস্তাবের মাধ্যমে আমাদের চাচাতো ভাইয়েরা আমাদেরকে যেভাবে আটকাতে চাচ্ছে তা নতুন কিছু নয়। দুই হাজার বছর আগে তারা হতো হযরত ঈসা (আ)-এর সঙ্গে একই খেলা খেলছিল। ইহুদীরা বারবার হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট প্রশ্ন ও ধাঁধা নিয়ে উপস্থিত হতো। তাদের অতুলনীয় চাটুকারিতা ও চালাকি লক্ষ্য করুন–

আর তারা হেরোদীয়দের সহিত আপনাদের শিষ্যগণকে দিয়ে তাঁকে বলে পাঠালো, গুরু, আমরা জানি, আপনি সত্য এবং সত্যরূপে ঈশ্বরের পথের বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, এবং আপনি কারো বিষয়ে ভীত নন, কেননা আপনি মানুষের মুখাপেক্ষা করেন না। ভাল, আমাদেরকে বলুন, আপনার মত কি? কৈসরকে কর দেওয়া বিধেয় কি না? কিন্তু যীশু তাদের দুষ্টামি বুঝে বললেন, কপটীরা, আমার পরীক্ষা কেন করছ? সেই করের মুদ্রা আমাকে দেখাও। তখন তারা তাঁর নিকটে একটি দীনার আনল। তিনি তাদের বললেন, এই মূর্তি ও এই নাম কার? তারা বলল, কৈসরের। তখন তিনি তাদেরকে বললেন, তবে কৈসরের যা যা কৈসরকে দাও, আর ঈশ্বরের যা যা ঈশ্বরকে দাও। ... বাইবেল–মথি ২২:১৬-২১

ঈসা (আ)-ও প্রশ্নকর্তাদের চেয়ে কম ইহুদী ছিলেন না। তারা তাকে ফাঁদে ফেলতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে কিন্তু তিনি তাদের ফাঁদে পা দেননি। তিনি তাদেরকে ধরে ফেলেছিলেন। যদি তিনি উত্তর দিয়ে বলতেন "কর দাও" তাহলে তারা ও ইহুদী নেতারা জনগণকে বলত যে যীশু কোন মেসিহা নন (যীশু) বা রোমকদের হাত থেকে ইহুদীদের মুক্ত করার মত মানুষ তিনি নন, বরং নিপীড়নকারী রোমকদের পদলেহি। এর বিপরীত তিনি যদি বলতেন, "কর দিও না", তাহলে তারা কর দিত না। কর না দেওয়ার কারণে তাদেরকে গ্রেফতার করা হলে তারা বলত, "আমাদেরকে মেসিহা কর দিতে বারণ করেছে।" তাহলে যিশু বিপদে পড়তেন। অর্থাৎ তিনি যাই বলতেন তাতে তিনি হেরে যেতেন। অর্থাৎ বিচার মানি "তালগাছ আমার"।

যীশুকে বিভ্রান্ত ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার এটাই ইহুদীদের শেষ প্রচেষ্টা ছিল না। তাদের বড় বড় পণ্ডিত ও পুরোহিতরাও বারবার যিশুর নিকট এসেছিল।

তখন অধ্যাপক ও ফরীশীগণ ব্যভিচারে ধৃতা একটি স্ত্রীলোককে তাঁর নিকট আনল ও মধ্যস্থানে দাঁড় করিয়ে তাকে বলল, হে গুরু, এই স্ত্রীলোকটি ব্যভিচারী, সেই ক্রিয়াতেই ধরা পড়েছে। ব্যবস্থায় মোশি এ প্রকার লোককে পাথর মারবার আজ্ঞা আমাদেরকে দিয়েছেন; তবে আপনি কি বলুন? তারা তার পরীক্ষাভাবেই এই কথা বলল; যেন তাঁর নামে দোষারোপ করবার সূত্র পেতে পারে। কিন্তু যীশু হেঁট হয়ে অঙ্গুলি দ্বারা ভূমিতে লিখতে লাগলেন। পরে তারা যখন বারবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল। তিনি মাথা তুলে তাদের বললেন, তোমাদের মধ্যে যে নিষ্পাপ, সেই প্রথমে একে পাথর মারুক। — যোহন ৮ : ৩-৭

ইহুদীরা পুনরায় যিশুকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেছিল। বিশ্বের সকল নিপীড়িত ও দরিদ্রের ভালবাসার কারণে যিশু যদি বলতেন, "তাকে যেতে দাও"। তাহলে ইহুদীরা সমস্বরে ঘোষণা করত, এই ব্যক্তি ঈশ্বর প্রেরিত ব্যক্তি নয়। আমরা যে মসিহের জন্য অপেক্ষা করছি ইনি সেই লোক নন। লেকিও পুস্তকে একথা কি বলা নেই যে, ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী উভয়ের প্রাণদণ্ড অবশ্যই হইবে?

অপরপক্ষে মূসা (আ) যদি আইন অনুযায়ী শাস্তি ঘোষণা করতেন তাহলে তারা নিশ্চয়ই স্ত্রীলোকটিকে পাথর মেরে হত্যা করত। অথচ রোম সাম্রাজ্যে ব্যভিচারের জন্য শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ড প্রদান আইনসম্মত ছিল না। অতএব তিনি যদি ঘোষণা করতেন তাহলে নিজেই রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হতেন। বর্তমানে অবশ্য বিশ্বে কোথাও ইহুদী খ্রিস্টান রাষ্ট্রে ব্যভিচার প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ নয়।

উভয় সংকট

যিশু দেখলেন তিনি উভয় সংকটে পড়েছেন। ইহুদীদের ফাঁদে ধরা পড়েছেন। দুটোই ইহুদীদের ফাঁদ। হয়তো মূসা (আ) আইন লঙ্ঘন করতে হয়, নয়তো রোমক আইন ভঙ্গ করতে হয়। তিনি এই সংকটের সমাধান নিজে করলেন না। বুদ্ধি করে এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসলেন। বললেন, তোমাদের মধ্যে যে নিষ্পাপ, সেই প্রথমে একে পাথর মারুক (যোহন ৮ : ৭)। তিনি তার জ্ঞাতিভাইকে ভালই জানতেন -'এরা এইকালে দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোক। (মথি ১২ : ৩৯)

যেমন পিতা তেমন পুত্র

ইহুদীরা যিশুর সঙ্গে যেইরূপ ব্যবহার করেছিল তেমনি তাদের পুত্র তথা বংশধর বর্তমানের ইহুদীরাও আমার সঙ্গে করল। তারা চাইল যে বিতর্কের বিষয়বস্তু হোক- 'সংঘর্ষ অথবা সমঝোতা'।

বলা হল "আপনি যেমন চান তেমনি হবে"। আমি সম্মত হলাম। চোখ কান খুলেই সম্মত হলাম। সাধারণত মুসলমানরা চোখ বন্ধ করেই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর প্রমাণ জাতিসংঘের অসংখ্য প্রস্তাব, ডেভিড চুক্তি ও অসংখ্য যুদ্ধবিরতির চুক্তি। ইহুদীরা বলল, বক্তা হিসাবে আমাকেই প্রথম বলতে হবে। যদিও জানতাম প্রথমে বলার সুবিধাও আছে, অসুবিধাও আছে; তবুও আমি সম্মত হয়েছিলাম।

উনিশশ' বিরাশি সালে নাতাল বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঠিক তখনই পশ্চিম বৈরুতের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় ইসরাইলিরা বোমা বর্ষণ করে। এই বিতর্ক সভা দারুণভাবে সফল হয়েছিল। বিতর্কের পরে প্রশ্ন উত্তর পর্ব অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়েছিল। শ্রোতাদের পক্ষ থেকে প্রচুর প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ভিডিও টেপে ধারণ করা হয়। গর্বের বিষয় বর্তমানে আমাদের নিকট প্রায় ষাটটি উচ্চমান সম্পন্ন ভিডিও কর্মসূচি রয়েছে। তার মধ্যে 'আরব ও ইসরাইল-সংঘর্ষ না সমঝোতা' এটিও আছে। এটি কেপটাউনে প্রদত্ত আমার একটি ভাষণ। ডক্টর ই. লোটেম এর সঙ্গে বিতর্কে প্রধান গুরুত্ব দিয়েছিলাম যে ফিলিস্তিন ভূমিতে ইহুদীদের কোন নৈতিক দাবি থাকতে পারে না। ১৯৮২ সালে অনুষ্ঠিত এই স্মরণীয় বিতর্কের পরে ডক্টর লোটেম আমার নিকট স্বীকার করেছিলেন যে, ফিলিস্তিনের সংঘর্ষের পিছনে খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্রই প্রধান। খ্রিস্টান বিশ্ব সম্ভবত চরমভাবে ধ্বংস হওয়ার জন্য একটি বিভীষিকাময় যুদ্ধ আরম্ভ হোক তাই চায়। এটাকে তারা বলে ফিলিস্তিনে 'আরমা গেদন'। যতক্ষণ 'আরমা গেদন' না হচ্ছে ততক্ষণ যিশু দ্বিতীয়বার আসবেন না। তাদের কাছে মানুষের মৃত্যু ও ধ্বংস যেন পিকনিক পার্টি। খ্রিস্টানদের কাহিনী যে যিশু মেঘের মধ্যে এসে সমস্ত বিশ্বাসীকে ডেকে নিয়ে যাবেন কিন্তু এই গল্প ইহুদীরা বিশ্বাস করে না। যিশুকে সত্বর ফিরিয়ে আনার জন্য খ্রিস্টানদের পাগলামি ইহুদীদের খাপ খায়। এর ফলে তারা খ্রিস্টানদের অন্ধ সমর্থন লাভ করতে পারে। ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান নামে আরেকটি বিতর্কের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, কিন্তু খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্রে বানচাল হয়ে যায়।

مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَٰسِقُونَ

তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুমিন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।

— কুরআন ৩ : ১১০

অধ্যায় তিন

কিছু ভাল ইহুদী

জার্মানির একটি সংবাদপত্রের নাম ফ্রাঙ্কফুটার জেইতুং। ১৯৯২ সালের শেষের দিকে এই সংবাদপত্রের প্রতিনিধি লিওপোল্ডওয়াইজ জেরুজালেম পরিদর্শনে আসেন। তিনি ছিলেন অস্ট্রো, জার্মান, ইহুদী বংশদ্ভুত। তার এক বন্ধুর বাড়িতে ইহুদীবাদী আন্দোলনের একজন প্রধান ডক্টর শাস ওয়াইজম্যানের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা হচ্ছিল। তার চারপাশ ছিল তার তরুণ অনুসারী– বেন গুরিয়ন, বেগিন ও ডায়ান দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাদের সামনে টেবিলের উপর ফিলিস্তিনের একটা মানচিত্র। তারা আলোচনা করছিলেন কীভাবে ইহুদী রাষ্ট্র এর মাঝ থেকে বের করবেন।

আরবদের কী হবে?

তরুণ ইহুদী সাংবাদিক দেখলেন ফিলিস্তিনে বসবাসকারী আরবদের সম্পর্কে তারা কোন চিন্তা করছেন না। আইনসঙ্গতভাবে বসবাসকারী আরবদেরকে অন্যায়ভাবে উৎখাত করার পরিকল্পনা চলছে। নব্য ইহুদীবাদী সাংবাদিক নিশ্চুপ থাকতে না পেরে ড. শাম ওয়াইজম্যানকে প্রশ্ন করলো, “আরবদের কি হবে?” এ বিষয়ে তরুণ সাংবাদিক তার প্রতিবেদনে লিখেছেন: “আলোচনার মাঝখানে আমার প্রশ্ন মনে হলো সবাইকে হতচকিত করে দিয়েছে। ড. ওয়াইজম্যান তার হাতের টুপিটা টেবিলের উপর রেখে ধীরে ধীরে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে আমারই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন, আরবদের কী হবে? হ্যাঁ, যারা এই দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী সেই আরবদের চরম বিরোধিতার মাঝ দিয়ে তোমরা তাহলে ফিলিস্তিনকে তোমাদের আবাসভূমি করার আশা পোষণ কর কীভাবে? ইহুদী নেতা কাঁদে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, “আমরা আশা করি আরবরা আর কয়েক বছরের মধ্যে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় থাকবে না।”

“সম্ভবত তাই। আপনারা এই সমস্যা নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত কাজ করছেন। পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার চাইতে আপনারা ভাল জানেন। আরবরা বাধা সৃষ্টি করতে গিয়ে রাজনৈতিকভাবে সমস্যার সৃষ্টি করবে কি করবে না সে বিষয় বাদ দিয়ে

আপনারা কি কখনো এর নৈতিক দিকটা বিবেচনা করেছেন? যারা চিরকাল এখানে পুরুষানুক্রমে বসবাস করছে তাদেরকে উৎখাত করা যে অমানবিক ও অন্যায় সে দিকটা কি ভেবেছেন?

ড. ওয়াইজম্যান ভুরু কুচকিয়ে জবাব দিলেন, “কিন্তু এই দেশ আমাদের দেশ। অন্যায়ভাবে আমাদেরকে যে দেশ হতে বঞ্চিত করা হয়েছিল আমরা সেই দেশ ফিরিয়ে নিচ্ছি।” আমি এটা ভেবে পাচ্ছি না কীভাবে একটি সৃষ্টিশীল বুদ্ধিমান জাতি ইহুদী আরব বিরোধের কেবল একচোখা ইহুদীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করতে পারে? তারা কী একথা বুঝতে পারে? তারা অনুধাবন করতে পারছে না যে শেষ পর্যন্ত ফিলিস্তিনে ইহুদীদের সমস্যা কেবল মাত্র আরবদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে সমাধান সম্ভব?

তাদের বর্তমান নীতি ভবিষ্যতে দুঃখজনক ও কষ্টকর হবে সেই বিষয়ে তারা এত নৈরাশ্যজনকভাবে অন্ধ কেন? প্রতিকূল আরব সমুদ্রের মাঝে তারা একটি দ্বীপ মাত্র। সাময়িকভাবে হয়তো তারা সফল হতে পারে। কিন্তু চিরকাল ঘৃণা তিক্ততা ও সংঘর্ষের মধ্যে বসবাস করা কি সম্ভব? সবচাইতে দুঃখজনক ও আশ্চর্যের বিষয়, যে জাতি সুদীর্ঘকাল নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছে, তারাই এখন একদেশদর্শী হয়ে স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য অপর এক জাতির উপর চরম অন্যায় করতে যাচ্ছে। অথচ সেই জাতি অতীতে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যে সকল নির্যাতন পরিচালিত হয়েছে সেইগুলির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নির্দোষ। (যখন শেষ অনুচ্ছেদটি পাঠ করা হল তখন অনেকেরই চোখ ভিজে গিয়েছিল)

আমি জানি এমন ঘটনা ইতিহাসে অজানা নেই। কিন্তু আমার চোখের সামনে এমন ঘটনার পরিকল্পনা প্রণয়ন হতে দেখে আমি সত্যিই দুঃখিত।

মস্তিষ্ক ধোলাই

প্রশ্ন উঠতে পারে ‘এটা কি করে সম্ভব হয়েছিল?’ হ্যাঁ সম্ভব। সব কিছুই সম্ভব। মস্তিষ্ক ধোলাই অথবা প্রোগামিং-এর মাধ্যমে অতি সহজ অত্যন্ত সভ্য সংস্কৃতিবান জার্মান জাতি ৬ লক্ষ ইহুদীকে হত্যা করেছিল এই মস্তিষ্ক ধোলাইয়ের মাধ্যমে। কেউ কেউ বলে এই সংখ্যা সত্য নয়। না হোক, জাতি বিদ্বেষের নামে ছয়শ কেন, ছয় জন ইহুদীকেও যদি ধ্বংস করা হয় তাহলে সেটাই যথেষ্ট নাটকীয়। এটা কি করে সম্ভব হয়েছিল? এটি সম্ভব কারণ জার্মানদের মস্তিষ্ক ধোলাই করা যেতে পারে, ইহুদীদের মস্তিষ্ক ধোলাই করা যেতে পারে, মুসলমানদের মস্তিষ্ক ধোলাই করা যেতে পারে, খ্রিস্টানদের মস্তিষ্ক ধোলাই করা যেতে পারে।

ইহুদীদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক

পঞ্চাম দশকের প্রথমদিকে আমি ইহুদীদের জন্য কাজ করতাম। তারা আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত ও পারিশ্রমিকও ভাল দিত। বাণিজ্য জগতে আমার দীর্ঘ পেশাকালে তাদের মধ্যে আমি অনেক ভাল মনিব পেয়েছি। যে কোম্পানিতে আমি চাকুরি করতাম তখন তাদের ৯টি দোকান ছিল। এখন সেই 'বিয়ার ব্রাদার্সের' ১২৫টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। একদিন আমার মনিব মিস্টার বেরিন বিয়ার তার অফিস কক্ষে ডেকে নিলেন এবং বললেন আর্জেন্টিনা হতে এক ইহুদী দম্পতি তার এখানে বেড়াতে এসেছেন। তার ইচ্ছা আমি তাদেরকে নিয়ে ডারবান শহরের ভারতীয় এলাকায় নিয়ে যাই। তাদের নিয়ে শহরটা দেখাই। তারপর কোন ভারতীয় রেস্তোঁরায় গিয়ে মশলাদার খাবার খাওয়ানো যাবে। তিনি আমার পরামর্শ চাইলেন। আমি বললাম 'গুডউইল লাউঞ্জ' নামে একটি ভারতীয় রেস্তোঁরা আছে। কিন্তু সেটা ভারতীয় হলেও অন্যান্য ইউরোপীয় রেস্তোঁরার মতোই। তবে কারি-পাউডার দিয়ে কিছু একটা রান্না করে বলে ভারতীয় খাবার। তার চেয়ে আমার বাড়িতেই আসুন না কেন? সেখানে আমরা মুসলমানরা যা খাই তাই খাওয়াব। ভারতীয় গান শোনাব। তারপর দক্ষিণ গোলার্ধের সবচেয়ে বড় মসজিদ ঘুরিয়ে দেখাব। আমার প্রস্তাব তার মনপূত হল। তবে ঠিক হলো তিনি তার স্ত্রীর মতামত জেনে বলবেন। পরের দিন সকালে তিনি আবার ডেকে বললেন, আমার প্রস্তাব নাকি তার স্ত্রীর খুব ভাল লেগেছে। যা হোক নির্ধারিত দিনে আমাকে অবাক করে ছয়জন মেহমান এসে যথাসময়ে উপস্থিত। মিস্টার ও মিসেস বিয়ার, মিস্টার ও মিসেস দানিয়েল আর আর্জেটিনা হতে আগত দম্পতি। সবাই ইহুদী। ভাত, তরকারি ও চাপাতি সবাই উপভোগ করলেন। হাল্কা গল্প হচ্ছে, এমন সময় আজান শোনা গেল। জুমা মসজিদ আমার বাড়ির নিকটে। আজানের সঙ্গে সঙ্গে আমি তার অর্থ করে তাদেরকে শোনাতে লাগলাম। আজানও শেষ হল আমাদের খাওয়া ততক্ষণে শেষ। আমি বললাম তাদের যদি আপত্তি না থাকে তাহলে মসজিদে গিয়ে মুসলমানরা কিভাবে নামায পড়ে তা তারা দেখতে পারেন। মিস্টার বিয়ার জানতে চাইলেন মসজিদে তাদেরকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে কি না? তিনি সম্ভবত আমার মূল প্রস্তাব ভুলে গিয়েছিলেন। আমি বললাম, "অবশ্যই"। দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমান অধিবাসীরা উদার হৃদয়ের মানুষ। অমুসলিমদের প্রতি তারা কোন প্রকার বিদ্বেষ বা হিংসা পোষণ করে না, এখানকার আলেমরা তাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজরানের একদল খ্রিস্টানকে মসজিদে নববীতে থাকতে দিয়েছিলেন।

তিনদিন তিনরাত তারা সেখানে ছিলেন। সেখানেই খাওয়া দাওয়া করেছেন, ঘুমিয়েছেন ও তিনদিন সম্ভবত তিন রাতও আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। এমনকি যখন রোববার হল তখন তিনি তাদেরকে সেই মসজিদেই তাদের ধর্মীয় কৃত করতে বলেছিলেন।

মসজিদে ইহুদী

মসজিদে পৌছানোর পর আমি আমার মনিব ও মেহমানদেরকে জুতা খোলার পরামর্শ দিলাম। বুঝলাম জুতা খোলার কথায় তাদের অসুবিধা হতে পারে। তাই তাদেরকে বললাম, জুতা খোলার কারণ তারা জানেন কি না। তারা বললেন, না। আমি তখন ব্যাখ্যা করে বললাম, "আপনাদের স্মরণ থাকতে পারে হযরত মূসা (আ) সিনাই পাহাড়ে গিয়ে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছিলেন।" একথা বলে বাইবেলের একটা অংশ তাদেরকে শোনালাম ঃ

> **তখন তিনি বললেন, এ স্থানের নিকটবর্তী হয়ো না, তোমার পদ হতে জুতা খুলে ফেল; কেননা যে স্থানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, তা পবিত্র ভূমি।**
>
> **— যাত্রা পুস্তক ৩ : ৫**

তারা বেঞ্চে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। আমি ওযূ করতে গেলাম। ওযূ করে ফিরে এসে তাদেরকে বললাম, "দেখুন স্যার, মুসলমানরা প্রতিদিন পাঁচবার নামায পড়তে বাধ্য। তারা বছরের প্রতিদিনই পাঁচবার নামায পড়তে বাধ্য। যে ব্যক্তি নিয়মিত বছরের প্রতিদিন পাঁচবার যথারীতি নামায পড়ে সে প্রতিবার ভালভাবে হাত, পা, মুখ ধোয়। শরীরের যেসব অংশ খোলা থাকে যেমন হাত পা, মুখ নাকের ছিদ্র, ঘাড় এগুলো ধুতে হয়। ভাল করে দাঁত মাজতে হয়। গড়গড়া করে কুলি করতে হয়। আমার মনে হয় এই আনুষ্ঠানিকতার পেছনে তিনটি ভাল কারণ রয়েছে। জ্ঞানী ব্যক্তি হয়তো আরো কারণ খুঁজে পেতে পারেন।

(১) সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যগত কারণে যে পাঁচবার এভাবে ওযু করে তাতে কোন দোষ থাকতে পারে না। স্বাস্থ্যগতভাবে এটা একটা ভাল অভ্যাস, তাই নয় কি? তারা আমার সঙ্গে একমত হলেন।

(২) ওযুর মাধ্যমে একটি মানসিক কাজও হয়। যে ব্যক্তি ওযু করে সে কেবল ময়লা পরিস্কার করার জন্যই তা করে না বরং সে তার প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হতে যাচ্ছে মনে করেই ওযু করে।

(৩) তদুপরি মূসা (আ)-এর নিকট এই বিষয়ে একটি নির্দেশও ছিল ঃ

তা হতে মোশি, হারুন ও তাঁর পুত্রগণ আপন আপন হস্ত ধৌত করতেন; যখন তাঁরা সমাগম তাম্বুতে প্রবেশ করতেন, কিম্বা বেদির নিকটবর্তী হতেন, তৎকালে ধৌত করতেন, যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

— যাত্রা পুস্তক ৪০ : ৩১-৩২

এ কথা বলে আমি তাদেরকে মসজিদের ভেতর নিয়ে গেলাম। সেখানে তারা পেছনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে থাকলেন। আমি এশার নামাজ পড়তে কাতারে দাঁড়ালাম। তারা বসে বসে আমাদের নামাজ পড়া দেখলেন। নামাজ পড়া শেষ হলে আমি তাদের কাছে ফিরে এসে আরও ব্যাখ্যা করে মুসলমানদের নামাযে তথা প্রার্থনায় বিভিন্ন ভঙ্গি যেমন, দাঁড়ানো, রুকুতে যাওয়া, অথবা সেজদায় যাওয়া এসবের বৈশিষ্ট্য কি তা বললাম। এ সময় দুজন নফল নামায় পড়ছিলেন ও সেজদায় গিয়েছিলেন। আমি বললাম এ ভাবেই সকল পয়গম্বর প্রার্থনা করতেন। আমার মন্তব্য বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে কিন্তু তা নয়। আপনারা যদি আপনাদের বাইবেল ভাল করে পড়ে দেখেন তাহলে দেখবেন। এ কথা বলে আমি নিচের অংশগুলো শোনালাম।

(১) **তখন আব্রাহাম উপুড় হয়ে পড়লেন, এবং ঈশ্বর তাঁর সাথে আলাপ করে বললেন....আদি পুস্তক ১৭ : ৩**

(২) **তখন মোশি ও হারোন সমাজের সাক্ষাৎ হতে সমাগত-তাম্বুর দ্বারে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়লেন; আর সদাপ্রভুর প্রতাপ তাঁদের দৃষ্টিগোচর হল।**

— গণনা পুস্তক ২০ : ৬

(৩) **তখন যিহোশূয় ভূমিতে উপুড় হয়ে পড়ে প্রাণপাত করলেন ও তাঁকে বললেন..যিহোশূয় ৫ : ১৪**

(৪) **পরে তিনি (যিশু) কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়ে উপুড় হয়ে প্রার্থনা করে বললেন.... মথি ২৬ : ৩৯**

মিস্টার বিয়ার অবাক হয়ে বললেন, "দীদাত, তোমরা দেখছি ইহুদীদের চেয়ে অনেক বেশি ইহুদী।" সেখানে যদি কোন খ্রিস্টান থাকত তাহলে বলতাম, "জী স্যার, খ্রিস্টানদের চেয়েও বেশি খ্রিস্টান। মুসলমানদের অনেক দুর্বলতা থাকতে পারে। কিন্তু তারা গর্ব করে বলতে পারে বাইবেলের পয়গম্বরদের পদাঙ্ক অনুসারী হিসাবে তারা অনেক বেশি অনুসরণকারী, যত না বাইবেল অনুসারীরা অনুসরণ করে।

কুরআন পরিচয়

ইহুদী সঙ্গীদের নিয়ে আবার বাড়িতে ফিরে এলাম। আরেক পর্ব হালকা চা নাস্তার ব্যবস্থা হল। চা ও সমুসা তৈরি হচ্ছিল। আমি মিস্টার বিয়ারকে প্রশ্ন করলাম, আপনি কি কুরআন শরীফ দেখেছেন? তিনি বললেন, না, তোমার কাছে কি ইংরেজি অনুবাদ আছে?" আমি বললাম, হ্যাঁ। আপনি কি একবার দেখবেন? তিনি আপত্তি করলেন না। আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর তিন খণ্ডের অনুবাদ এনে প্রত্যেক দম্পতির হাতে একেক খণ্ড করে দিলাম। শেষ খণ্ডটি দিয়েছিলাম আমার মনিবের হাতে। কারণ ঐ খণ্ডের শেষে বিস্তারিত নির্ঘণ্ট রয়েছে।

আমার অতিথিরা কুরআন শরীফ পাতা উল্টিয়ে দেখছিলেন, আমি মিস্টার বিয়ারকে বললাম নির্ঘণ্ট দেখতে। সেখানে হযরত "মূসা (আ)-এর প্রসঙ্গগুলো দেখতে অনুরোধ করলাম। তিনি কয়েকটি বরাত দেখে উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, দীদাত, তোমাদের এই গ্রন্থটি দেখছি অদ্ভুত। আমি বললাম, কি অদ্ভুত স্যার? তিনি বললেন, এই গ্রন্থে দেখছি আমাদের পক্ষে কথা রয়েছে, অথচ তোমরা মুসলমানরা আমাদের বিপক্ষে?" আমি বললাম, এ কথা সত্য মিশরীয়রা আপনাদের জাতিকে নিদারুণ কষ্টের মধ্যে ফেলেছিল, তারা আপনাদের বিরুদ্ধে অসংখ্য অন্যায় সাধন করেছে, আপনাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করেছে, কিন্তু কন্যা সন্তানদের বাঁচিয়ে রেখেছিল।

وَإِذْ نَجَّيْنٰكُم مِّنْ

اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ
وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۭ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ○ وَ
اِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَ
اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○

স্মরণ কর, যখন আমি ফেরাউনী সম্প্রদায় হতে তোমাদেরকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম, যারা তোমাদের পুত্রগণকে জবেহ্ করে ও তোমাদের নারীগণকে জীবিত রেখে তোমাদেরকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিত; এবং এতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক মহাপরীক্ষা ছিল; যখন তোমাদের জন্য

সাগরকে দ্বিধা-বিভক্ত করেছিলাম এবং তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম ও ফেরাউনী সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করেছিলাম আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে। — কুরআন ২ : ৪৯-৫০

এখানে মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন তোমাদের জাতি বনি ইসরাইলদের বিরুদ্ধে মিশরীয় পৌত্তলিকরা অসংখ্য নিষ্ঠুরতা চালিয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি ভিন্ন। তোমরা আজ আমাদের স্বদেশ জোর করে দখল করেছ। আমার মনিব বললেন, দীদাত, এ কথা তুমি বল কি করে, ফিলিস্তিন আমাদের দেশ।" আমি বললাম, কেমন করে স্যার?" তিনি বললেন, প্রভু আমাদের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।" " কোথায় স্যার?' তিনি তখন পাঠ করলেন:

আর তুমি (আব্রাহাম) এই যে কনান (ফিলিস্তিন) দেশে প্রবাস করছ,-এর সমুদয় আমি তোমাকে ও তোমার ভাবী বংশকে চিরস্থায়ী অধিকারার্থে দেব, আর আমি তাদের ঈশ্বর হব। — বাইবেল আদি পুস্তক ১৭ : ৮

ইসরাইলী ঠাট্টা

আমি দুজন দক্ষিণ আফ্রিকান ইহুদীকে জানি তারা কালোদের প্রতি সাদা চামড়ার শাসকদের অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে তাদের পবিত্র দেশ ইসরাইলে চলে গিয়েছিল। তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় এপারথেড ল (বিদ্বেষী নীতি) বিদ্যমান ছিল। ইসরাইলে দুসপ্তাহ থেকেই তারা দেশে ফিরে আসে। ইসরাইলে ফিলিস্তিনদের অবস্থা দক্ষিণ আফ্রিকার কালোদের চেয়ে খারাপ। তারা দেখেছে ইসরাইলে ফিলিস্তিনীদের প্রতি যে অন্যায় ও নিষ্ঠুর আচরণ করা হয় সেই তুলনায় বর্ণবিদ্বেষ নীতির অধীনে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনেক কম অন্যায় আচরণ করা হয়।

ইসরাইলে সবচেয়ে বড় বিদ্রূপ সেই ইহুদীর শোক প্রকাশ। আপনি ইসরাইলের কোন ইহুদীকে প্রশ্ন করেন তোমাদেরকে ফিলিস্তিন কে দিল? (তারা সবাই আদি পুস্তক ১৭ : ৮ দ্বারা মস্তিষ্ক ধোলাইকৃত হয়ে আছে) নির্দ্বিধায় জবাব দেবে, "ঈশ্বর। "হ্যাঁ। মহান শক্তিশালী আল্লাহ্ ইহুদীদেরকে ফিলিস্তিন দিয়েছেন। কিন্তু তাদেরকে যদি প্রশ্ন করা যায় তুমি কি আল্লাহ্ বিশ্বাস কর? শতকরা ৭৫ জন উত্তরে বলবে, "না"। তবুও ফিলিস্তিনিদের ভূমি জবরদখল করার জন্য এইসব নাস্তিক ও অজ্ঞেয়বাদী মিথ্যুক মিথ্যামিথ্যি আল্লাহ্ নাম ব্যবহার করে।

তাদের হাস্যকর দাবি

.. এই যে কনান (ফিলিস্তিন) দেশে-আমি তোমাকে ও তোমার ভাবী বংশকে চিরস্থায়ী অধিকারার্থে দেব...আদি পুস্তক ১৭ : ৮

উপরের পঙ্ক্তিটি মুখস্থ করে রাখুন। খ্রিস্টান ও ইহুদীদের বিরুদ্ধে দারুণ কাজে লাগবে। এটাই ইহুদীদের পবিত্র দলিল। যার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বাণী বাস্তবায়িত হবে। অতীতের হাজার হাজার বছরে মুসলমানরা এই ভুল ধারণা দূর করার চেষ্টা করেনি। ইহুদী ও খ্রিস্টানদের বোঝাতে হবে নীতিগত ও ন্যায়সঙ্গতভাবে ফিলিস্তিনে তাদের কোন অধিকার নেই।

ভবিষ্যৎ বাণীর প্রকৃত পরীক্ষা

আমার মনিবের সঙ্গে যখন আলোচনা করছিলাম বাকি কয়জন ইহুদী মেহমান গভীর মনোযোগের সঙ্গে আমাদের কথোপকথন শুনছিলেন। আমি আমার মনিবকে বললাম, "আপনি তওরাত গ্রন্থ থেকে যে উদ্ধৃতি দিলেন সেটি হযরত ইবরাহীম ও তার বংশধরদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুতি।" তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, "আল্লাহ তওরাত গ্রন্থে বলেছেন কোন ভবিষ্যৎ বাণী তার নামে বলা হলে সেটি সত্যই তার বলা কিনা, সেটি পরীক্ষা করার পদ্ধতি রয়েছে।" তিনি বললেন :

আর তুমি যদি মনে মনে বল, সদাপ্রভু যে বাক্য বলেননি, তা আমরা কি প্রকারে জানব? [তবে শুন] কোন ভাববাদী সদাপ্রভুর নামের কথা বললে যদি সেই বাক্য পরে সিদ্ধ না হয় ও তার ফল উপস্থিত না হয়, তবে সেই বাক্য সদাপ্রভু বলেননি; ঐ ভাববাদী দুঃসাহসপূর্বক তা বলেছে, তুমি তা হতে উদ্বিগ্ন হয়ো না।

— দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ : ২১-২২

আমি প্রশ্ন করলাম, এটা কি সঠিক পরীক্ষা পদ্ধতি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, তাহলে ভবিষ্যৎ বাণীর ক্ষেত্রে এটা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

তওরাত গ্রন্থে বলা হয়েছে ইবরাহীম (আ)-এর মৃত্যুর পর–

আর তাঁর পুত্র ইসহাক ও ইশ্মায়েল... গুহাতে তাঁর কবর দিলেন। আব্রাহাম হেতের সন্তানদের কাছে সেই ক্ষেত্র ক্রয় করেছিলেন। সেই স্থানে আব্রাহাম ও তাঁর স্ত্রী সারার কবর দেওয়া হয়। — আদি পুস্তক ২৫ : ৯-১০

তদুপরি বাইবেলে আল্লাহ্র অপূর্ণ "ইসরাইলি প্রবীণদের নিকট ও পিতা ইবরাহীম (আ)-এর নিকট দেওয়া প্রতিশ্রুতি" সম্পর্কে বলা হয়েছে :

বিশ্বাসানুরূপে তাঁরা সবাই মরলেন; তাঁরা প্রতিজ্ঞাকলাপের ফল প্রাপ্ত হননি, কিন্তু দূর হতে তা দেখতে পেয়ে সাদর সম্ভাষণ করেছিলেন–ইব্রীয় ১১ : ১৩

পবিত্র দলিল অপেক্ষা এই বক্তব্য অধিকতর স্পষ্ট নয় কি?

আর বলেছিলেন, তুমি স্বদেশ হতে ও আপন জ্ঞাতি-কুটুম্বদের মধ্য হতে বের হও, এবং আমি যে দেশ তোমাকে দেখাই, সেই দেশে চল। তখন তিনি

কল্‌দীয়দের দেশ হতে বের হয়ে গিয়ে হারনে বসতি করলেন; আর তাঁর পিতার মৃত্যু হলে পর [ঈশ্বর] তাঁকে তথা হতে এই দেশে আনলেন, যে দেশে আপনারা এখন বাস করছেন, কিন্তু এই দেশের মধ্যে তাঁকে অধিকার দিলেন না, এক পাদ পরিমিত ভূমিও না; আর অঙ্গীকার করলেন, তিনি তাঁকে ও তাঁর পরে তাঁর বংশকে অধিকারার্থে তা দেবেন, যদিও তখন তাঁর সন্তান হয়নি। — প্রেরিতদের কার্য ৭ : ৩-৫

এখনও ভাল ইহুদী আছে

আমি আমার ইহুদী মেহমানদের প্রশ্ন করলাম যে এই সহজ বক্তব্য কি গসপেল সত্য? তারা আমাকে অবাক করে উত্তর দিল, হ্যাঁ। তখন পবিত্র কুরআনের কথা মনে পড়ল।

مِنۡهُمُ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ وَ اَكۡثَرُهُمُ الۡفٰسِقُوۡنَ۝

তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মু'মিন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।

— কুরআন ৩ : ১১০

মুসলমানদের উচিত ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌ ভক্ত ও আন্তরিক তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। আমার মনিব স্বীকার করলেন যে এ কথা সত্য বাইবেলে অপূর্ণ প্রতিশ্রুতির কথা আছে। তখন আমি বললাম, তাহলে আল্লাহ্‌ কখনই সেই প্রতিশ্রুতি দেবেন না, যা রক্ষিত হবে না। কুরআন শরীফেও এই বিষয়ে বলা হয়েছে। তিনি যে প্রতিশ্রুতি দেন তা রক্ষা করেন। বাইবেলেও আছে—দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ : ২২

وَعۡدَ اللّٰهِ حَقًّا

আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। — কুরআন ৪ : ১২২

হযরত মূসা (আ) দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ : ২২-এ যে সর্বশেষ ইচ্ছাপত্র ও কথা বলছেন তার দ্বারা আদি পুস্তকের ১৭ : ৮ যে ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে যার উপর ভিত্তি করে ফিরিস্তিন ইহুদীদের দেশ এই দলিল নাকচ হয়ে যায়–এটাই আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। আমার মনিবের মত সমঝদার ইহুদীর সঙ্গে আমাদের আলোচনা এখানেই শেষ হল। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম বিষয়টি নিয়ে আরও আলোচনা চালিয়ে

যেতে। তাই আমি বললাম, আল্লাহ্‌ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমি তোমাকে এবং তোমার পরে তোমার বংশধরকে কানানের সকল ভূমি চিরস্থায়ীভাবে দেব।

আব্রাহামের বংশধর

ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার প্রশ্ন সম্পর্কে আমরা একমত হলাম। তারপর আমি প্রশ্ন করলাম, আব্রাহামের বংশধর কারা? মিস্টার বিয়ার বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে উত্তর দিলেন, "আমরা ইহুদীরা"। আমি বললাম, এই বিষয়ে সন্দেহ নেই যে আপনারা ইবরাহীমের বংশধর। কিন্তু আপনারাই কি একমাত্র বংশধর? বাইবেলের প্রথম পুস্তকে কমপক্ষে বার জায়গায় বলা হয়েছে আরবদের পূর্বপুরুষ ইসমাইল (আ)। তিনি ইবরাহিমের পুত্র।

১) পরে হাগার অব্রামের নিমিত্তে পুত্র প্রসব করল; আর অব্রাহম হাগারের গর্ভজাত আপনার সেই পুত্রের নাম ইশ্মায়েল রাখলেন। — আদি পুস্তক ১৬ : ১৫

২) পরে আব্রাহাম আপন পুত্র ইশ্মায়েলকে...আদি পুস্তক ১৭ : ২৩

৩) আর তাঁর পুত্র ইশ্মায়েলের লিঙ্গাগ্রের ত্বক্‌ছেদন কালে তার বয়স তের বছর।

— আদি পুস্তক ১৭ : ২৫

৪) সেই দিনেই আব্রাহাম ও তাঁর পুত্র ইশ্মায়েল, উভয়ের ত্বক্‌ছেদ হল। –আদি পুস্তক ১৭ : ২৬

৫) আর তাঁর পুত্র ইসহাক ও ইশ্মায়েল মম্রির সম্মুখে হেতীয় সোহরের পুত্র ইফ্রোণের ক্ষেত্রস্থিত মক্‌পেলা গুহাতে তাকে কবর দিলেন। — আদি পুস্তক ২৫ : ৯

৬) আব্রাহামের পুত্র ইশ্মায়েলের বংশবৃত্তান্ত এই। সারার দাসী মিস্রীয়া হাগার...আদি পুস্তক ২৫ : ১২

ইসমাঈল (আ) যে ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র এ কথা স্বয়ং স্রষ্টাই যখন তৌরাতে স্বীকার করেছেন সেই ক্ষেত্রে আমরা অস্বীকার করব কি করে? প্রথম সন্তান যদি অনাদৃত স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান হয় তবুও তার অধিকার আল্লাহ বঞ্চিত করতে কাউকেই দেবেন না। (দ্বিতীয় বিবরণ ২১ : ১৬)

প্রতিশ্রুত ভূমিতে ইসমাঈলের সন্তান আরব জাতি ও ইসরাইলের সন্তান ইহুদী জাতি। কেন একত্রে সুখে শান্তিতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ নিয়ে বাস করতে পারে না?

জোর যার মুল্লুক তার

আমার মনিব তত্ত্বগতভাবে আমার যুক্তি মেনে নিতে রাজি। কিন্তু পূর্ব সংস্কার সহজে মরে না। তিনি পাল্টা বললেন, দীদাত, ফিলিস্তিন আমাদের। এই দেশে দাউদ

(আ) ও সোলায়মান (আ) সময় আমরা শাসন করেছি।" আমি বললাম, স্যার কোন এক অঞ্চল শক্তি প্রয়োগের দ্বারা শাসন করার অর্থ এই নয় যে তার বদৌলতে সেই দেশ আপনি পুনর্দখল করতে পারেন। তাহলে মুসলমানদের যদি শক্তি থাকত তাহলে স্পেন পুনরায় শাসন করার দাবি করতে পারত। মুসলমানরা প্রায় আটশ বছর স্পেন শাসন করেছে। ইহুদীরা ফিলিস্তীনীদের একটি অংশ যতদিন শাসন করেছে তার চেয়ে অনেক দীর্ঘকাল মুসলমানরা স্পেন শাসন করেছে। এখনও স্পেনে মুসলমানদের ফেলে আসা অসংখ্য দালান-কোঠা, অট্টালিকা, উদ্যান ও ফোয়ারা একমাত্র দর্শনীয় বস্তু। তার অর্থ কি এই যে, মুসলমানরা স্পেনকে পুনরায় উপনিবেশ বানানোর দাবি করবে? একই যুক্তিতে ওলন্দাজদের পূর্বপুরুষ তিনশ বছর ইন্দোনেশিয়ায় শাসন করেছিল। এজন্য তারাও কি ইন্দোনেশিয়া ফিরে পাবে? অথবা সিজার এক সময় রোম, ব্রিটেন শাসন করেছিল সেই কারণে এখন ইতালি কি ব্রিটেন দখল করার দাবি করতে পারে? মিস্টার বিয়ার বললেন, না। ওগুলো বিদেশীদের জয়। কিন্তু ফিলিস্তিন আমাদের মাতৃভূমি। যেখান থেকে আমাদেরকে অন্যায়ভাবে অধিকারচ্যুত করা হয়েছিল। আমরা কেবল সেটাই পুনরায় গ্রহণ করেছি।" আমি বললাম, ক্ষমা করবেন, আপনি একটি মারাত্মক ঐতিহাসিক ভুল করছেন। ইহুদীরাও যোশুয়ার নেতৃত্বে তিন হাজার বছর আগে ফিলিস্তিন আক্রমণ করেছিল এবং সেখানকার অধিবাসীদের পরাজিত করে সে দেশ অধিকার করেছিলেন। আপনারাও ত্রিশ দিনে ত্রিশটি রাজ্য জয় করেছিলেন (যিহোশূয়ের পুস্তক ১২ : ২৪)। ইসরাইলের বারগোত্রের মিলিত বাহিনীর এককেটি বিভক্ত গ্রাম সরকারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিল, তোমরা যাকে বলেছ রাজা, তাকে আক্রমণ করেছে। এমনিভাবে তারা আমোরাইট, ইডোমাইট, ফিলিস্তীনী, মোয়াবাইটস, হিট্টিটিজ ও অসংখ্য রাজ্য পরাভূত করেছে। সেটা করেছিল তোমাদের পূর্বপুরুষেরা।

আর তারা খড়গধারে নগরের স্ত্রী পুরুষ আবাল বৃদ্ধ এবং গো, মেষ ও গর্দভ সকলই নিঃশেষে বিনষ্ট করল। — যিহোশূয়ের পুস্তক ৬ : ২১

রডিনসনের ক্রন্দন

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল ধ্বংসযজ্ঞ ইসরাইলের জন্য একটি নিরবিচ্ছিন্ন যুদ্ধের অপছায়া। ফিলিস্তিনে ইহুদী সমস্যার কোন সমাধান আরবদের সহযোগিতা ব্যতীত সম্ভব নয়। নীতিগতভাবে এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে ফিলিস্তনে ইহুদীদের কোন দাবী থাকতে পারে না। রডিনসন একজন সম্ভ্রান্ত ইহুদী। তার "ইসরাইল ও আরব" নামক গ্রন্থে লিখেছেন :

"ইসরাইলীরা বলতে পারে না যে যেহেতু তাদের পূর্বপুরুষ দুই হাজার বছর আগে এখানে বসবাস করতেন। অতএব এই দেশ তাদের। তাদের এটা বোঝা উচিত, তারা অন্য এক জাতির উপর ঘোরতর অন্যায় করেছে, কারণ তাদেরকে তারা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। যাদের উপর এই অন্যায় করা হয়েছে তাদের মনে সে তিক্ততা যতদিন বিদ্যমান থাকবে ততদিন ইসরাইলের অধিকার সম্পূর্ণভাবে শূন্যগর্ভ থাকবে। তারা আশা করতে পারে একদিন আরবরা তাদেরকে স্বীকার করবে। যখন তারা স্বীকার করবে তখনই কেবল তাদের অধিকার বাস্তব হবে।"

আরবদেরও অধিকার আছে। অনেক দিক দিয়ে বলা যায় তাদের অধিকার অনেক বেশি। ইংল্যান্ডে যেমন ইংরেজদের অধিকার, ফ্রান্সে যেমন ফরাসিদের অধিকার তেমনি ফিলিস্তিন ভূমিতে আরবদের অধিকার। তাদের পক্ষ থেকে কোন প্রকার উস্কানি ব্যতিরেকে তাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। ইসরাইলরা সত্যই আরবদের প্রতি মারাত্মক অন্যায় করেছে।"

ইহুদী পুরোহিত যতই স্বীকার করুন, দোষ মেনে নেন অথবা যতই মনস্তাপ প্রকাশ করুন তবুও ইহুদীরা বলে ফিলিস্তিন আমাদের দখলে রয়েছে, আমাদের দখলেই থাকবে। আইনে নাকি বলে দখলে রাখাই দশ ভাগের নয় ভাগ আইনসঙ্গত হয়ে যায়। আমার মনিবের সেই রকমই মানসিকতা। তাই আমি প্রশ্ন করলাম আপনারা কিভাবে দখল করলেন? গায়ের জোরে? তাহলে আরবদেরও অধিকার আছে গায়ের জোরে পুনরায় তাদের পিতৃভূমি দখল করার।

দীদারের পদোন্নতি

স্বীকৃতি প্রদানের জন্য আমার নিয়োগকর্তা যথেষ্ট বিনয়ী। তিনি বললেন, "দীদাত, আমরা জানতাম না আরবদেরও তাদের পক্ষে যথেষ্ট জোরালো যুক্তি আছে।" তিনি বললেন, আমাদের যে আলোচনা হয়েছে সেটি যদি আমি লিখে দিতে পারি তাহলে তিনি সেটি টেম্পোল ডেভিড ম্যাগাজিনে ছাপিয়ে দেবেন। আমি বললাম, আমি তো লেখক নই। তিনি তখন বললেন, "দীদাত, তুমি যেভাবে কথাগুলি বলেছ সেইভাবেই লেখ। আমি সংশোধন করে দেব।" আমি জানতাম তিনি যা বলেছেন আন্তরিকতার সঙ্গেই বলেছেন, আজ ত্রিশ বছর পর আমার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে কোন মুসলমান আশঙ্কা করবে যে তার ইহুদী নিয়োগকর্তা অবশ্যই তাকে চাকুরিচ্যুত করবেন। কিন্তু তার পরিবর্তে এই কোম্পানিতে আমার প্রতি সম্মান বৃদ্ধি পেল। ছিলাম দীদাত, এখন হলাম মিস্টার দীদাত। এর পর থেকেই শুনতে পেতাম "গুড মর্নিং মিস্টার দীদাত। গুড আফটার

নুন মিস্টার দীদাত। গুড ইভনিং মিস্টার দীদাত।" আমার সঙ্গে মিস্টার বিয়ারের যে আলোচনা হয়েছিল সেই বিষয় তিনি অন্যান্য ইহুদী কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। বিশেষ করে কোম্পানির বস্ত্র বিভাগের ম্যানেজার মিস্টার বেইনাট-এর সঙ্গে আলাপ করেছিলেন।

ইসমাঈল (আ) সম্পর্কে কটূক্তি

কয়েকদিন পর মিস্টার বেইনাটের বিভাগের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি সে রকম মনিবের সঙ্গে আমার যে আলোচনা হয়েছে সেগুলো কি হয়েছে তা বললেন। তিনি বললেন, "তুমি আমাকে বুঝ দিতে পারবে না যেমনটি তুমি মিস্টার বিয়ারের ক্ষেত্রে করেছ। ইসমাইলের কথা বলেছ, আরবদের পূর্বপুরুষ এই ইসমাইল ছিল তো জারজ সন্তান।"

লোকটি সম্ভবত কিছু একটা গোলমাল পাকাতে চাচ্ছিল। কারণ এ কথা শোনার পর যে কোন মুসলমান ঐ লোকের গলা কেটে ফেলত। দোকান চলাকালে তর্ক বা আলোচনা কোনটাই সম্ভব নয়। আমি বেইনাটকে পরামর্শ দিলাম তার স্ত্রীসহ আমার বাড়িতে এসে নৈশভোজ করতে। সে সহজে রাজি হচ্ছিল না। সপ্তাহ খানেক অনুরোধ করার পর তাকে রাজি করানো গেল। অতঃপর একদিন মিস্টার ও মিসেস বেইনাট, মিস্টার ও মিসেস ফিল এবং মিস্টার টাউনসেন্ট নৈশভোজের জন্য আমার বাড়িতে এলেন। এবারও আগের মত খাওয়া-দাওয়ার পর মসজিদে নিয়ে গেলাম। সেখান থেকে ফিরে চা, সিঙ্গাড়া খাওয়ার ব্যবস্থা করলাম। তারপর হযরত ইসমাঈল (আ) সম্পর্কে বেইনাট ইতোপূর্বে যে অশ্লীল মন্তব্য করেছিল সেই কথার সূত্র ধরে আমি বললাম, মিস্টার বেইনাট, সেদিন তুমি আরব জাতির পূর্বপুরুষ হযরত ইসমাঈল (আ) সম্পর্কে এক মারাত্মক মিথ্যা অভিযোগ এনেছিলে। তুমি কি এখনো সেই অভিমত পোষণ কর, মিস্টার বেইনাট বলল, অবশ্যই। আমি ভেবেছিলাম খাওয়া দাওয়া আতিথেয়তার কারণে সে হয়ত একটু বিনম্রভাবে বলবে। কিন্তু না, তার কোন পরিবর্তন হয়নি।

ইহুদীরা তিন দফায় দোষী

আমি বেইনাটকে প্রশ্ন করলাম ইহুদী মতে কোনটা বেশি অগ্রাধিকার পেতে পারে, যেমন সন্তান কার মাধ্যমে জন্ম দেওয়া উত্তম, অর্থাৎ নিজের ভগ্নীর মাধ্যমে অথবা একজন ক্রীতদাসীর মাধ্যমে। সে বলল, "দাসীর মাধ্যমে।" আমি আবার প্রশ্ন করলাম, "সুপ্রজনন বিদ্যা অনুসারে একজন মানুষের পক্ষে কার মাধ্যমে সন্তান লাভ

অধিকতর বাঞ্ছনীয়—আপন ভগ্নীর মাধ্যমে অথবা আফ্রিকার কালো মহিলার মাধ্যমে অথবা দাসীর মাধ্যমে?" সে বিশেষ কিছু চিন্তা না করে বলল, "দাসীর মাধ্যমে"। অত:পর তৃতীয় দফায় আমি প্রশ্ন করলাম, যে সাধারণ বুদ্ধিতে কোন পদ্ধতি সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত—ভগ্নির মাধ্যমে অথবা ক্রীতদাসীর মাধ্যমে। সে পুনরায় বলল, এই দুইটির মধ্যে অবশ্যই ক্রীতদাসীর মাধ্যমেই বংশ রক্ষা অধিকতর বাঞ্ছনীয়। ইহুদী ভদ্রলোক বারবার যেভাবে একঘেয়ে একই উত্তর দিচ্ছিলেন অন্য যে কোন লোক তার সাথে একমত হয়ে একই উত্তর দিতেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। অতঃপর আমি মিস্টার বেইনাটের দৃষ্টি বাইবেলের আদিপুস্তকের দিকে আকৃষ্ট করলাম যেখানে বলা হয়েছে আব্রাহাম তার সুন্দরী স্ত্রী সারাকে নিয়ে জেরাবে গিয়েছিলেন। তখন সেখানকার রাজা তার স্ত্রীকে দেখে প্রশ্ন করেছিলেন যে মহিলা তার কি হয়? তিনি মিথ্যা কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, সম্পর্কে ভগ্নি। তখন রাজা তাকে হারেমে নিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। আব্রাহাম অনুগতভাবে তাকে হারেমের ভিতর পাঠিয়ে দেন। কি অজ্ঞাত কারণে রাজা সারার সঙ্গে কোন সম্পর্ক করতে পারেন নি। পরের দিন বিরক্তি সহকারে রাজা আব্রাহামকে প্রশ্ন করেছিলেন যে সারার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? এখন তিনি সত্য কথাই বললেন যে সারা তার স্ত্রী। মিথ্যা বলার জন্য রাজা আব্রাহামকে ভর্ৎসনা করলেন। তখন আব্রাহাম বললেন তিনি একেবারে মিথ্যে বলেননি।

আর সে আমার ভগিনী, এটাও সত্য বটে, কেননা, সে আমার পিতৃকন্যা, কিন্তু মাতৃকন্যা নহে, পরে সে আমার ভার্য্যা হল। — আদি পুস্তক ২০ : ১২

আব্রাহামের পুত্র যাকোব; যাকোবের পুত্র যিহুদা ও তাঁর ভ্রাতৃগণ। -মথি ১:২

অতএব মিস্টার বেইনাটকে আপনি যে মানদণ্ডের কথা বলেছেন সেই হিসাবে যদি ইসমাইল জারজ সন্তান হয়ে থাকে তাহলে তো ইসরাইল বড় জারজ হয়ে যান। আমার মনে নেই এ কথার পর মিস্টার বেইনাটের ঠিক কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। আমরা সব সময়ই বন্ধুভাবাপন্ন ছিলাম। তার সাথে কখনো কোন ঝগড়া বিবাদ হয়নি।

আশ্চর্যের বিষয় ইহুদীদের আব্রাহাম, সারা ও রাজাকে নিয়ে অনেক ছোটখাট কাহিনী আছে। এরপর ছয় অধ্যায়ে ইসরাইল সেই রাজার সাথে একই রকম ঘটনা ঘটেছিল।

পলেস্টীয়দের রাজা অবীমেলক বাতায়ন দিয়ে দৃষ্টিপাত করলেন, আর দেখ, ইস্‌হাক আপন স্ত্রী রিবিকার সাথে ক্রীড়া করছেন। তখন অবীমেলক ইসহাককে ডেকে বললেন, দেখুন, ঐ স্ত্রী অবশ্য আপনার ভার্যা; তবে আপনি ভগিনী বলে তাঁর পরিচয় কেন দিয়েছিলেন?— আদি পর্ব ২৬ : ৯-৯

অধ্যায় চার

ইহুদী সম্পর্কে আল্ কুরআন

তরুণ ইহুদীদের আহবান

১৯৬৭ সনে ইসরাইলের তথাকথিত ছয়দিনের যুদ্ধের পরের ঘটনা। তখন আমি দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ প্রদেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছি। কেপটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহুদী ছাত্ররা সম্ভবত বক্তৃতা সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন দেখেছিল। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল বাইবেলে হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কি বলে,' মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈসা (আ) স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী, যিশু কি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন? ইত্যাদি। তারা উৎসাহিত হয়ে আমার বক্তৃতার সংগঠকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের মাঝে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য দাওয়াত করেছিল। রনডেবশ নামে একটা হল তারা খ্রিস্টানদের কাছ থেকে কিনেছিল। সেই হলে বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছিল। সম্ভবত মরুভূমির যুদ্ধে পরাজয়ের পর মুসলমানরা কি চিন্তা করছে তা জানাই তাদের উদ্দেশ্য। "ও জেরুজালেম" গ্রন্থে ল্যারিকলিন্স ও ডোমেনিক লাপিয়ার আরব সৈন্য সম্পর্কে প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছেন।

"বেনগুরিয়ান নাছোড়বান্দা। সে কখনও শত্রুকে খাটো করে দেখতো না। পাঁচ আরব বাহিনী মিলিত হয়ে তাদেরকে যদি আক্রমণ করে এই ভয় তাদের জন্য সর্বাপেক্ষা ভীতিকর ছিল। কিন্তু বেনগুরিয়ান যদি তার শত্রুকে খাটো করে না দেখতেন তিনি তাদের বাহুল্য গর্ব বিশ্বাস না করতেন কথাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে নিজেদেরকে ত্যাগের চেয়ে বক্তৃতার দ্বারা প্রস্তুত করতে চেষ্টা করতেন, তাদের আক্রমণের হুমকি তার জাতির জন্য এক মারাত্মক ভীতি ছিল। কিন্তু এখানে তাদের জন্য এক বিরাট সুযোগও ছিল।" অস্ত্র সজ্জায় সজ্জিত পয়গম্বর নামে বেনগুরিয়ানের জীবনী গ্রন্থের লেখক মাইকেল জোহা প্রধান মন্ত্রীর মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন, সত্য কথা বলতে কি আমরা বিজয়ী হয়েছিল সেটি কি অলৌকিক ঘটনা নয় কারণ আরব সৈন্য বাহিনী একেবারেই অপদার্থ।

তরুণ ইহুদী ছেলেমেয়েদের সামনে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমি নিজেকে উচ্চাসন থেকে নামিয়ে আনলাম। বিষয় হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছিল ইহুদী সম্পর্কে আল-কুরআন'

তরুণ সভাপতি কর্তৃক উৎসাহব্যঞ্জক ও আন্তরিক পরিচিতি পর্বের পর আমি বক্তৃতার জন্য দাঁড়ালাম। প্রথমে কুরআন শরিফ থেকে ২০ : ২৫-২৮ আয়াত তিলাওয়াত করলাম। কোন অর্থ বললাম না।

সম্মোহনীয় প্রতিক্রিয়া

যখন আমি তিলাওয়াত করছিলাম মনে হল তরুণ চেহারাগুলিতে এক প্রকার বিস্ময় ও দিশেহারা ভাব। তারা আশা করছিল আমি ইংরেজিতে বলতে শুরু করব। কিন্তু এটি একটু ভিন্ন হল। আমি বললাম, "সম্মানিত সভাপতি ও আমার প্রিয় সন্তানগণ। এইমাত্র আমার মুখ থেকে যে কথাগুলি শুনলেন সেইগুলি মূসা (আ)-এর প্রার্থনা। যখন আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে নির্দেশ দিলেন ফেরাউনের কাছে গিয়ে বনি ইসরাইলগণকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য বলতে, তখন তিনি এই মোনাজাত করেছিলেন। আমি তোমাদেরকে কোন মন্ত্র পড়ে সম্মোহিত করতে চাইনি। মূসা (আ) বিচারের হাত থেকে শাস্তির ভয় পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন কারণ তিনি একজন মিসরীয়কে হত্যা করে ফেলেছিলেন। তিনি ছিলেন তোতলা। এখন আল্লাহ্ তা'আলা যখন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ও অত্যাচারী রাজা ফেরাউনের কাছে যেতে বললেন তখন তিনি ভয়ে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাইলেন।

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ٥ وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ٥ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ٥ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ٥

মূসা বলল, "হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও। এবং আমার কর্ম সহজ করে দাও। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। — কুরআন– ২০ : ২৫-২৮

"আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও। আমাকে সাহস দাও। আমাকে শক্তি দাও। আমরা বলি আমাদের বক্ষদেশ হচ্ছে জ্ঞান ও ভালবাসার পীঠস্থান। তিনি প্রথমে সেই

দান প্রার্থনা করছেন যা আধ্যাত্মিক অন্তরদৃষ্টিতে শীর্ষস্থানীয়। অতঃপর তিনি আরো তিনটি জিনিস প্রার্থনা করেছেন।

(১) তার কাছে আল্লাহ্র সাহায্য, যে কাজ তার নিকট অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

(২) তিনি চাচ্ছিলেন জড়তামুক্ত ভাষা। কারণ তার জিহ্বায় জড়তা ছিল।

(৩) তার ভাই হারুনের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি ও পরামর্শ। তাকে তিনি ভালবাসতেন ও বিশ্বাস করতেন। তাকে সঙ্গে না পেলে তিনি একাকী বোধ করতেন।

আমি তরুণ ইহুদীদের উদ্দেশ্য করে বললাম, "হযরত মূসা (আ) যে প্রার্থনা করেছিলেন আমার প্রয়োজন তার চেয়ে কিছু বেশি প্রার্থনা। আমার জিহ্বায় কোন জড়তা নেই। কিন্তু যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্রকৃত বাধা ভাষা ও মনস্তাত্ত্বিক বাধা। (১) ইংরেজি আমার মাতৃভাষা নয়। আমার মাতৃভাষা গুজরাটি। ভারতের বোম্বে শহরের ভাষা। (২) মনস্তাত্ত্বিকভাবে বক্তা ও শ্রোতা পরস্পর বিপরীতমুখী। আজকের আলোচ্য বিষয় অত্যন্ত আবেগজড়িত। মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করে আমরা শিখেছি যে আমরা একজনকে থামতে বলতে পারি, তাকাতে বলতে পারি, শুনতেও বলতে পারি, কিন্তু আমার বক্তব্য গ্রহণ করতে অথবা প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে বাধ্য করতে পারি না।

ইহুদী পয়গম্বরগণ সকলেই মুসলমানদের পয়গম্বর

শৈশবে আমি জানতাম না যে হযরত মূসা (আ) ইহুদীদের পয়গম্বর। আমার কাছে এবং সকল মুসলমান শিশুর কাছেই হযরত মূসা (আ) আমাদের পয়গম্বর তথা মুসলমানদের পয়গম্বর। আমাকে যদি প্রশ্ন করা হত হযরত মূসা (আ) কে ছিলেন? আমি বলতাম, আমাদের একজন পয়গম্বর। যদি প্রশ্ন করা হত দাউদ (আ) কে ছিলেন? আমি বলতাম, আমাদের পয়গম্বর। যদি প্রশ্ন করা হত হযরত সোলায়মান (আ) কে ছিলেন, তখনও বলতাম আমাদের পয়গম্বর। ডেভিডকে বলি দাউদ, মজেজকে বলি মূসা (আ), আইজেককে বলি ইসহাক, জেকবকে বলি ইয়াকুব। যখন তাদের অথবা এই সকল পয়গম্বরদের নাম উচ্চারণ করি তখন কোন মুসলমান তাদের নামের আগে হযরত যোগ না করে পারে না। হযরত অর্থাৎ সম্মানিত শ্রদ্ধেয়। আবার নামের শেষে বলতে হয় আলাইহিসসালাম। যদি কোন মৌলবী সাহেব বা ইমাম সাহেব এসব মহান পবিত্র ব্যক্তিদের নাম উচ্চারণ করার সময় সম্মানসূচক 'হযরত' যোগ না করে তাহলে তার চাকুরিই থাকবে না। বলা হবে সে অসভ্য, বর্বর, অশিক্ষিত।

মুসলিমগণ ইহুদীদের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী

আমরা আমাদের শিশুদের ইহুদী নামকরণ করি তখন কখনই চিন্তা করি না এটি কোন জাতের নাম। আমার জ্যৈষ্ঠ পুত্রের নাম ইবরাহীম অর্থাৎ আব্রাহাম। আমার কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ইউসুফ, তোমরা যাকে বল যোসেফ। আমার ভগ্নিপতির নাম মূসা, তোমরা যাকে বল মোশে অথব মোজেজ। আমরা কখনই মনে করি না এগুলো ইহুদী নাম। বরং মনে করি এগুলো আল্লাহ্র প্রিয় বান্দার নাম। বাইবেলের ভাষায় ঈশ্বর পুত্র।

ধর্মের দিক দিয়ে বল, পূর্বপুরুষের দিক দিয়ে বল অথবা সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বল, মুসলমানরা ইহুদীদের সবচেয়ে কাছের। ইহুদীরা বিশ্বাস করে মহান মহামহিম আল্লাহ্ এক সম্পূর্ণ এক। তাকে দেখা যায় না। কোন মানুষ তাকে দেখতে পায় না। এক্ষেত্রে ইহুদীরা যে বিশ্বাস করে মুসলমানরা সর্বান্তকরণে তাই বিশ্বাস করে। ইহুদীরা বলে আমরা শূকরের মাংস খাই না। মুসলমানরাও বলে আমরা শূকর খাই না। ইহুদীরা বলে তারা রক্ত খায় না। মুসলমানরাও তাই করে। ইহুদীরা খাৎনা করে। মুসলমানরাও খাৎনা করে। তোমরা আর কি চাও? সংক্ষেপে বলা যায় মুসলমানরা বিশ্বাস করে হযরত মূসা (আ) যে দীন ধর্ম প্রচার করে গেছেন তা ইসলামের বাইরের কিছু নয়। তিনি যে ধর্ম প্রচার করে গেছেন হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সেই ধর্মকে পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছেন এবং তাকে সার্বজনীন করেছেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস যদিও মুসলমানরা ইহুদীদের পয়গম্বরকে নিজেদের পয়গম্বর মনে করে তাদেরকে সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে কিন্তু ইহুদীরা মুসলমানদের মাত্র একজন পয়গম্বরকে স্বীকার করতে রাজি না। আমরা বাইবেলের সকল ইহুদীকে আমাদের নিজেদের বীর বলে মনে করি। তাদের আধুনিক বীর বেগিন স্বামীর শেরেন ও দায়াদের নিয়ে আমরা যুদ্ধে লিপ্ত। তাদের আধুনিককালের বীরেরা আমাদের দেশ ফিলিস্তিন জোর করে দখল করেছে।

চাচাতো ভাইয়ের ন্যায় আপন

Israel : Fight for survival গ্রন্থে লেখক রবার্ট জে ডনভান বলেছেন ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত Institute for the Middle East -এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ইহুদী ও আরব এই দুই জাতি সম্পর্কে দুই চাচাতো ভাইয়ের মত স্বাভাবিক ছিল। ততদিন ইহুদী-আরব সমস্যা বলে কিছু ছিল না। আশ্চর্যের বিষয় যেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজের চেয়ারম্যান প্রফেসর গোইটিয়েন তার

বই Jews and Arabs গ্রন্থে একই মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, "ইহুদী ও আরব জাতি নিকট-আত্মীয় তথা চাচাতো ভাই। কারণ তারা ইবরাহীমের পুত্র আইজাক ও ইসমাইল এই দুই ভাইয়ের বংশধর। এই বিশ্বাস যথেষ্ট প্রবল।"

কেপটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহুদী ছাত্ররা যখন ১৯৬৭ সালে যুদ্ধের পর বিজয় গর্বে উজ্জ্বল তখন আমি তাদেরকে বোঝাচ্ছিলাম, আরব ও ইহুদী রক্তের সম্পর্কে যেখানে এত কাছাকাছি তা এখন দুর্ভাগ্যজনকভাবে মারাত্মক তিক্ত শত্রুতায় পরিণত হয়েছে।

বন্দুক কোন উত্তর নয়

রক্তের সম্পর্কে চাচাতো ভাই তাদের মধ্যস্থতা করার জন্য কি বন্দুকের প্রয়োজন? শান্তির যুবরাজ মেরির পুত্র মহান ইহুদী যিশু যাকে কোটি কোটি অনুসারী অন্যায়ভাবে ঈশ্বর বলে পূজা করে তার কথা ও যুক্তিপূর্ণ উপদেশের প্রতি কর্ণপাত করা আবশ্যক। তিনি বলেছেন,

তোমরা খড়গ পুনরায় স্বস্থানে রাখ, কেননা যে সকল লোক খড়গ ধারণ করে, তারা খড়গ দ্বারা বিনষ্ট হবে। – মথি ২৬:৫২

হিটলার ও তার পদলেহী ভৃত্যবৃন্দ, মুসোলিনি ও তার ফ্যাসিস্ট দল ও জাপানের পার্ল হারবার খ্যাত নিকাদোকে স্মরণ করে দেখুন, তাদের কথা সকলেই শুনেছেন। তারা আজ কোথায়? নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। আর তোমরা ইহুদীরা তোমাদের নিজেদের ইতিহাস কি ভুলে গিয়েছ? সেই দাসত্ব, সেই গ্লানি, সেই গ্যাস চেম্বারের কথা ভুলে গিয়েছ? ইতিহাস বড় নিষ্ঠুর। সে তার নিষ্ঠুরতা নিয়ে বারবার ফিরে আসে। তোমাদের দস্যুতার বিজয়ে উৎফুল্ল হয়ো না। তোমরা উনিশশো আটচল্লিশ সালে আমার ভাইদেরকে ফেলে দিয়েছো। পুনরায় ১৯৫৬ সালে আবার ১৯৬৭ সালে তোমরা যাকে ছয়দিনের যুদ্ধ বল। আবার ১৯৮২ সালে লেবাননের চূড়ান্ত সমাধান আর এখন 'ইনতিফাদা"। অর্থাৎ অভ্যুত্থান সবই তোমরা পরাভূত করেছো। সম্ভবত সূচনা ক্ষুদ্র কিন্তু গুরুত্ব বিশাল।

একটি মাত্র বিজয় প্রয়োজন

১৯৬৭ সালে আমার সম্ভ্রান্ত ইহুদী ভাইপো ভগিনীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলাম "তোমরা আমার ভাইদেরকে ইতিমধ্যে তিনবার ধরাশায়ী করেছ। তোমরা তাদেরকে আরো ত্রিশবার পরাজিত করতে পার। কিন্তু তাতে ইহুদী সমস্যার সমাধান হবে না। আমার আরব ভাইয়েরা একশত বার যুদ্ধে পরাজিত হতে পারেন। তোমাদের

চতুষ্পার্শ্বে একশত কোটির অধিক মুসলমান তোমাদের ঘিরে আছে। তারা বারবার এগিয়ে আসতে পারে। তারা বহুবার পরাজিত হতে পারে কিন্তু তোমাদের পক্ষে একবারও পরাজয় সহ্য করা সম্ভব নয়। মাত্র একটি পরাজয় তোমাদেরকে নির্মূল করে দেবে। নির্মূল করে দেবে তোমাদের শেষ আহবান। তোমাদের শেষ সময়। কেন সেই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছ? ডেভিড বেনগুরিয়ান প্রশ্ন করেছেন, "আমাদের কি হবে? যদি আরবদের মধ্যে কোন এক মোস্তাফা কামালের আবির্ভাব হয়। মাইকেল বার জোহার তার সম্ভ্রান্ত পয়গম্বরের গ্রন্থে এই কথা লিখেছেন। পাঁচটি আরব বাহিনী ভীতির সৃষ্টি করে তাদেরকে ঘিরে রেখেছিল। তারা দুই হাজার বছর অস্ত্র পরিচালনা করেনি। এ সম্পর্কে ইহুদী ঐতিহাসিক লিখেছেন, "আরবদের মধ্যে অসংখ্য বাহিনী সৃষ্টি হবার ভয়ে ব্রিটিশরা তাদেরকে ইহুদী সৈন্যবাহিনী গঠন করার ন্যূনতম সুযোগ দেয়নি। তথাপি ইহুদীরা বিরাট সংখ্যায় মিত্র বাহিনীতে যোগদান করে যুদ্ধ করেছে। একমাত্র আধুনিক ইতিহাসে একটি যুদ্ধে একপক্ষে তারা যুদ্ধ করেছে। তাদের সংখ্যা দশ লক্ষ হয়েছিল।"

তারা তাদের তথাকথিত স্বাধীনতা চাচাতো ভাই আরবদেরকে জনবলে, অর্থবলে ও অস্ত্রবলে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আমরা তো কেবল সাজানো ছিলাম। ঘুমের মধ্যে আমাদেরকে ধরা হয়েছিল। ইহুদীদের ছিল অফুরন্ত সম্পদ, মিত্র বাহিনীতে যে ইহুদী সৈন্যরা কাজ করেছে সেইসব প্রাক্তন সৈন্য তাদের এক বিশাল সম্পদ। আমেরিকা, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, স্বাধীন ফরাসি বাহিনী ও আরো অনেক দেশে সৈন্য বাহিনীতে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে তারা এসেছে।

আরব পেট্রোডলার

অফুরন্ত অর্থ? কিসের অর্থ? হ্যাঁ আরব পেট্রোডলার। সে এক ধাপ্পা। মধ্যপ্রাচ্যে সৌদি আরব সবচেয়ে বেশি তেল উৎপাদন করে। ১৯৪৮ সালে তাদের তেল থেকে আয় ছিল বছরে ১৪ মিলিয়ন ডলার। তাদের সমস্ত তেল মাত্র প্রতি বেরেলে ৮ সেন্ট দরে শুষে নেওয়া হচ্ছিল, এই অর্থের সঙ্গে মিসেস গোল্ডামায়ার যে অর্থ প্রতি মাসে আমেরিকার ইহুদীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন তার তুলনায় আরবদের অর্থ কিছুই না। ১৯৪৮ সালে ১৪ মে ইসরাইলের স্বাধীনতা ঘোষণার পর তদানীন্তন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেনগুরিয়ন প্রস্তাব করেছিলেন অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্র যাবেন। গোল্ডা বললেন "যে মুহূর্তে বেনগুরিয়ানের দেশে থাকা অধিকতর প্রয়োজন তার পরিবর্তে সে মুহূর্তে তিনি একজন দুঃখী মহিলা হিসাবে আমেরিকা গিয়ে সাহায্য

প্রার্থনা করেন। তাহলে অনেক বেশি ফলপ্রসূ হবে। তিনি একমাসের মধ্যে ৫১ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করে দেশে ফিরে আসলেন।

বর্তমান কালে ঐ অর্থ খুব বিরাট পরিমাণের মনে নাও হতে পারে। কিন্তু তখনকার দিনে মধ্যপ্রাচ্যের সর্ববৃহৎ তৈল উৎপাদনকারী সৌদি আরবের সমগ্র তেলের আয়ের তিন গুণ ছিল। ১৯৪৮ সালে হতভাগা আরব জাতি অস্ত্রে, জনশক্তিতে এবং অর্থশক্তিতে অনেক বেশি পিছিয়েছিল।

১৯৫৬ সাল পরবর্তী পরাজয়

"থ্রি মাসকেটিয়ার্স" আমেরিকার ফিল্ম ঐতিহ্যের মত সত্য। ব্রিটিশ, ফ্রান্স ও ইসরাইল সম্মিলিতভাবে তাদের অপারেশন থ্রি মাসকেটিয়ার্স পরিচালনা করে ১৯৫৬ সালে আমাদের ইহুদী ভাইয়েরা আরব দেশের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ মিসরকে পরাভূত করল।

সাকতাই তেভিত রচিত মোসে দায়ানের জীবনী গ্রন্থে লিখেছেন যে ১৯৫৬ সালের সিনাই অভিযানের পরিকল্পনা সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসাবে তিনিই তৈরি করেছিলেন, আর বাস্তবায়নও তিনি করেছিলেন। ঐ বইয়ের ২৬৭ পৃষ্ঠায় দায়ান ইসরাইল বাহিনীর অভিযানের পরিকল্পিত মানচিত্র প্রকাশ করেছেন।

এই অভিযানের সফলতায় তিনি এতখানি গর্বিত যে বলেছেন প্রয়োজন হলে পুনরায় তিনি সেই পরিকল্পনা অনুসারেই আরব দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবেন। সত্য কথা বলতে কি ১৯৬৭ সালে পাঠ্যপুস্তকের ছকমত তিনি মিসরীয় বাহিনীকে একইভাবে পর্যুদস্ত পরাভূত করেছিলেন। দায়ান নিশ্চিত জানতেন কোন আরব তার জীবনী গ্রন্থ পাঠ করবে না। এমন কি ইহুদীর লেখা ইহুদী সম্পর্কিত লেখা কোন বই তারা পড়বে না। অথচ এই বই পড়লে তারা জানতে পারত তাদের চাচাতো ভাইয়েরা তাদের সর্বনাশ করার জন্য কি পরিকল্পনা করেছে।

মুসলমানদের শিক্ষা হবে না

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কুরআনের প্রথম যে ওহী অবতীর্ণ করেছেন তা হচ্ছে: "ইকরা"। অর্থ 'পাঠ কর'। তার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে আদেশ করেছেন পড়তে। কিন্তু মুসলমানরা অনুশীলন করছে "লা ইকরা" অর্থাৎ আমরা পাঠ করব না। ইহুদীরা তাদের নিজেদের সাহিত্যে যে সকল গোপন তথ্য প্রকাশ করে দিচ্ছে সেগুলের খবর কি আমরা রাখি? তার অর্থ আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি না।

ইহুদী কর্তৃক বারংবার আমরা পরাজিত হচ্ছি তার কারণ কি? এর জবাব অতি সহজ। তাদের উন্নততর পরিকল্পনা ও অস্ত্র। সংক্ষেপে বলা যায়– প্রকৌশল। প্রকৌশল কোন নিষিদ্ধ বিষয় নয়। ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধের পর রনডেবশ সভায় ইহুদী ছেলেমেয়েদের সামনে উপরের কথাগুলি বলেছিলাম।

সাত বছর পর মার্টিন যুকার তেলআবিব থেকে আমার কথারই প্রায় হুবহু পুনারাবৃত্তি করেছিলেন।

"ইসরাইলের জানা মতে প্রতিটি আরব সৈন্য সাধারণত কৃষক পরিবার থেকে আগত। তারা স্কুলে বড় জোর ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে। অন্যদিকে ইসরাইলী যুবকদের বাধ্যতামূলকভাবে সৈনাবাহিনীতে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কাজ করতে হয়। তারা কমপক্ষে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করে। কিছু সংখ্যক দ্বাদশ শ্রেণী ও প্রকৌশল বিষয় পড়াশুনা সমাপ্ত করেছে। ইসরাইলীরা তাদের শত্রুদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে উঁচু ধারণা রাখে। অর্থাৎ গড়পরতা আরব সৈন্যদের স্বাস্থ্য ইসরাইলীদের চেয়ে ভাল।

সেদিন আমি ইহুদী ছাত্রদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম যে ইহুদী আরব সংঘর্ষের সমাধান অস্ত্র দ্বারা সম্ভব নয়। একদিন হয়তো আরবরা ইহুদীদের অস্ত্রের চাইতে উন্নতর অস্ত্র লাভ করবে। একদিন ইসরাইলীদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, আর্থিক সহায়তাদানকারী, রক্ষক ও উৎসাহদাতা মহাপরাক্রমশালী আমেরিকা হয়তো ভিয়েতনামীদের যেমন ছেড়ে এসেছিল তেমনি ইহুদীদেরকেও ছেড়ে আসতে পারে। সকলের অনুধাবন করা উচিত বৃহৎ শক্তিবর্গের বন্ধুত্ব কখনই চিরস্থায়ী নয়। তারা যেমন নিজের নেতৃবৃন্দের প্রতি অস্থিরচিত্ত তেমনি অন্যান্য দেশের প্রতিও অস্থিরচিত্ত। যখন সময় আসবে তখন তারা তাদের গতকালের নেতাকে ফাঁসিতে লটকাবে অথবা পুড়িয়ে মারবে। এমতাবস্থায় তেমন পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয়। এখনই তোমাদের আরব ভাইদের সঙ্গে সমঝোতা করা উচিত।

তোমাদের ইতিহাসে ভাইয়ে ভাইয়ে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়ে বহু ঘটনা রয়েছে। ইহুদী বাইবেলে এইরূপ সংঘর্ষ অসংখ্য। আদি পুস্তকে হাবিল ও কাবিল, ইসহাক ও ইসমাইল, ইয়াকুব ও যোসাও, সোলায়মান ও আদোনিজা যেমন সংঘর্ষ করেছিল, বর্তমানে আরব ও ইসরাইল সংঘর্ষ তেমনই।

লেবেলের পার্থক্য

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহুদী ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করলাম, ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ কোথায়? এই বিভেদ জাতিগত বিভেদ নয়, সাংস্কৃতিক বিভেদও নয়, ধর্মীয় পার্থক্যও নয়। কারণ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোন মৌলিক বিভেদ

নেই। পার্থক্য শুধু লেবেলের মধ্যে। ইসরাইলরা বলে তারা ইহুদী, ধর্মীয়ভাবে ইহুদী ধর্মে বিশ্বাস। অপরপক্ষে আরবরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে অভিহিত করে, কারণ তারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী।

আল্লাহ্‌র কসম! ইহুদী-আরব সংঘাতের সমাধান অতি সহজ। কেবল তাদের লেবেল পরিবর্তন করলেই তাদের মধ্যে আর বিভেদ থাকে না। তোমরা ইহুদীরা আরব বিশ্বের রাজনীতির ক্ষেত্রে এক প্রচণ্ড জ্বর তৈরি করেছ। তোমরা প্রভাবক হিসাবে কাজ করেছ। তোমরা যদি না আসতে আরব বিশ্ব হয়তো হাজার বছর নিদ্রিত থাকতো। ইহুদী ঐতিহাসিক বলেন, "আজ আরব বিশ্ব তার নিদ্রা হতে জেগে উঠেছে। আরবরা যদি নিজেদেরকে পঙ্ক থেকে উদ্ধার কাজে ইহুদীদেরকে ব্যবহার করে তাহলে তাদেরকে দোষ দেওয়া যাবে না। যেমন অন্যান্য জাতি অনুরূপ ক্ষমতার রাজনীতি করেছিল। ইহুদী নেতাদের নিজেদের জাতীয় স্বার্থে আরব নেতাদেরকে বোঝানো প্রয়োজন যে, আরব বিশ্ব তাদের ন্যায়সঙ্গত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে যদি আরব-ইহুদী বিরোধ দূর হয়ে যায়। কারণ এই বিরোধ কোন গভীরভাবে প্রোথিত জাতিগত বা ধর্মীয় বিরোধ নয় বরং এটি রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ভূত। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইহুদী ও আরব কোন প্রকার ঝগড়া-বিবাদ ব্যতিরেকে পরস্পরের হিতার্থে বহুকাল একত্রে বসবাস করেছে।" (Max I.Dimont in Jews, God and History, Page 205)

এক ধর্ম

অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে সেমেটিক দুই ভাই আরব ও ইহুদী পরস্পরের প্রতি মারাত্মক মারমুখী হয়ে আছে। অথচ জাতিগত ও ধর্মীয়ভাবে তারা পরস্পরের অনেক নিকটবর্তী। একমাত্র ইসলাম তাদের মধ্যে সৌহার্দের সেতু নির্মাণ করতে পারে। আনতে পারে শান্তি ও সমৃদ্ধি। আশ্চর্যের বিষয় আরবি 'সালাম' ও হিব্রু 'শালোম' উভয়ের অর্থ শান্তি। এই শান্তির জন্য সবাই লালায়িত। ইসলাম ও ইহুদী ধর্মের মধ্যে কোন অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর নেই। ইহুদী ধর্মকে আন্তর্জাতিক করেই হয়েছে ইসলাম। জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান এ প্রসঙ্গে বলেন, সম্প্রতি ফরাসি আলজেরিও একটি প্রকাশনায় বলা হয়েছে যে ইসলাম ধর্ম প্রকৃতপক্ষে ইহুদী ধর্মের আন্তর্জাতিক প্রবণতা, এই কথার মধ্যে কিছুটা সত্য রয়েছে। আরবদের যতটুকু প্রয়োজন ইহুদীদের, ঠিক ততটুকু ইহুদীদের প্রয়োজন আরবদের। আরব বিশ্ব দেহে ইসরাইল একটি নতুন হৃৎপিণ্ড। কিন্তু দেহ হৃৎপিণ্ডকে চিনতে পারছে না। হৃৎপিণ্ড যে বস্তু দিয়ে গঠিত দেহ সেই বস্তু দিয়ে গঠিত নয়।

হৃৎপিণ্ড দেহে সংযোজন করার পর আরব দেহ সেটি গ্রহণ করতে চাচ্ছে না। এজন্য একজন ক্ষমতাবান ইহুদী বা আরব ডাক্তার বার্নার্ড প্রয়োজন। যিনি এই প্রত্যাখ্যান প্রতিহত করার জন্য ঔষধ দেবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় কেপটাউন শহরে সর্বপ্রথম অস্ত্র প্রচারের মাধ্যমে ডাক্তার বার্নার্ড মানবদেহে হৃৎপিণ্ড সংযোজন করেছিলেন তখন তাকে দেহের প্রত্যাখ্যান সমস্যা সমাধান করতে হয়েছিল। দেহ জানে না এই নতুন হৃৎপিণ্ড গ্রহণ না করলে সে নিজেও বাঁচবে না। সেইজন্য দেহকে দীর্ঘকাল যাবত যতক্ষণ না সে নতুন হৃৎপিণ্ড গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে ততক্ষণ ঔষধ গ্রহণের মাধ্যমে বেঁচে থাকতে হয়; অর্থাৎ দেহকে বাচিয়ে রাখার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করতে হয়। হৃৎপিণ্ডের সেলুলার গঠনপ্রকৃতি দেহের গঠন প্রকৃতির সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত। তেমনি, ইহুদী/ইহুদী ইহুদী বনাম মুসলমান/মুসলমান/মুসলমান। লেবেল বদলে ফেলুন ইনশাল্লাহ্ আল্লাহ্ চাহে তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

পবিত্র কুরআনে ইহুদীদের প্রতি সুমার্জিত আচরণ

মহান আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেছেন শুনুন : তিনি সর্বশেষ ও চূড়ান্ত প্রত্যাদেশের মাধ্যমে মানবতার প্রতি ইহুদীদের কিভাবে আচরণ করেছেন ;

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ
اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ۝

হে বনী ইস্‌রাঈল! আমার সেই অনুগ্রহকে তোমরা স্মরণ কর যার দ্বারা আমি তোমাদেকে অনুগৃহীত করেছি এবং আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর। — কুরআন ২ : ৪০

ইহুদী ও মুসলমানদের হাজার বছর যাবত যে মধুর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তার ব্যাখ্যা উপরের আয়াতে পাওয়া যায়। কত সম্মানের সঙ্গে তিনি তোমাদেরকে সম্বোধন করছেন। আর বাইবেলে ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে :

১। ওহে ইহুদী ভেগাবন্ড। ... তোমরা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধাচারী। বাইবেল দ্বিতীয় বিবরণ ৯ : ৭

২। তোমরা শক্তগ্রীব জাতি। — যাত্রা বিবরণ ৩৩ : ৫

৩। এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোকেরা। — মথি ১৬ : ৪

৪। হে সর্পের বংশেরা। — লুক ৩ : ৭

এসব কথা তোমাদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থে তোমাদের পয়গম্বররাই বলেছেন। কোন সেমেটিক বিরোধী কেউ বলেননি। তার বিপরীতে পবিত্র কুরআনে আমরা কি দেখি? সেখানে তোমাদেরকে ভালবাসার সঙ্গে সম্বোধন করা হচ্ছে। তোমরা এই সম্বোধনকেই আশা কর। "হে ইসরাইলের সন্তানবৃন্দ!" আবার অন্যত্র দেখুন–

يٰبَنِيٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

হে বনী ইস্রাঈল! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যার দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছিলাম এবং বিশ্বে সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। **— কুরআন– ২ : ৪৭**

উপরোক্ত আয়াতে এবং অন্যান্য আয়াতে একইভাবে ইহুদীদেরকে তাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে সম্বোধন করা হয়েছে, আপন স্বজন হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। তোমরা ইহুদীরা দাবি কর যে তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রাপ্ত জাতি। তোমরা কি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা ভুলে গিয়েছ, তোমরা দাবি কর আল্লাহর সঙ্গে তোমাদের বিশেষ চুক্তি হয়েছিল। তিনি তোমাদেরকে দ্বিতীয় বারের মত ভূমি বন্ধন থেকে মুক্ত করে নিয়ে এসেছেন। তিনি তার চুক্তি পালন করেছেন। তোমরা তোমাদের চুক্তি কতখানি পালন করছ?

লেবেল পরিবর্তন কর

হে অনুগ্রহ প্রাপ্ত জনগণ! তোমরা পূর্বেও প্রত্যাদেশ পেয়েছিলে। সেই প্রত্যাদেশ সমর্থন করে পুনরায় প্রত্যাদেশ (পবিত্র কুরআন) প্রত্যাদেশ এসেছে। এর আহবান প্রথমেই তোমাদের প্রতি, তোমরা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলে। এখন তোমরা সেই আহবান প্রথমে প্রত্যাখ্যান করতে যাচ্ছ? কিন্তু কেন?

সংক্ষেপে, তোমরা শান্তির পথ গ্রহণ কর, ইসলাম (শলোম) গ্রহণ কর। অর্থাৎ তোমাদের লেবেল ইহুদী বদলিয়ে কর মুসলমান। ফিরে যাও, প্রত্যাবর্তন কর, মহান আল্লাহ্ যে জন্য তোমাদেরকে নির্বাচিত করেছিলেন সেই মূল ভূমিকা পালন করতে ফিরে আস।

এখন যদি তোমরা আমার রবে অবধান কর ও আমার নিয়ম পালন কর।

— যাত্রাপুস্তক ১৯ : ৫

আমার বক্তৃতার শেষ পর্বে প্রশ্নউত্তরের সময় আমার এক ভাইপো (কেপটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ইহুদী ছাত্র) পাল্টা প্রশ্ন করল, "আপনি কেন আপনার লেবেল বদলাচ্ছেন না?" তার অর্থ ইহুদীরা মুসলমান না হয়ে মুসলমানরা কেন ইহুদী হবে না। এই ধরনের প্রশ্ন আমার ভাল লাগে। এই জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট বক্তব্য রাখতে ভালবাসি। তাদের মধ্যে একটা প্রাণ আছে। তারা তাদের পিতামাতার ন্যায় নতুন চিন্তা ভাবনা গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত নয়। আমি বললাম, লেবেল পরিবর্তন করতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমি যদি পরিবর্তন করি অর্থাৎ ইহুদী হই তাহলে তোমরাই আমার পথে বাধার সৃষ্টি করবে। প্রথমত তোমরা চাও না অন্য কেউ ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করুক। তোমরা তোমাদের ধর্মকে জাতিগত ধর্মে পরিণত করেছ। ইহুদী হতে হলে ইহুদীর ঘরে জন্মগ্রহণ করতে হয়। এ প্রসঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। একজন শ্বেত বা সাদা চামড়ার খ্রিস্টান ইহুদীর মেয়ের প্রেমে পড়েছিল। সেজন্য সে খ্রিস্ট ধর্ম ত্যাগও করেছিল। ২৩ বছর বয়সে খাৎনা করার কষ্টও সহ্য করেছিল। তবুও তাকে তৃতীয় শ্রেণীর ইহুদী হয়ে থাকতে হয়েছিল।

ইহুদীদের নাম পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন কেন

খ্রিস্টান অথবা ইহুদীদের মত মুসলমানদের খাৎনা কোন সমস্যা নয়। কারণ মুসলমানরাও খাৎনা করে। আমার মনিব মিস্টার বিয়ারের কথামত আমরা ইহুদীদের চাইতেও অধিকতর ইহুদী। কিন্তু বিতর্কের কারণে আমি যদি বলি, "হ্যাঁ, আমি আমার নামপত্র পরিবর্তন করে মুসলমান থেকে ইহুদী হতে চাই, তাহলে তোমাদের কি লাভ হবে?" আমি তরুণ ইহুদী শ্রোতৃবৃন্দকে প্রশ্ন করলাম, "পৃথিবীতে ইহুদীর সংখ্যা কত?" কেউ কেউ চিৎকার করে বলল বার মিলিয়ন। ১৯৬৭ সালে তেমনি ছিল। আজ তারা বলে তাদের সংখ্যা নাকি ১৫ মিলিয়ন। তখন আমি বললাম, আমার নামপত্র পরিবর্তনের ফলে তোমাদের সংখ্যা হবে বার মিলিয়ন এক। কিন্তু তুমি যদি নামপত্র পরিবর্তন কর তাহলে আমাদের সংখ্যা হবে সাতশো মিলিয়ন এক। (বর্তমানে মুসলমান জনসংখ্যা প্রায় এক হাজার মিলিয়ন)। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, তোমরা কি এর পার্থক্য বুঝতে পার? যে নির্বোধ সেই নামপত্র পরিবর্তন

করতে অস্বীকার করবে। তোমরা তো ব্যবসায়ী জাত। অন্য সকলের চেয়ে তোমাদের বেশি বোঝা উচিত। কারণ ব্যবসায়ী হিসাবে তোমাদের কোন পণ্যের বার মিলিয়ন লোকের বাজার রয়েছে। কিন্তু শুধু নামপত্র বা লেবেল পরিবর্তন করলে তুমি সাতশো মিলিয়ন লোকের বাজার পাচ্ছ। গুয়ারতুমী করে লেবেল পরিবর্তন করতে অস্বীকার করলে তোমার জন্য দারুণ বোকামী হবে। বিশেষ করে মুসলিম নামপত্রের কোন কপিরাইট নেই।

সবশেষে একটি প্রকৃত সমস্যা রয়েছে। ধর্মীয়ভাবে ইসলামের বৃত্ত অনেক প্রশস্ত। ইসলাম ইহুদীদের অপেক্ষা সমগ্র মানবতাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। একটি বৃহৎ বৃত্ত ক্ষুদ্র বৃত্তকে অঙ্গীভূত করতে পারে কিন্তু ক্ষুদ্র বৃত্ত বৃহৎকে পারে না।

কে এই কাজ করবে

উপরোক্ত সভার শেষে এক ইহুদী ছাত্র প্রশ্ন করল, কে এই কাজ করবে? আমি বললাম, তোমরা করবে। তোমাদের বুকের মাঝে তোমরা যে অন্যায়, অপরাধ ও পাপের বোঝা সঞ্চয় করেছ সেই বোঝা ঝেড়ে ফেলে দাও। আমাদের প্রতি যে অন্যায় করেছ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। ফিলিস্তিনের জনসাধারণকে বল যে তাদের প্রতি তোমরা ঘোরতর অবিচার করেছ। তাদের বল, ভাই আমাদের ক্ষমা করে দাও। আমরা কোথায় যাব। আল্লাহ্‌র কসম, এই লোকেরা তোমাদের ক্ষমা করে দেবে। তারা অতি সহজ সরল মানুষ। তাদের হৃদয় অনেক প্রশস্ত। তাদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে সুযোগ নিও না।

"আরব ইসরাইল সংঘর্ষ না সমঝোতা" বিষয়ের উপর যার সঙ্গে আমি বিতর্ক করেছিলাম তিনি স্বীকার করেছেন যে আরব ও ইহুদী যদি একটি সম্মানজনক সমঝোতায় পৌছাতে পারত তাহলে হয়তো দ্বিতীয় স্বর্ণযুগের উদয় হতো। মুসলিম স্পেনে ইহুদীরা উন্নতির শীর্ষে পৌছেছিল সেটাই ছিল তাদের প্রথম স্বর্ণযুগ।

"ঊনবিংশ শতকের ইহুদী ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, মধ্যযুগে ইউরোপীয় দেশগুলোতে ইহুদীরা অনেক ক্ষেত্রেই নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে খ্রিস্টান ইউরোপের ইহুদী অধিবাসীদের থেকে স্পেনে মুসলমানদের অধীনে ইহুদীরা অনেক ভাল ছিল। সেখানে তারা আইনগতভাবেই উন্নত নাগরিক অধিকার ভোগ করত। মুসলিম স্পেনে ইহুদী যুগকে স্বর্ণযুগ আখ্যায়িত করা হয়েছে ?"

যে ছেলেটি আমাকে প্রশ্ন করেছিল "কে এই কাজ করবে?" তার সঙ্গে প্রাণবন্ত আলোচনার পর সে বলল, "ছয়দিন যুদ্ধের পর পড়াশুনা সমাপ্ত করে সবেমাত্র ইসরাইল থেকে এসেছি। আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, ইসরাইলে ফিরে গিয়ে আপনার এই বাণী সেখানে পৌছে দেব।

অধ্যায় পাঁচ

ইহুদীদের নতুন প্রজন্ম

مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মু'মিন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।

— কুরআন ৩ : ১১০

কুরআনের কথা সত্য

ইহুদীদের মধ্যে অনেক বিশ্বাসী ন্যায়পরায়ণ ও ভাল মানুষ আছে, এই সংবাদ আমাদের নিকট প্রায়ই এসে পৌছায়। প্রমাণিত হয় উপরের আয়াতের কথা সত্য।

(১) ডেইলি টেলিগ্রাফ, লন্ডন, তারিখ ৪/৮/৭১

ইসরাইলের ইতিহাসে সর্বপ্রথম একজন আঠারো বছরের তরুণ এই বলে তার কলআপ কার্ড ফেরত দিয়েছে– "অত্যাচার করার জন্য আমরা জন্মে স্বাধীন হইনি এবং অত্যাচার করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ কোন মহৎ মৃত্যু নয়।"

জেনারেল দায়ান মিসেস ও গোল্ডামায়ারকে লিখিত পত্রের তারা বলেছে "আমাদের পিতা পিতামহ অথবা পূর্বপুরুষের প্রতি যে নির্যাতন চালিত হয়েছিল সেই একই নির্যাতন অন্য জাতির উপর করতে আমরা প্রস্তুত নই।"

(২) সানডে, ট্রিবিউন, ডারবান, তাং ২৮/১০/৭৩

বন্দীদেরকে নিরাপদ স্থানে বাসে করে নিয়ে যাওয়ার সময় একজন ইসরাইলি সৈন্য বলছে, "আমার মনে হয় এই এই লোকগুলো বেশ সুন্দর। তারাও আমাদের মত কিতাবি জাতি। যুদ্ধ তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তেমনি আমাদের উপরও চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, জানি না এই যুদ্ধ শেষ হবে।"

(৩) হেনরি কাতজিউ- দক্ষিণ আফ্রিকার একজন সাংবাদিক, বর্তমানে ইসরাইলের অধিবাসী। তিনি জোহানসবার্গ শহরের "দি স্টার" পত্রিকায় ৫-১২-৭৩ তারিখে লিখেছেন : ইসরাইল কি চিরকাল যুদ্ধের মধ্যে বসবাস করবে? ইসরাইলের

জন্মকাল থেকেই আজ পঁচিশ বছর যাবত ইহুদী-আরব সংঘর্ষ অব্যাহত রয়েছে। এই পঁচিশ বছরের ইতিহাস প্রমাণ করে রাজনৈতিকভাবে ইসরাইলের সমস্যার সমাধান হবে না। তাদেরকে অবশ্যই বিকল্প হিসাবে আধ্যাত্মিক শক্তির আশ্রয় নিতে হবে। কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক বিপ্লব তাদেরকে অফুরন্ত উন্নয়নের সম্ভাবনার দিকে নিয়ে যাবে। ....”

আমার মনে হয় আমি ইতোপূর্বে যে আধ্যাত্মিক পরিবর্তন অথবা নামপত্র পরিবর্তনের কথা বলেছিলাম তিনি সেই কথাই বলেছেন। তবে আমার মত স্পষ্ট করে বলতে ভয় পেয়েছেন। আমি বলেছিলাম লেবেল পরিবর্তন করতে। তিনি বলেছেন আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের কথা। মনে হয় তিনি আমার শ্রোতাদের একজন। যে বলেছিল আপনার বাণী আমি ইসরাইলে পৌঁছে দেব।

(৪) ১৯৮২ সালে সাবরা ও শাতিলায় গণহত্যার প্রতিবাদে তেলআবিবে তিন লক্ষ ইহুদী সমবেত হয়ে প্রতিবাদমুখর শ্লোগান দিচ্ছিল “বেগিন ওসারন পদত্যাগ কর। তোমাদের হাতে রক্ত লেগে আছে।” মুসলমানরা কি অস্বীকার করতে পারে কিছু সংখ্যক ইহুদীর কিছুটা মহানুভবতা রয়েছে।

(৫) জোহানসবার্গের সানডে স্টার নববর্ষ সংখ্যায় প্রতিবেদন। ইসরাইলি সৈন্য বাহিনীর সংরক্ষিত দলের একজন সদস্য হিসাবে ডানি বেনতাল লিখেছেন গাজা পরিদর্শনকালে তিনি ভেবেছেন ফিলিস্তীনীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমরা প্রকৃতই হেরে গিয়েছিল। তিনি সিমিটি বিরোধী অথবা আত্মবিরোধী ইহুদী নন। বরং পবিত্র কুরআনের বর্ণনা মত একজন মুমিন। তিনি লিখেছেন।

(ক) “ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই বিষয়ে কোন ভুল নেই। জা বালিয়া ও শাতীতে এই রাষ্ট্র রয়েছে। এই রাষ্ট্র রয়েছে মসজিদে ও মানুষের মনে।

পিএলও পতাকা যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তাতে আমাদের ধারণা আমরা এই যুদ্ধে হেরে গিয়েছি। এরেজ ইসরাইলের অর্থাৎ ভূমির এই বর্গমাইলে যে যুদ্ধ সেই যুদ্ধে আমরা পরাজিত। প্রথমত ইনতিফাদা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। কেউ কেউ আমাদের মধ্যে এ কথা অনুধাবন করতে পেরে রীতিমত শঙ্কিত। কিন্তু অনেক ইসরাইলি বুঝতে চায় না কি ঘটছে। তাতে কি আসে যায়। এক প্রকার স্থিতিস্থাপকতায় পৌঁছানো গিয়েছে। তাদের হারাবার কিছুই নেই তারা তাদের গর্ব তাদের জাতীয় পরিচিতি ও স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে আমরা যতই ভীতির সঞ্চার করি না কেন আমরা তাদের জীবনের উপর সম্পূর্ণ

নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে পারছি না। সর্বশেষ পরাজয়ের সকল লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। বার বছরের এক শিশুকে দেখেছি পাথর ছুড়ে মারছে। সে জানে তার কি হতে পারে। সেই ভীতির পিছনে আমি লক্ষ্য করেছি এক প্রকার গর্ব। সৈন্যরা চিৎকার বলে ওকে গুলি করে মাথা গুড়িয়ে দাও। তার হাত ভেঙ্গে দাও। এমন শিক্ষা দাও আর যেন পাথর ছুড়ে না মারে। এ কথাগুলো একজন সৈনিকের, যে একদিন আগে আইন মান্যকারী খোদাভীরু সেই রাষ্ট্রের নাগরিক যে রাষ্ট্র ইহুদীদেরকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য ঠিক একই আবেগ হতে সৃষ্টি হয়েছিল। পৃথিবীর অন্য কোন জাতি না বুঝতে পারলেও আমাদের বোঝা উচিত। যখনই কোন তরুণ আমার দিকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে আমি নিজেকে অপরাধী না ভেবে পারি না। কারণ আমি যদি অনুরূপ পরিস্থিতি, থাকতাম আমিও প্রস্তর নিক্ষেপ না করে পারতাম না। কিন্তু একজন সৈন্য হিসাবে তার দিকে ফিরে বলতে পারি অন্যদের হাতে ইহুদী জাতি যে নির্যাতন সহ্য করেছে সেই হিসাবে আমি তোমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। এই শিশুগুলি কি সুন্দর ময়লা, ডাস্টবিন ও নোংরা থেকে উঠে আসছে। তরুণ স্বচ্ছ মুক্তর মত ধূসর বর্ণের মুখমণ্ডল প্রস্তুত উজ্জ্বল ও নির্দোষ তাদের চোখ। তিন বছরের শিশু আমাদের দিকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানায়। পাঁচ বছরের শিশু ইতোমধ্যেই জেনেছে আমরা তাদের শত্রু। হাসতে হাসতে তারা আমাদেরকে দুই আঙ্গুল দিয়ে “V” চিহ্ন দেখায়। এর প্রকৃত অর্থ কি জানে না। আমরা জানি কি করতে হবে। কঠোরভাবে অথচ ভদ্রতা সহকারে যেমন পরিস্থিতি চায় কিন্তু পরিস্থিতি এমনই হয় যে আমরা একটা শূকরের বাচ্চায় পরিণত হই। একুশ বছর গত হয়েছে যখন থেকে এই এলাকা ইসরাইলীদের নিয়ন্ত্রণে এসেছে। একটি পূর্ণ বংশ এখানেই বড় হয়েছে। তথাপি আজও তারা আমাদের বিদেশী শক্তি ব্যতীত আর কিছুই ভাবে না। ইহুদী বসতি স্থাপনকারীরা সরকারি ভর্তুকি প্রদত্ত আবাসন গৃহে মিথ্যার মধ্যে বসবাস করছে। অদূরেই রয়েছে মারমুখী প্রতিবেশী। তারা অনুধাবন করে যে সৈন্যবাহিনীর উপর তাদের নিরাপত্তা নির্ভরশীল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তারা মিনিবাস করে বেড়াতে বের হয়। আর প্রহরারত ক্লান্ত সৈনিকদের মাঝে গরম সুপ ও খাবার পরিবেশন করে। অধিকাংশ সৈন্য কৃতজ্ঞচিত্তে আবার গ্রহণ করে। অনেকে নিজেদেরকে এই বলে ধোঁকা দেয় যে যুক্তিসঙ্গত অনুরোধের মাধ্যমে একদিন তারা বসতি স্থাপনকারীদেরকে বোঝাতে পারবে যে তাদের বিচারের দিন একদিন আসবে আর তারা ইসরাইলে বসবাসের জন্য ফিরে যাবে। আর সরকারি ভর্তুকির কারণে তাদের ব্যাংক একাউন্ট ক্রমাগত ভারী হয়ে উঠছে। আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আদর্শবাদী শান্তিরক্ষক তাদের কোন দান বা উপহার গ্রহণ করে না। আর সামান্যতম যদি মনে হয় জোর করে অধিকার করা।

সেগুলো তারা ক্ষমা করে না।

(৬) এতদসত্ত্বেও ইসরাইলি রাজনীতিবিদরা তাদের নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মিথ্যা আশ্বাস প্রচার করে চলেছে যে ইনতিফিদা অতি তুচ্ছ বিষয়। যারা দাবি করে যে তৃণমূল পর্যায়ের বিপ্লব দমন করা সম্ভব তারা ইচ্ছাকৃতভাবে জাতিকে বিভ্রান্ত করছে। এ কথা মানতে হবে এই রাজনৈতিক সমস্যা কোন সামরিক সমাধান সম্ভব নয়। এ বছর সংরক্ষিত সেনাবাহিনীর প্রায় সকলেই যারা কিছুকাল এই এলাকায় থেকেছে তারা সকলেই দেখেছে।

(৭) আমরা যদি এখানে অবস্থান করি তাহলে ক্রমাগত গভীর পঙ্কিলতায় আমরা ডুবে যাব। সেই সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের জনমত আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। তারপর এক সময় এক ধরনের সমাধান আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে তখন আমরা লেজ গুটিয়ে পশ্চাদ অপসরণ করব।

শেষ প্রচেষ্টাও চূড়ান্ত সমাধানে স্বাভাবিক পরিণতি হচ্ছে গণযুদ্ধ (ইনতিফাদাহ বা উত্থান)। সেটি হয়ে দাঁড়ায় বিপ্লব। ডেনিবেনতাল লিখেছেন পরবর্তী পর্যায়ে চরম হতাশার মধ্যে ফিলিস্তীনীরা গোলাগুলির বদলে পাথর ছুড়ে মারার কারণে একদিন বাধ্য হয়ে আমরা উপযুক্ত শাস্তি দিতে বাধ্য হব। তখন আর কোন পথ থাকবে না। আমার ভয় হচ্ছে সেদিন আর বেশি দূরে নয়।

চারটি যুদ্ধের প্রথম উদ্যোগ

হেনরি কাদাজিউ যে আধ্যাত্মিক বিকল্পের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন অথবা ইহুদী ছাত্রদের নিকট আমি যে নামপত্র পরিবর্তনের ধারণা উপস্থাপন করেছিলাম সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা করার পূর্বে ইহুদী-আরব সংঘর্ষে বারবার আমাদের পরাজয়ের কারণগুলো ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। (১৯৪৮-১৯৭৩ পর্যন্ত চারবার পরাজয় হয়েছিল)। পঁচিশ বছরের মধ্যে সর্বপ্রথম আরবরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। যুক্তরাষ্ট্র ইহুদীদেরকে সাবধান করে জানিয়ে দিয়েছিল যে আরবরা উদ্যোগ নিচ্ছে। আমেরিকা তার সেটেলাইট থেকে জানতে পেরেছিল কিন্তু ইহুদীরা বিশ্বাস করেনি। তারা ভেবেছিল আরব চাচাতো ভাইদের তারা খুব ভাল করেই জানে। তারা ধুমধাম না করে সামরিক প্রস্তুতি নিতে পারে না। তাদের এসব হৈ চৈ আগে থেকেই ইহুদীদেরকে সতর্ক করে দিত। কিন্তু আনোয়ার সাদাত ১৯৭৩ সালে রমযানের যুদ্ধে সত্যই অতর্কিত আক্রমণ করে ফেলেছিল। মিসরীয় বাহিনী দুর্ভেদ্য বারলেব লাইন ভেঙ্গে সিনাইতে ঢুকে পড়েছিল এবং ইসরাইলিদের গলা চেপে ধরেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ইহুদীরা তাদের পালক পিতা আমেরিকানদের সাহায্য প্রার্থনা করে এস ও এস পাঠালো। তখন পালক পিতা যন্ত্রপাতি ও সৈন্যবাহিনী দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে পড়ল। আটলান্টি মহাসাগরে আজর দ্বীপ থেকে তাদের বোমারু ও ফাইটার

প্লেন পাঠাতে লাগল।

ইহুদীদের প্রধান ভিত্তি আমেরিকা

এর থেকে প্রমাণিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র আরবদের বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবেই ইহুদীদের পক্ষ অবলম্বন করে। আমরা যখনই ইহুদীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাব তখনই সেই যুদ্ধ হবে মহাশক্তিধর যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। খ্রিস্টান যুক্তরাষ্ট্র কি কারণে ইহুদীদেরকে এত ভালবাসে। এই ভালবাসার কারণ কি? কারণ আর কিছু নয়। আমেরিকার ইহুদী লবি এর বড় কারণ, সেখানে ৬০ লক্ষ ইহুদী বসবাস করে। তারা অর্থাৎ এই ইহুদী অত্যন্ত সংঘবদ্ধ সম্প্রদায়। তারা জানে কিভাবে তাদের টাকা, তাদের বুদ্ধি ও তাদের জনশক্তি ব্যবহার করতে হয়। ইহুদী সমর্থন ব্যতীত কোন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে পারে না।

ইহুদী শক্তির রহস্য

১৯৪৮ সালে আমেরিকার তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুমেন অসতর্কভাবে এই রহস্যের কথা বলে ফেলেছিলেন। ১৯৪৮ সালে ১৪ মে তেলআবিব রেডিও থেকে বেনগুরিয়ান যখন স্বাধীন ইসরাইলি রাষ্ট্রের ঘোষণা দিলেন তখন সময় ক্ষেপণ না করে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী জাতি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। লোকে বলে এই স্বীকৃতি দিতে মাত্র দুই মিনিট সময় লেগেছিল। ট্রুমেন সেদিন নতুন জামাইয়ের মত মিনমিন করে কথা বলছিল যেন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, তুমি এই মহিলাকে অর্থাৎ ইসরাইলকে তোমার আইনসঙ্গত স্ত্রী মনে কর? হ্যাঁ, ট্রুমেন ইসরাইলকে তার কেবল স্ত্রী নয়, তাকে তার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী হিসাবে গ্রহণ করেছিল।

এত তাড়াহুড়া করে ইহুদী রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার কারণ সম্পর্কে সাংবাদিকরা প্রশ্ন তুলেছিল। তারা বলেছিল, আমরা ইসরাইলকে যথাসময় স্বীকৃতি দিতে পারতাম। কিন্তু আপনি এত তাড়াহুড়া করলেন কেন? আপনি কি জানেন না সেখানে এক কোটি আরব রয়েছে, তারা অসন্তুষ্ট হবে? তিনি সত্য কথাই বললেন, আমার নির্বাচনী এলাকায় কোন আরব নেই, তার অর্থ ইহুদীরা ভোট দিয়ে আমাকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। আমেরিকা ৬০ লক্ষ ইহুদী বসবাস করছে। ভারসাম্য রক্ষা করতে হলে তার এই নির্বাচনী এলাকায় সমসংখ্যক মুসলমানকে আমেরিকায় অভিবাসন দিতে হবে।

পাল্টা ব্যবস্থা

এ কথা মানতেই হবে যুক্তরাষ্ট্র কোনক্রমেই সেখানে মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যক মুসলমানকে তার উদ্দেশ্যে অভিবাসনের অনুমতি দেবে না। এই মুসলমানরা আরব নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ অথবা তুরস্ক যেখান থেকে হোক না কেন। এমনকি তুরস্ক যাকে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্রের ঠাণ্ডা লাগলে তুরস্ক হাঁচি দেয় তাদের সম্পর্ক এমনই। কিন্তু সেখান থেকেও অধিক সংখ্যক মুসলমানকে যুক্তরাষ্ট্রে আসতে দেবে না। একমাত্র মেধা আমদানির জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু মেধাবীকেই তারা যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনের অনুমতি দেবে। তাহলে এই ৬০ লক্ষ ইহুদী লবির কি পাল্টা ব্যবস্থা করা যেতে পারে? জবাব সোজা। ৬০ লক্ষ আমেরিকানকে মুসলমান বানাও। ও আল্লাহ! আমরা যতটা ভাবছি তার থেকে অনেক সহজ। আল্লাহ্ সুববনাহু ওয়াতায়ালা বলেন :

لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না ...। — কুরআন ৩৯ : ৫৩

আমেরিকার প্রয়োজন ইসলাম

আমেরিকার জনগণ তাদের পরিচিত জীবন ব্যবস্থায় ভীষণভাবে বিরক্ত ও হতাশাগ্রস্ত– তাদের সমকামিতা, মাতলামি, উদ্বৃত্ত নারী, ধর্ষণ, খুন ইত্যাদি জঘন্য বিষয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। এর থেকে তারা মুক্তি চায়। প্রতিবছর সানফ্রানসিসকো শহরে তিন লক্ষ সমকামী মিছিল করে সমবেত হয়। এটা যেন তাদের তীর্থযাত্রা। সংবাদপত্রে সম্প্রতি আমরা এ খবর নিয়মিত পাই। তারা সমকামীদেরকে বলে 'গে'। নিউইয়র্ক, লসএ্যাঞ্জেলস, সানফ্রানসসিসকো শহরে কোন আমেরিকান মেয়র পদে এই "গে"দের সমর্থন ব্যতীত নির্বাচিত হতে পারে না। আমেরিকার এক ধর্ম প্রচারক জিমি সর্গাট বলেছিলেন, "হে আমেরিকা! আল্লাহ তোমাদের বিচার করবেন। তিনি যদি বিচার না করেন তাহলে সডোম ও গোমরাদের কাছে তাকে মাফ চাইতে হবে।

আমেরিকার আরেকটি বড় সমস্যা সেখানকার উদ্বৃত্ত নারী। আমেরিকার সমস্ত পুরুষ যদি একজন করে মেয়েকে বিয়ে করে তাহলেও ৮০ লক্ষ নারী অবিবাহিত থাকবে। তাদের জন্য কোন স্বামী পাওয়া যাবে না। একমাত্র নিউইয়র্ক শহরে পুরুষের চেয়ে দশ লক্ষ মহিলা বেশি রয়েছে। আর এই পুরুষের এক-তৃতীয়াংশ 'গে'। ফলে তাদের সমস্যা আরও জটিল হয়েছে। আমেরিকায় মাতালের সংখ্যা এক কোটি দশ লক্ষ। এদেরকে বলা হয় প্রবলেম ড্রিংকার। তদুপরি রয়েছে চার কোটি চল্লিশ লক্ষ

হেভি ড্রিংকার। তাদেরকেও বলা হয় প্রবলেম ড্রিংকার। এর অর্থ সব মিলিয়ে পাঁচ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মাতাল। স্বাভাবিকভাবেই বেচারা আমেরিকানরা যে কোন খড়কুটো আঁকড়ে ধরতে চায়। সেইজন্য দেখা যাচ্ছে কোরিয়া থেকে আগত এক ভদ্রলোক নিজেকে দ্বিতীয়বার আবির্ভূত যিশু বলে দাবি করেছেন। তার অনুসারীদেরকে বলা হয় "মানমিয়োং মনস"। তারপর রয়েছে 'ফাদার ডিভাইন' নামে আমেরিকার একজন নিগ্রো। সে নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করে। তারপর রয়েছে রেভারেন্ড জিম জোনস, কুক্লাম ক্লান, হরে কৃষ্ণ। আরও আছে শয়তান পূজারী করার দল। যা কিছু আসে আমেরিকানরা তাই আঁকড়ে ধরতে চায়।

মুসলমানদের প্রয়োজন আমেরিকা

আমেরিকার সমস্যার সমাধান রয়েছে ইসলামে। তেমনি ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান ইসলামের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু এ কাজ কে করবে? মিসর, আরব, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া থেকে আগত প্রবাসীরা এ কাজ করতে পারবে? সত্যি কথা বলতে কি সারা দুনিয়ার মুসলমান আজ চরম কাপুরুষ। আমেরিকান গ্রীন টিকেট তারা দেখেছে। তারা নানা রকম হীনমন্যতায় ভুগছে। কিছু বলা বা করার সাহস তাদের নেই। নতুন পাওয়া স্বর্গের মত দেশ থেকে যদি তাদের বের করে দেওয়া হয়। সবচেয়ে উপযুক্ত জনগোষ্ঠী হচ্ছে আফ্রো-আমেরিকান মুসলমান। তারাই আমেরিকাকে মুসলমান বানাতে পারে। তিনশো বছরের দাস জীবন ও হাতুড়ি পেটা খেয়ে খেয়ে তারা পৃথিবীর সবচেয়ে মজবুত যুদ্ধাদেহী মুসলমানে পরিণত হয়েছে। তাদেরকে শক্তিশালী কর। তারা যাতে আমেরিকাকে মুসলমান বানাতে পারে সেই ব্যাপারে সাহায্য কর। আমেরিকা ও ইসরাইলকে আরমা গেডন দখল করার আগেই এই কাজ করতে হবে। দূরপ্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্য ও প্রাচ্যের মুসলমান ভাইদের আমি বলব, আমার বক্তব্যের কারণে তারা যেন ইহুদীদের মত হিংসাপরায়ণ হয়ে না ওঠেন। হিংসা করার কোন কারণ নেই। আরবদের নিকট আল্লাহ্‌র বাণী অবতীর্ণ হওয়া তাদের চাচাতো ভাই ইহুদীরা বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি। আল্লাহ্ তা'আলা এখন হয়তো পাশ্চাত্যে পরিবর্তন আনার মহৎ দায়িত্ব কালোদের উপর অর্পণ করেছেন। সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা।

وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ

ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم ۝

যদি তোমরা বিমুখ হও তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মত হবে না। — কুরআন– ৪৭ : ৩৮

ইহুদী লবিকে প্রতিহত করা যায় তার জন্য এই ষাট লক্ষ আমেরিকানের মধ্যে পরিবর্তন আসতে যে ব্যয় হবে তার খরচ একটা ফাইটার প্লেন ক্রয়ের... এই কাজটা করলে আল্লাহ্ রসূলও খুশি হবেন আর রক্তপাতও হবে না।

আজ ইসরাইল বেঁচে আছে তার একমাত্র কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ও অব্যাহত প্রশ্রয়। দুষ্কর্ম ও খুনোখুনি চলছেই। খ্রিস্টান ও ইহুদীদেরকে জাগাতেই হবে। তাদেরকে ইসলামের অধিকার, ফিলিস্তীনীদের অধিকার, স্বীকার করতেই হবে। ইহুদীরা যদি ফিলিস্তিনিদেরকে অংশীদার করতে অস্বীকার করে তাহলে সেটা হবে একটা রাজনৈতিক আত্মহনন।

ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার সকল প্রচেষ্টা আজ অবধি ব্যর্থ হয়েছে। শান্তি ও সমৃদ্ধি নিহিত রয়েছে মানব জাতির প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশেষ আহবানের মধ্যে :

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ○

হে বনী ইস্রাঈল! আমার সেই অনুগ্রহকে তোমরা স্মরণ কর যার দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি এবং আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর। – কুরআন– ২ : ৪০

যারা বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্র সঙ্গে যে চুক্তি সাধিত হয়েছিল তা পরিপূর্ণ করে, ফিলিস্তীন তাদের জন্য।

ইফাবা—২০০৩-২০০৪ প্র/৯৪৭৬(উ)-৫,২৫০